মানসিক স্বাস্থ্য

ডঃ জ্ঞানেন্দ্র দাশগুপ্ত

এশিয়াটিক বুক এজেন্সি

মানসিক স্বাস্থ্য

মানসিক স্বাস্থ্য

ডঃ জ্ঞানেন্দ্র দাশগুপ্ত

মনঃসমীক্ষক

পি, এইচ, ডি (ডাবলিন),

প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ডেভিডহেয়ার ট্রেনিং কলেজ,

প্রাক্তন অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,

প্রাক্তন প্রধান স্নাতকোত্তর শিশুবিকাশ বিভাগ,

শ্রীমতী জে, ডি, বিড়লা ইনষ্টিটিউট অব

এডুকেশন ফর উইমেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাক্তন শিক্ষা অধিকর্ত্তা, ত্রিপুরা

প্রাক্তন শিক্ষা সহঅধিকর্ত্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১৯৯২

এশিয়াটিক বুক এজেন্সী

কলিকাতা

MANASIK SASTHYA

by Dr. Jnanendra Dasgupta

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৯২

শ্রীঅশোক কুমার নন্দী কর্তৃক এশিয়াটিক বুক এজেন্সীর পক্ষে ১৭৪জি, লিন্টন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১৪ থেকে প্রকাশিত এবং শ্রীরতন সূত্রধর কর্তৃক সুপ্রিকো, ১/ডি/২, রায়পুর রোড ইষ্ট, কলিকাতা-৩২ হইতে মুদ্রিত।

আমার স্নেহের মেয়েদের
সুনন্দা ও পিয়া

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

বি.এড পাঠ যারা গ্রহণ করছে, স্নাতকোত্তর মনোবিদ্যা ও শিশু বিকাশ যারা পড়ছে, তাদের "মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা" পাঠের উপযোগী করে বইখানি লেখা হয়েছে। শরীর নিয়ে মানুষের আজকাল যত ভাবনা, ঠিক ততখানি ভাবনা মন নিয়ে। মানসিক বিকার ও বৈকল্যে আধুনিক জীবন বিপর্যস্ত। রোগ নিরাময়ের দিক থেকে রোগ নিবারণের দিকে আজকাল মানুষের দৃষ্টি অধিক নিবদ্ধ হয়েছে। এই বইটি পড়ে সকলে উপকৃত হবেন। এটা যদি ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ পাঠক পাঠিকাবর্গের কাজে লাগে—তবে নিজেকে আমি সার্থক মনে করব।

বইটি লেখবার অনুপ্রেরণা আমি পেয়েছি আমার স্ত্রী শ্রীমতী শান্তার কাছ থেকে, এবং লেখার ব্যাপারে ডক্টর শ্রীমতী মীনা ব্যানার্জির উৎসাহ ছিল। প্রয়োজনে পরামর্শ দিয়েছেন—যাদবপুর বিদ্যাপীঠের শিক্ষণ বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীপঞ্চানন ডুয়ারি।

এশিয়াটিক বুক এজেন্সীর কর্ণধারদ্বয় সর্বশ্রী অশোক নন্দী ও সুজিত দাসের ব্যক্তিগত আগ্রহ ব্যতীত এই গ্রন্থ প্রকাশিত হত না। তাঁদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

গ্রন্থকার

ভূমিকা

মানুষ নিজেকে ভয় করে। তার মনের অনেক ইচ্ছা ও আবেগকে তার ভয়। ওরই মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য তার কাম ও ক্রোধ। চেতন মন থেকে এদের নির্বাসিত করে—মানুষ চেষ্টা করে 'ভালো' 'ভদ্র' সাজতে। নিজেকে নিজের কাছ থেকে অমন গোপন করার মাশুল হচ্ছে মানসিক রোগ। পাশ্চাত্য দেশে ফ্রয়েড ও তৎপরবর্ত্তী মনঃসমীক্ষকদের এই আবিষ্কার।

মানুষের সকল ইচ্ছার পরিতৃপ্তি সম্ভব নয়। সামাজিক বাস্তবের কথা ভুললে চলবে না। কিন্তু অমন ইচ্ছা ও আবেগ আমাদের রয়েছে—তাকে সচেতন মন স্বীকার না করবার কি কারণ থাকতে পারে? নিজের চোখে ছোট হব? তা কেন? মানুষ যা মানুষ তাই। সামাজিক সংস্কারকে অত বড় করে দেখলে চলবে না। সবচেয়ে বড়ো হচ্ছে সত্য। এই স্বীকৃতিতে যে দুঃসাহসের প্রয়োজন—পরিপূর্ণ মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থে তা সংগ্রহ করতে হবে বৈকি। নিজের কাছে নিজেকে স্বচ্ছ হতে হবে।

মানসিক স্বাস্থ্য কেবলমাত্র মানসিক রোগমুক্তি নয়। ব্যাপক অর্থে তা সুখিত্বও। সুখী ব্যক্তি তিন জাতীয়। (১) সাধারণ লোক—তাদের সুখদুঃখ। সুখের কারণ ঘটলে এরা উৎফুল্ল হয়, অবস্থার প্রতিকূলতায় এরা বিষণ্ণ হয়। (২) এমন ব্যক্তি আছে যারা সর্বদাই বিষণ্ণ। বিষাদরোগ একটি মানসিক রোগ—পাশ্চাত্যের মনোরোগ বিজ্ঞানে এদের চিকিৎসার বিধান আছে। (৩) কিছু ব্যক্তি আছে—যারা বেশীরভাগ সময়েই হাসিখুশী ও প্রফুল্ল। এমন

আনন্দের জন্য সবসময়ে এদের কোন কারণ দরকার হয় না। প্রাচ্যপ্রদর্শিত যোগসাধনার দ্বারা মনের সুখ শান্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব। এমন কি সাধারণ সুখদুঃখের ঊর্দ্ধেও মানুষ উঠতে পারে। যোগসাধনা কঠিন হলেও সাধ্যাতীত নয়। সাধারণ মানুষেরও যোগের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখবার আছে। অহৈতুকী আনন্দের কিছু অংশ আমরা সকলেই লাভ করতে পারি।

মানসিক স্বাস্থ্যের বইতে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের দুটি দিক নিয়েই কিছু আলোচনা করেছি। মানসিক রোগ যাতে না হয় তার জন্য সতর্ক থাকা, সচেষ্ট হওয়া এবং কেমন করে সুখী হওয়া যায়—এ দুটিই মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আবশ্যক।

মনের স্বরূপ

পদার্থ কি বলা যেমন শক্ত, মন কি বলা তেমন কঠিন। এমনও বলা যেতে পারে মন পদার্থ নয়, তেমন পদার্থ মন নয়। একথায় মনের স্বরূপ কিছু বোঝা গেল কি? একজন লোক দেখে, শোনে, ভালবাসে, সময় সময় ক্রুদ্ধ হয়, সুখবোধ করে এবং কষ্ট পায়—নানা প্রকারের কর্ম ও আচরণে লিপ্ত হয়। তার চিন্তাভাবনা, অনুরাগ বিরাগ, সুখদুঃখবোধ তার মনের অন্তরঙ্গ রূপ। দেখাশোনাতেও তার মন কাজ করে—কর্ম ও আচরণ তার মনের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

আচরণবাদ

একজনের মনে কি ঘটছে একমাত্র সেই তা জানে। তার কর্ম ও আচরণ সকলের দৃষ্টিগোচর ও শ্রুতিগোচর। একদল মনোবিদের ধারণা—মনের ভিতরটা ব্যক্তিবিশেষের একচেটিয়া। তা নিয়ে কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করতে গেলে ব্যক্তির মনের ভিতর কি ঘটছে সেটা জানবার জন্য ঐ বিশেষ লোকটির উপর একান্তরূপে নির্ভর করতে হবে। অন্যাদের প্রত্যক্ষের দ্বারা তার সংশোধনের কোন পথ নেই। ব্যক্তির রিপোর্টটি ভুল হতে পারে—ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত। অমন তথ্যের উপর ভিত্তি করে কোন বিজ্ঞান গড়ে উঠতে পারে না। ঐ কারণে মনের অভ্যন্তরকে একেবারে ছেটে বাদ দিয়ে, আচরণকে ভিত্তি করে একদল মনোবিদ মনোবিদ্যা গড়ে তোলার প্রয়াসী। এদের বলা হয় আচরণতত্ত্ববিদ।

আচরণতত্ত্ববিদদের সমালোচনায় কিছুটা সত্য নেই এমন বলা চলে না। তবে মনকে বাদ দিয়ে মনোবিদ্যা—এ আবার কেমন কথা!

মনের অভ্যন্তরে কি ঘটছে তা একমাত্র ব্যক্তিবিশেষের জানা থাকলেও সেটা ঠিক না বেঠিক তা কিছুটা বোঝা সম্ভব এটা বিচক্ষণ মনোবিদরা বলে থাকেন। কোনটা সত্য তা একজন ব্যক্তি, বিশেষতঃ রুগ্নব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রায় সবখানিই আদায় করে নেওয়া যায়।

আচরণ মনেরই প্রকাশমাত্র। ইচ্ছা ও আবেগই আচরণের প্রেরণা। কোন ব্যক্তি তার মনের কথা কি বলছে, কি প্রকার আচরণ করছে, সব একসঙ্গে বিচার করেই মনকে বুঝবার চেষ্টা করা দরকার—এটা অধিকাংশ মনোবিদের ধারণা।

মনের দুটি দিক
ক্রিয়া ও সংগঠন

মনের দুটি দিক—মানসিক ক্রিয়া ও মানসিক সংগঠন। মনের সবকিছু কাজ—প্রত্যক্ষ করা, আবেগ অনুভূতি, ইচ্ছা এবং তদনুযায়ী আচরণ—মনের সক্রিয় অংশ। জীবের আচরণ ও জড়বস্তুর আচরণের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য আছে। জীবের আচরণের প্রধান প্রেরণা যোগায় মন, বাইরের বস্তু বা ঘটনা উদ্দীপকের কাজ করে। একটি পাথর পাহাড়ের উপর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে পড়লো। এক্ষেত্রে পৃথিবী পাথরটিকে আকর্ষণ করছে তার কেন্দ্রবিন্দুর দিকে। পাথরটি উপর থেকে নীচে পড়ার কারণ ঐ মহাকর্ষ। একটি বিরাট কুকুর দেখে বাড়ীর পোষা বিড়ালটি ছুটে পালাল। এক্ষেত্রে বিড়ালের ছুটে পালানোর কারণ মুখ্যতঃ তার ভিতরের তাগিদ—ভয় এবং তার আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি। কুকুর ঐক্ষেত্রে উদ্দীপকের কাজ করছে।

মানসিক ক্রিয়া—অভিজ্ঞতা : সচেতনতা ও আত্মসচেতনতা

এবার আমরা মানসিক ক্রিয়ার দিকটি সম্বন্ধে বলব। 'রাম একটি বল দেখছে'। মনোবিদ্যায় বলা হয় এটি একটি অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার দ্বারা কি কি জ্ঞান অর্জন করা হচ্ছে? কি কি বিষয় মন জানছে? (১) রাম **বলটি** দেখছে। বলটির সম্বন্ধে রাম সচেতন হচ্ছে।

(২) রাম বলটিকে **দেখছে**। দেখছে সম্বন্ধে রাম সচেতন হচ্ছে। (৩) **রাম** বলটিকে দেখছে। রাম যে বল দেখছে—রাম-ক্রিয়াটির কর্তা-এ সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রথমটিকে বলা হয় **অভিজ্ঞতা**। অভিজ্ঞতার সঙ্গে দ্বিতীয়টি যুক্ত হলে তাকে বলা হয় **সচেতন অভিজ্ঞতা**। সচেতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে তৃতীয়টি যুক্ত হলে বলা হবে **আত্মসচেতন অভিজ্ঞতা**। কোন মানুষ বা জীবের যদি কেবলমাত্র অভিজ্ঞতাটুকুই হয়, তবে সে জানবে না যে সে **দেখছে**—শুধু বলের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তার জ্ঞান হবে। এই অভিজ্ঞতাটুকুই মুখ্যতঃ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতির বিষয়বস্তু ; দ্বিতীয়টি এবং তৃতীয়টি* অর্থাৎ সচেতনতা ও আত্মসচেতনতা লব্ধ তথ্যকে আশ্রয় করে মনোবিদ্যা প্রসার লাভ করেছে।

সচেতন মনের অগোচরে—প্রাকৃচেতন ও নির্জ্ঞান মানসিক স্তর

মনের দ্বারা আমরা অন্তর ও বহির্জগত সম্বন্ধে সচেতন হই। চেতনা মনের স্বরূপ আগের মনোবিদরা এমন মনে করতেন। নিঃসন্দেহে চেতনা মনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সচেতন ইচ্ছা ও আবেগ, চিন্তা-ভাবনা এসব নিয়েই মনের সচেতনতা। কিন্তু সচেতন মনের অগোচরেও কি ইচ্ছার উদয় হয় না? সেই ইচ্ছার দ্বারাও কি ব্যক্তির আচরণ প্রভাবিত হয় না?

একদিন অবস্থা ভাল ছিল এখন চরম দুরবস্থা। এমন একটি মহিলাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, বাঁচবার তাগিদে ভিক্ষা করতে দেখা গেল। তিনি তাঁর হাতটা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—কিন্তু হাতটা চিৎ করে নয়, উপুড় করে। সচেতন মন তাঁকে বলছে 'ভিক্ষা কর', নির্জ্ঞান বলছে 'না ভিক্ষা ক'রনা, নিজেকে অপমান ক'রনা। ভিক্ষালব্ধ মুদ্রা ফেলে দাও'। ঐ মহিলার দুটি বিপরীত ইচ্ছা তার আচরণে প্রকাশ লাভ

* "আমি কে?" এই নিয়ে দর্শনও ভাবে। আত্মাই আমাদের স্বরূপ—যা কেবলমাত্র অতীন্দ্রিয় অধিচেতন স্তরেই গোচর—এমন দাবী করা হয়।

করছে। মহিলা যে হাতটি উপুড় করে আছেন সে সম্বন্ধে সচেতন নন। নিশির ডাক বলে এক জাতীয় ঘটনার কথা অনেকেই জানেন। ঘুমের মধ্যে উঠে কেউ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, ঘুমের মধ্যে কথা বলে, চলে বেড়ায়—কিন্তু সে সব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে ঐ ব্যক্তি সে ঘটনা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। নির্জ্ঞান ইচ্ছা লোকটিকে কাজ করিয়ে নিচ্ছে তার সচেতন মনের অগোচরে।

নির্জ্ঞান

সচেতন মনের অগোচরে মানসিক ক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। সে সব কিছু কিছু ইচ্ছাকে চেষ্টা করলে সচেতন করা যায়, কিন্তু অধিকাংশ ইচ্ছাকে সচেতন করা খুবই কঠিন। নিজেদের মায়ের প্রতি ছেলেদের যৌন আকর্ষণ ও ইচ্ছা আছে, মেয়েদের আছে বাবার প্রতি। এইসব ইচ্ছা সচেতন মন স্বীকার করতে, সহ্য করতে, পারে না। তাই তাদের ঠাঁই নির্জ্ঞান মনে।

মনের বৃহদাংশটি নির্জ্ঞান। বলা হয় মনের নয় দশমাংশ নির্জ্ঞান, এক দশমাংশ সচেতন। নির্জ্ঞানকে গভীর মনও বলা চলে। সচেতন মনের কাছে অজানা চৈতন্যপ্রবাহ। গভীর-গভীরতর-গভীরতম অংশ। এমনও অংশ আছে যা শত চেষ্টা করেও উদ্ধার করা যায় না।

প্রাক্‌চেতন স্তর

সব ইচ্ছারই উদয় হয়—প্রাক্‌চেতন স্তরে। কিছু ইচ্ছা সহজেই সচেতন হয় এবং কিছু চিন্তা পথিমধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সচেতন মনে প্রবেশ করা মাত্রই তাকে নির্জ্ঞানে ঠেলে দেওয়া হয়। কোন কোন ইচ্ছা নির্জ্ঞান বাধার দরুন সচেতন মনে প্রবেশ করতে পারে না। যেসব ইচ্ছা সচেতন হবার পর সচেতন মন থেকে বিতাড়িত হয়ে নির্জ্ঞানে আশ্রয় নেয়, তাকে দমিত ইচ্ছা বলা সঙ্গত। পদ্ধতিটিকে 'দমন' বলা যেতে

পারে।* বেশীর ভাগ ইচ্ছা অবশ্য সচেতন মনে আসতেই পারে না। প্রবল নির্জ্ঞানে বাধা তাদের প্রাক্‌সচেতন স্তর থেকে নির্জ্ঞান মনে ঠেলে দেয়। এই পদ্ধতিকে 'অবদমন' বলা যায়।** এইসব ইচ্ছা অবদমিত সংক্ষেপে, দমিত ও অবদমিত ইচ্ছা নিয়েই নির্জ্ঞান মনের ভাণ্ডার। ব্যাপক অর্থে অবদমন, দমন ও অবদমন দুটি পদ্ধতিকেই বোঝান হয়। ঐ প্রক্রিয়ার ফলেই মনের নির্জ্ঞানের জন্ম।

যে সব ইচ্ছা বা অভিজ্ঞতা মানুষের কাছে খুবই তিক্ত, বেদনাদায়ক, বিশেষ করে তার আত্মমর্যাদাহানিকর, তাকে মানুষ ভুলে থাকে, ভুলে বাঁচে। এই 'বিস্মৃত' সত্যটি নির্জ্ঞানে ঠাঁই নেয়। 'সক্রিয় ভোলাকে' দমন বলা হয়। সংক্ষেপে, যে ইচ্ছা নির্জ্ঞানের বাধাতেই নিরুদ্ধ তা অবদমন, যে ইচ্ছার বাধা আসে সচেতন মন থেকে, সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় দমন।

প্রাক্‌চেতন মন

প্রাক্‌চেতন সম্বন্ধে আরও কিছু বলা দরকার। সচেতন মন অনেক কাজ করে—কাউকে দেখল, কারুর কথা শুনলো—তারপর নানান কাজে ব্যস্ত হল। কি দেখল বা কি শুনলো, সে কথা সাময়িকভাবে তাদের আর মনে রইল না। ঐ সব বিস্মৃত ঘটনার স্থান হল তাদের প্রাক্‌চেতন স্তরে। লোকটিকে আবার দেখলে, পরে অন্য কোন সূত্রে, প্রয়োজনে সেই পুরানো স্মৃতি তাদের মনে সহজভাবে ফিরে এল। ভোলা আবার ইচ্ছামত তাকে সচেতন মনে ফিরিয়ে আনা—এই হল প্রাক্‌চেতনার বৈশিষ্ট্য। বিস্মৃতি আর

* রমেশ দাস—'মনোবিজ্ঞানের উপেক্ষিতা', জ্ঞানবিজ্ঞান, কলিকাতা, আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫। ফ্রয়েড এদের 'পরবর্ত্তী বিতরণ' বলে আখ্যায়িত করেছেন ও একজাতীয় অবদমন।

** একে ফ্রয়েড 'প্রাথমিক' অবদমন বলেছেন।

সক্রিয় বিস্মৃতির সঙ্গে এটাই পার্থক্য। প্রথমের ঠাঁই হয় প্রাক্‌চেতনায় ও পরেরটির ঠাঁই হয় নির্জ্ঞানে।*

নির্জ্ঞানকে ফ্রয়েড সক্রিয় নির্জ্ঞান বলেছেন। দুটি বিরুদ্ধ ইচ্ছার সংঘাতেই এর জন্ম। নির্জ্ঞানে দুটি বিরুদ্ধ শক্তি অবিরাম যুদ্ধ করে চলেছে।

ইচ্ছা একটি সক্রিয় প্রেরণা। অবদমিত হলেও সচেতন মনে ফিরে আসবার জন্য তার চেষ্টার অবধি নেই। সচেতন হবার পথে বারবার সে বাধা প্রাপ্ত হয়। এই নির্জ্ঞান বাধা, প্রহরী রূপে ঐ পথকে রুদ্ধ করে রাখে। সময় সময় তবুও ইচ্ছাকে ঐ প্রহরী ঠেকাতে পারে না। ছদ্মবেশে, প্রহরীর চোখে ধুলো দিয়ে, সে সচেতন মনে প্রবেশ করে। নির্জ্ঞান বাসনা সচেতন মনে ফিরে আসে ভয়রূপে, তীব্র আকাঙ্ক্ষা রূপ নেয় তীব্র ঘৃণায়।

সচেতন মন, প্রাক্‌চেতন ও নির্জ্ঞান সম্বন্ধে বলা হল। মানুষ কিন্তু স্বপ্নও দেখে। ঐ স্বপ্ন-চেতনা জাগ্রত-চেতনার মত বেশীর ভাগ অত দেদীপ্যমান না হলেও তাকেও অচেতন বলা যাবে না।** চেতনার আরেকটি স্তরও আছে। পাশ্চাত্ত্য মনোবিদ্যায় তার সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ নেই। তাকে বলা যেতে পারে—যা ঘটে জ্ঞানের পারমার্থিক স্তরে—অধিচেতনা বা অতিচেতনা।

---

* প্রাক্‌চেতন মনেও কাজ হয়—এটা মানুষের সৃজনী প্রতিভা নিয়ে যারা কাজ করেছেন তারা দাবী করেন। বহু 'মহতী সৃজনাত্মক সিদ্ধান্তের' জন্ম হয় প্রাক্‌চেতনায়। একটি সমস্যা—শিল্পী বা বৈজ্ঞানিকের সচেতন মনকে আলোড়িত করেছে—কোন সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। ঘুমিয়ে উঠে, বেড়াতে বেড়াতে সিদ্ধান্ত 'হঠাৎ আলোর' মত সচেতন মনে এসে মনকে আলোকিত করলো—হেলমহোজ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন।

** স্বপ্নচেতনা—স্বপ্নের প্রকাশিত অংশ। যে অন্তর্নিহিত-প্রধানতঃ নির্জ্ঞান ইচ্ছার দ্বারা প্রকাশিত অংশ রূপ নেয় যা মুখ্যতঃ নির্জ্ঞান, তাকে বলা হয় 'নিগূঢ় চিন্তা'।

ধ্যান ও সমাধিতেই মানুষ অধিচেতন স্তরের আভাস পায়।*

মানসিক সংগঠনের আরেকটি দিক— ইদম্, অহম্ এবং অধিঅহম্ বা অধিশাস্তা

প্রাপ্ত বয়সে সচেতন মনের প্রভু প্রধানতঃ অহম্। 'আমার' ইচ্ছা, 'আমার' অনিচ্ছা, 'আমি চাই না,' 'আমি চাই'—এমন আমরা বলি। কিন্তু নির্জ্ঞান ইচ্ছা—সেত আমার নয়, আমিতো তাকে স্বীকার করি না, আমার অগোচরে—তবে সেটা কার? মালিকহীন ইচ্ছা—তা কি হতে পারে? কিছু কিছু মনোবিদদের মনে এ প্রশ্নের উদয় হয়েছে। এ প্রশ্নের উত্তরও দেবার চেষ্টা তাঁরা করেছেন। জীবনের রঙ্গমঞ্চে এই 'আমারই' খেলা—শিক্ষক আমি, পিতা আমি, স্বামী আমি, বন্ধু আমি, কর্মচারী আমি। বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্ন জাতীয় আমার আচরণ, বিভিন্ন ধরনের মনোভাব। একটি মূল 'আমিকে' কেন্দ্র করেই এসব 'আমি' গড়ে উঠেছে। আমি একজন মানুষ, জন্মেছি, বড় হয়েছি, বেঁচে আছি। এই 'আমির' প্রতি আমার যে মনোভাব, তাকে অহম ভাবগ্রন্থি বা সেন্টিমেণ্ট বলা হয়েছে। তাকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে মানুষের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব। মূল 'আমি' প্রধান—অন্যান্য 'আমিরা' ওর অধীনস্থ, ওরই অংশবিশেষ। কিন্তু কিছু কিছু 'আমি' আছে যারা ঐ 'আমির' প্রভুত্ব মানতে রাজী নয়, সচেতন মনের মূল 'আমির' সঙ্গে তাদের বিরোধ। এইসব 'আমির' ইচ্ছা সচেতন আমি মনে করে গর্হিত। এইসব আমি সচেতন নয়—এদের অব-আমি বা অব-অহম্ বলাই সঙ্গত। সংক্ষেপে নির্জ্ঞান ইচ্ছা—মালিকহীন নয়, অব—অহমের ইচ্ছা এরা।

---

* বেদান্তে তিন প্রকার জ্ঞানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (১) প্রাতিভাসিক জ্ঞান—স্বপ্নচেতনা (২) ব্যবহারিক জ্ঞান — জাগ্রত অবস্থায় যে জ্ঞান আমরা লাভ করি (৩) পারমার্থিক জ্ঞান—সমাধিস্থ অবস্থায় যে বিশ্বব্যাপী একীভূত অখণ্ড চৈতন্যের আস্বাদন—যেখানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক হয়ে সর্বব্যাপী এক দেদীপ্যমান চৈতন্যরূপে বিরাজ করে।

বাইরের একটি দ্রষ্টা—যার চোখে মনের সব চেতনস্তরই দৃষ্টি-গোচর—সে দেখবে মনের বহু আমি, সঠিক ভাষায় 'অব-আমি' বহু-চেতনার স্তরের যারা মালিক। ঐ সব চেতনার স্তর পাশাপাশি বয়ে চলেছে। ঐ দ্রষ্টার বিচারে ঐসব ইচ্ছার স্তর সমচেতনা সম্পন্ন। এদের সহ-চেতনা বলা যেতে পারে। এই চেতনার স্রোতদের যেটির সঙ্গে আমি 'এক'বোধ করি, যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি সচেতন—তার দৃষ্টিতে অন্যান্য চেতনাস্রোত নির্জ্ঞান, তাদের খবর আমি রাখি না। এই নির্জ্ঞান ইচ্ছা সমূহ অবদমনের ফল স্বরূপ। এই সব নির্জ্ঞান ইচ্ছাকে সচেতন মনে ফিরিয়ে এনে, অহমের সঙ্গে সংশ্লেষিত করে, অহম্‌কে শক্তিশালী করার দায়িত্ব চিকিৎসকদের।

ভাবগ্রন্থি বা সেন্টিমেন্ট এবং গূঢ়ৈষা বা কমপ্লেক্স

ভাবগ্রন্থি ও গূঢ়ৈষার আরও একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। অহম্ সম্বন্ধিত মনোভাবকে কেন্দ্র করে যে একাধিক ইচ্ছা ও আবেগ সম্পূরিত হয় তার নাম ভাবগ্রন্থি বা সেন্টিমেন্ট।* কিছু কিছু ইচ্ছা ও আবেগ মূল চেতনা থেকে বিছিন্ন হয়ে এমটি মানসিক সংগঠনের জন্ম দেয়। একে বলা হয় গূঢ়ৈষা বা কমপ্লেক্স। এইসব গূঢ়ৈষা কিন্তু আচরণ ও মনের সচেতন চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে। ঐসব আচরণ ও চিন্তাভাবনা সাধারণের চক্ষে দুজ্ঞেয় বলে বোধ হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিই। 'শব্দ-প্রতিক্রিয়া' নামক একটি অভীক্ষা আছে। চৌদ্দ বছরের একটি মেয়েকে বলা হল—আমি একটি করে শব্দ বলব। শোনা মাত্র যে শব্দটি তোমার মনে হবে, তুমি তাই বলবে। বলা হল—'ছেলে'। মেয়েটি উত্তর দিল—'ঘৃণ্য'। সাধারণতঃ মেয়ে শব্দটির প্রতিক্রিয়ায় ছেলে-মেয়েরা বলে—'মেয়ে'। মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করা হল 'কেন অমন বললে?' মেয়েটির উত্তর—'ছেলেরা সবসময় খারাপ কাজ করে'। 'কি খারাপ কাজ'? মেয়েটি

* William Mcdongall—Introduction to Social Psychology.
Alexander Shand—Foundation of Character.

বলল—'জানি না'। হয়ত মেয়েটি ভাল করে জানে না, হয়ত কিছুটা জানেও। কোন ছেলের সম্বন্ধে তার হয়ত তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে, মেয়েটি অপমানিত বোধ করেছে। মন সবসময় চেষ্টা করছে সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা ভোলবার। সেই আংশিক বা সবখানি বিস্মৃত স্মৃতি মনে গূঢ়ৈষা বা কমপ্লেক্স সৃষ্টি করে। আর একটি দৃষ্টান্ত। 'আমি' এ শব্দটির প্রতিক্রিয়ায় একটি ছেলে বলল, 'মা'। এটি একটি অসাধারণ প্রতিক্রিয়া। এর মূলেও কোন কমপ্লেক্স কাজ করছে।

গূঢ়ৈষার প্রাবল্য মনের সুস্বাস্থ্যের পক্ষে অশুভ। এমন অশুভ প্রভাব থেকে কি ভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, কি ভাবে গূঢ়ৈষার কারাগারে বন্দি মানসিক শক্তিকে মুক্ত করে চেতনার প্রধান স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে সচেতন অহমকে শক্তিশালী করা যায়—এটাই মানসিকতত্ত্ববিদদের ভাবনা।

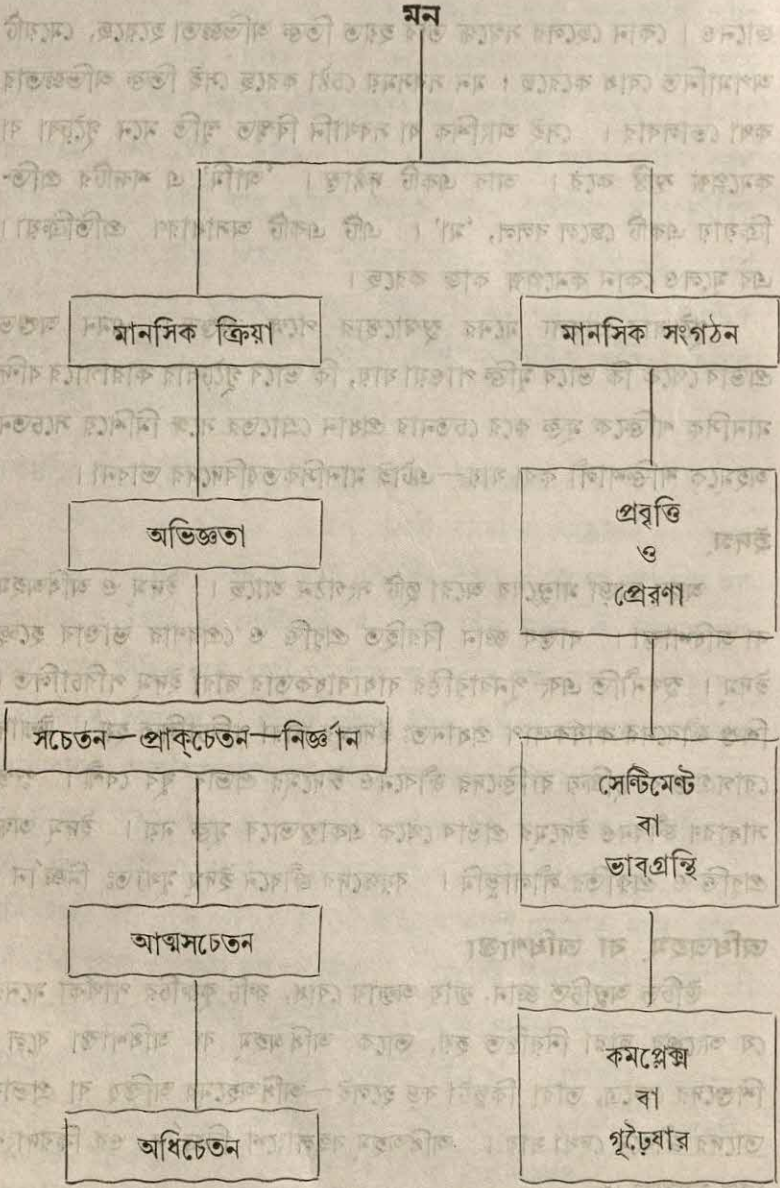
ইদম্

অহম্ ছাড়া মানুষের অরো দুটি সংগঠন আছে। ইদম্ ও অধিঅহম্ বা অধিশাস্তা। বাস্তব জ্ঞান বিরহিত প্রবৃত্তি ও প্রেরণার ভাণ্ডার হচ্ছে ইদম্। সুখনীতি এবং পুনরাবৃত্তির বাধ্যবাধকতার দ্বারা ইদম্ পরিচালিত। শিশু জীবনের কার্যকলাপ প্রধানতঃ ইদমে্র দ্বারা পরিচালিত হয়। উন্মাদ রোগগ্রস্ত বা দুষ্ক্রিয় ব্যক্তিদের জীবনেও ঈদমে্র প্রভাব খুব বেশী। সুস্থ সাধারণ জীবনও ইদমে্র প্রভাব থেকে একান্তভাবে মুক্ত নয়। ইদম্ অন্ধ প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির লীলাভূমি। বয়স্কদের জীবনে ইদম্ মুখ্যতঃ নির্জ্ঞান।

অধিঅহম্ বা অধিশাস্তা

উচিত অনুচিত জ্ঞান, ন্যায় অন্যায় বোধ, রুচি কুরুচির পার্থক্য মনের যে অংশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে অধিঅহম্ বা অধিশাস্তা বলে। শিশুদের ক্ষেত্রে, তারা কিছুটা বড় হলেই—অধিঅহমে্র অস্তিত্ব বা প্রভাব তাদের জীবনে দেখা যায়। অধিঅহম্ বহুলাংশে নির্জ্ঞান, ওর কিয়দাংশ মাত্র সচেতন।*

* এদের বিস্তৃত বিবরণের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য অধ্যায়নটি দেখুন।


মন
মানসিক ক্রিয়া
মানসিক সংগঠন
অভিজ্ঞতা
প্রবৃত্তি ও প্রেরণা
সচেতন—প্রাক্‌চেতন—নির্জ্ঞান
সেন্টিমেণ্ট বা ভাবগ্রন্থি
আত্মসচেতন
কমপ্লেক্স বা গূঢ়ৈষার
অধিচেতন

প্রবৃত্তি ও প্রেরণা

মনকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা চলে। (১) মানসিক সংগঠন, (২) মানসিক ক্রিয়া। মানসিক চেতনা ও আচরণ, মনের ভাব আবেগ, ইচ্ছা অনিচ্ছা, প্রত্যক্ষণ ও আচরণ, এসব মানসিক ক্রিয়া। এসমস্ত উদয় হলে তৎক্ষণাৎ তা আমরা বুঝতে পারি। এদের নিয়েই আমাদের মনের চেতনা। সচেতন মনের অগোচরেও ইচ্ছার উদয় হয়, তাদের প্রভাবে মানুষ কিছু কিছু আচরণও করে—এসব আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

কিন্তু মানুষের মনে কেন ইচ্ছার উদয় হয়, কেন মানুষ আচরণ করে এটা বুঝতে হলে মানসিক সংগঠনের কথা বলতে হয়। ঘরের কোণে একটি ইঁদুর। ইঁদুরটির উপস্থিতি সর্বাগ্রে টের পেল একটি বিড়াল। ইঁদুরটির দিকে সে তাকালো। দেখামাত্র বিড়ালের মনে একজাতীয় আবেগের অলোড়ন হল, একজাতীয় ইচ্ছার উদয় হল। বিড়ালটি ইঁদুরটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিড়ালের নখরাঘাতে ইঁদুরটির মৃত্যু হল। কেন? কেন বিড়ালের অমন আচরণ? এটার উত্তর—বিড়ালের শিকার প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে জীব প্রত্যক্ষ লাভের প্রেরণা বোধ করে, উদ্দীপকের উপস্থিতিতে একজাতীয় অনুভূতি ও আবেগ অনুভব করে, এবং একজাতীয় কর্মে তাকে উদ্বুদ্ধ করে। প্রবৃত্তি প্রেরণা যোগায় সত্য, কিন্তু প্রবৃত্তি সম্বন্ধে সতেচন হওয়া সম্ভব নয়। প্রবৃত্তির অস্তিত্ব আমরা বিচার করে বুঝি—ন্যায়শাস্ত্রের ভাষায়—অনুমানের দ্বারা।

ইঁদুরের কয়েকটি প্রবৃত্তির কথা বলি। শিকার প্রবৃত্তি, খাদ্যান্বেষণ প্রবৃত্তি, যৌন প্রবৃত্তি, বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রবৃত্তি, ইত্যাদি। এসব প্রবৃত্তি ইঁদুরের শিখতে হয় না। এসব প্রবৃত্তি নিয়েই তারা জন্মায়।

মানুষের ক্ষেত্রেও অমন প্রবৃত্তি সমূহ আছে। ম্যাকডুগাল মনে করেন—সংখ্যায় চৌদ্দটি প্রবৃত্তি আছে, কয়েকটি সাধারণ প্রেরণা। প্রবৃত্তির প্ররোচনা যোগাবার জন্য বিশেষ একজাতীয় উদ্দীপক আছে, সাধারণ প্রেরণাদের ক্ষেত্রে উদ্দীপকের মধ্যে তেমন কোন বিশেষত্ব নেই। কোন একজাতীয় উদ্দীপকে তারা সীমাবদ্ধ নয়। অনুকরণ একটি সাধারণ প্রেরণা। শিশু প্রায় সব কিছুকেই অনুকরণ করে, করতে পারে। অন্যপক্ষে যৌন প্রবৃত্তিকের উদ্দীপক হচ্ছে সাধারণতঃ বিপরীত লিঙ্গের কোন ব্যাক্তিবিশেষ। প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত একটি বিশেষ আবেগ—আবেগটিকে প্রবৃত্তির প্রাণস্বরূপ মনে করা যেতে পারে। এইবারে চৌদ্দটি প্রবৃত্তি ও তাদের সঙ্গে যুক্ত আবেগের নাম নীচে উল্লেখ করা হল।

প্রবৃত্তি	**আবেগ**
খাদ্য অন্বেষণ	ক্ষুন্নিবৃত্তি
কাম	লালসা
বোধন প্রবৃত্তি	ক্রোধ
রক্ষণাবেক্ষন বা পিতৃমাতৃ সুলভ প্রবৃত্তি	বাৎসল্য
যূথ	নিঃসঙ্গতা নিরাকরণ
কৌতূহল	বিস্ময়
আত্মপ্রতিষ্টা	আত্মপ্রসাদ
আত্মনতি	আত্মবিমোচন
পলায়ন বা অপসরণ	ভয়
গঠন	সৃজনাত্মক তৃপ্তি
দখল	মালিকানা বোধ
আবেদন	কষ্ট
নিক্ষেপ	ঘেন্না
হাস্য	আমোদ

কয়েকটি সহজাত সাধারণ প্রেরণার কথাও বলা হয়েছে। অনুকরণ, বিশ্বাস স্থাপন এবং নিষ্ক্রিয় সহানুভূতি। ক্রীড়াও একটি সহজাত

সাধারণ প্রেরণা এমন বলা বোধহয় ঠিক হবে।*

আধুনিক কালে মানুষের ও জীবদের প্রবৃত্তি আছে কিনা, প্রবৃত্তি সহজাত কিনা এই নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে আচরণের পদ্ধতি বা প্রণালীটিকে যদি বড় করে দেখা না হয়, প্রবৃত্তির দ্বারা জীবের কি উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে এদিক দিয়ে বিচার করলে প্রবৃত্তির অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহের সামান্যই অবকাশ থাকে।

ঐ সব লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য যে সহজাত এ বিষয়ে সংশয়ই বা কি আছে! পাখীর নীড় বাঁধারও একটি ধরণ আছে। সে ধরনটির পরিবেশের প্রভাবে কিছুটা পরিবর্ত্তন ঘটলেও ঘটতে পারে। কিন্তু যে উদ্দেশ্য সাধনে পাখী নীড় বাঁধে তার পরিবর্ত্তন কোথায়? বংশপরম্পরায় শাবকদের বাঁচাবার জন্য, তাদের নিরাপত্তার জন্য সংক্ষেপে বলা যায়, বংশ রক্ষার প্রেরণায় পাখী নীড় বাঁধে। বুঝে সুজে পাখী যে অমন আচরণ করছে এমন নয়; উদ্দেশ্যটি তার কাছে স্পষ্ট না হলেও বিশেষ ঐ উদ্দেশ্য সাধনের প্রেরণা তার মধ্যে সবসময়ই বর্ত্তমান। ডিম হবার আগেই পাখীরা তাদের নীড় বাঁধার কাজে মনোযোগ দেয়—এটাও লক্ষনীয়। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে বিচার করলে প্রবৃত্তি ও প্রেরণা সহজাত বৈকি।

প্রবৃত্তি ও প্রেরণা কথা দুটি ম্যাকডুগাল শেষের দিকে ব্যবহার করতে চাননি।** শক্তি বা এনার্জি বলে তাদের অভিহিত করেছেন।

পরবর্ত্তীকালে 'মারে'*** তাদের আখ্যায়িত করেছেন, 'প্রয়োজন' বা 'তাগিদ'। জীবনের কতগুলি অত্যাবশ্যক 'সক্রিয় তাগিদ' আছে। বলা যেতে পারে এ বিবরণ যেন 'নতুন বোতলে পুরাতন মদ'।

মানসিক ব্যাধি ও দুষ্ক্রিয়তার মূলে কি আছে, তাদের কোন পথে নিরাময় সম্ভব এই নিয়ে যাদের ভাবনা তারা যে প্রবৃত্তি বহু এমন কথা

* Mcdougall William - Introduction to Social Psychology

** Mcdougall William—Enger:ies Of Man.

*** Murray—Exploration of Personality.

বলতে উৎসাহ বোধ করবেন না এতে আশ্চর্য কিছু নেই।

ম্যাকডুগাল ছিলেন একজন সমাজ বিজ্ঞানী। রসায়ন শাস্ত্রোচিত মনের বিশ্লেষণ, কি কি মৌলিক উপাদান নিয়ে মানসিক সংগঠন এই নিয়ে গবেষণা করাই ছিল তার প্রধান কাজ। জীবজগতে মৌলিক উপাদান কম, যৌগিক বা মিশ্র বস্তুরই উপাদান বেশী, মনের ক্ষেত্রেও সেই কথা সত্য। কামইচ্ছা একক নয়, তারই সঙ্গে সর্বদা যুক্ত রয়েছে কৌতূহল, শঙ্কা, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মবিমোচনের প্রেরণা। সাধারণভাবে, এভাবে কামের খেলা এইরূপে দেখা গেলেও—এসব যৌগিক বা মিশ্র প্রকাশের মূলে কি কি মৌলিক প্রেরণা-সমূহ রয়েছে সেটা বোঝবার ও জানবার চেষ্টারও বিশেষ মূল্য আছে। অমন অনুসন্ধান উপেক্ষার বস্তু নয়।

সকল অসুবিধার মূলে আছে মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব। সব অন্তর্দ্বন্দ্বে থাকে দুটি বিরোধী ইচ্ছা। বিরোধী ইচ্ছা দুটি প্রবৃত্তির থেকে উদ্ভূত হয়। গোড়ার দিকে ফ্রয়েডের ধারণা ছিল বিরোধটি—অহম্ প্রবৃত্তি ও কাম প্রবৃত্তির মধ্যে। পরবর্ত্তীকালে ঐ মতটা কিছুটা পাল্টান। মানুষের মধ্যে অন্যকে কষ্ট দেবার, নিজে কষ্ট পাবার, অন্যকে আঘাত করবার, নিজে আঘাত পাবার ইচ্ছা আছে—যা মারা বা মরা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এসবকে গোড়াতে তিনি কাম প্রবৃত্তির অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন। পরে এগুলিকে একটি স্বতন্ত্র মৌলিক প্রবৃত্তি বলে অভিহিত করলেন। ওর নামকরণ করলেন মরণ প্রেরণা। অহম্ এবং কাম—আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার প্রেরণা। উনি দেখলেন, একটি মৌলিক প্রেরণারই দুটি দিক। তাদের নাম হল—জীবন প্রবৃত্তি বা প্রেরণা। জীবন প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য সুখলাভ করা, কষ্টকে এড়ানো। মরণ প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য হল—'বাধ্যতা-মূলক পুনরাবৃত্তি' বা প্রত্যাবৃত্তি। যে অবস্থা থেকে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে, সেই অবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, 'ধূলা থেকে আমরা জন্মেছি; সেই ধূলাতেই আমরা ফিরে যাবো' ঐ সত্যেকে জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা*।

জীবন বা বাসনা প্রবৃত্তির দুটি ভাগ—কামপ্রবৃত্তি এবং নিজে বাঁচবার, বড় হবার প্রবৃত্তি। মরণ প্রবৃত্তির দুটি দিক আছে—মরণ ও

* **Sigmund Freud—Beyond the Pleasure Principle.**

মারণ, নিজে মরা ও অপরকে মারা।

ধ্বংসাত্মক ইচ্ছা ও কাম বাসনাকে মন সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। আধুনিক জীবনে এদের বহুল অবদমন সর্বজনবিদিত। অন্যদের অনিষ্ট করবার ইচ্ছা মানুষের মধ্যে আছে, অন্যের মৃত্যু ঘটাবার ও অন্যকিছু ধ্বংস করবার ইচ্ছা মানুষের মনের মধ্যে রয়েছে একথা স্বীকার করা তাদের মধ্যে সহজ নয়। ঐসব ইচ্ছাকে মানুষ গোপন করে অন্যের কাছে সাধু সাজতে চায়। নিকটতম আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের প্রতি এমন মারাত্মক ইচ্ছা মানুষ অবদমন করে বাঁচে। কাম প্রবৃত্তিও মানুষের জীবনে বহুল অবদমন ঘটে। দুজনের ভালবাসা, তাদের যৌন আচরণ অন্যদের বিশেষ ঈর্ষার কারণ হয়। একমাত্র ভালবেসে যে ঐ ঈর্ষার ঊর্ধ্বে ওঠা যায়—তেমন ভালবাসা মানুষের মধ্যে কম। মানুষ বলে—ভালবাসা অন্যায় ও যৌন আচরণ পাপ। প্রেমিক প্রেমিকারা ভাবে তবে ভালবাসা বোধ হয় অন্যায়, যৌন আচরণ সম্ভবতঃ পাপ। অপরাধবোধে তাদের মন কণ্টকিত হয়। তাদের যৌন ইচ্ছা ও আচরণের মধ্যে এক অবদমনের অন্ধকার মেঘ নেমে আসে। সহজচিত্তে তাদের প্রেমকে তারা গ্রহণ করতে পারে না। বিবাহিত জীবন যাপন করছে, সন্তান-সন্ততিও হয়েছে—তবুও তাদের কারুর কারুর মুখে শোনা যায়—"যৌন আচরণ না করে পারি না, যদিও জানি এটা পাপ"। এমনকি পুরুষেরাই বলেন—"নারী নরকের দ্বার"। আবার নারীরাও কেউ কেউ পুরুষদের ঘৃনা করে।

মানসিক রোগ চিকিৎসায় ফ্রয়েড লক্ষ্য করেছেন—ঐ জাতীয় ঘৃণা ও অবদমন* মানসিক রোগসৃষ্টির কারণ। নিজের ইচ্ছাকে সহজচিত্তে গ্রহন করবার শক্তিই মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

---

* কাম অবদমনে—ব্যক্তির কামইচ্ছাকে মন সহজভাবে নিতে পারে না, ঐ চিন্তাও তার পাপ বলে মনে হয়। ঐ সব ইচ্ছাকে সে ভুলে বাঁচে, বাঁচবার চেষ্টা করে। কাম আচরণে সে লিপ্ত হল কি হল না—কাম অবদমনের এটা বড় কথা নয়।

মানসিক প্রতিরক্ষার কৌশল

মানসিক প্রতিরক্ষা কি ?*

কোন কোন বেদনাদায়ক ঘটনা দ্বারা মন বিশেষভাবে পীড়িত হয়, নিজের চোখে নিজের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়, অন্তর ও বাহিরের এইসব রূঢ় বাস্তবের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য মানুষ কিছু পন্থা অবলম্বন করে মনের ভারসাম্য বজায় রাখবার চেষ্টা করে। এইসব পন্থাকে 'মানসিক প্রতিরক্ষার কৌশল' বলে অভিহিত করা হয়। এইসব প্রতিরক্ষার বিভিন্ন ধরণগুলি নীচে উল্লেখ করা হল।

এদের কর্মধারা প্রধানতঃ নির্জ্ঞান, বুঝলেও খুব অস্পষ্টভাবে বুঝে, আবার বেশীর ভাগই বুঝেনা।

ক) অবদমন

কোন নিকট আত্মীয়ের অনিষ্টসাধনের এমনকি তার মৃত্যু ইচ্ছা, কোন নিকট আত্মীয়ের প্রতি যৌন ইচ্ছা মনে উদয় হল। এমন ইচ্ছা মনে এসেছে— একথা সচেতন মন কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। 'না, অমন কথা সত্য নয়, অমন ভাবনা আমি ভাবতে পারি না'—এই মনোভাব নিজের মনে শান্তি ও স্থৈর্যকে রক্ষা করবার জন্য অমন ইচ্ছাকে সে ভুলে বাঁচে। এই 'সক্রিয় ভোলার' আরেক নাম—'অবদমন'** মানুষের মনে সারাজীবন ধরেই অবদমন চলে। নিজেদের কাছে নিজেদের আমরা কতুটুকু স্বীকার করি। যতটুকু করি, তার চেয়ে বেশী আমরা ভুলে থাকি—মনঃসমীক্ষা এই সত্য আবিষ্কার করেছে।

* Bernard Hart Psychology of Insanity.

** অন্যভাষায়—দমন।

প্রাথমিক অবদমন

মানুষের অধিকাংশ ইচ্ছারই সচেতন মনে কোন দিন ঠাঁই হয় না। সব ইচ্ছারই জন্ম প্রাক্‌চেতন স্তরে—সচেতন মনের সীমানার ঠিক নীচে যার অস্তিত্ব, ঐ সব ইচ্ছা সচেতন মনে আসবার জন্য, কর্মেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে আচরণে আত্মপ্রকাশের জন্য সর্বদাই সচেষ্ট। কিন্তু সচেতন মনে ওঠবার পথে প্রাক্‌চেতন স্তরেই বেশীরভাগ ইচ্ছা অবদমিত হয়। একেই বলা হয়—'প্রাথমিক অবদমন'। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি সক্রিয়। সচেতন মনে প্রবেশে তাদের চেষ্টার অবধি নেই। কিন্তু 'মানসিক বাধার' বেড়া ডিঙিয়ে স্বীয়মূর্ত্তিতে তারা সচেতন মনে প্রবেশ করতে পারে না। এই মানসিক বাধার বেড়া অবদমনের আরেকটি রূপ।

ইডিপাস ইচ্ছা

অবদমন প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্‌ঘাটিত তথ্যের কথা উল্লেখ করা দরকার। মানসিক রোগ সৃষ্টিতে ইডিপাস ইচ্ছাটির বিশেষ ভূমিকা আছে। প্রত্যেক ছেলের মধ্যে তার মায়ের প্রতি যৌন ইচ্ছা আছে, বাবাকে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে, পিতার অপসারণ সে কামনা করে, করে তার মৃত্যু ইচ্ছা। মেয়েদের ক্ষেত্রেও চিত্রটি ঠিক বিপরীত। পিতার প্রতি যৌন ইচ্ছা, মাতাকে প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞান—এসব তারা পোষণ করে। মেয়েদের ক্ষেত্রে একে বলা হয় 'ইলেকট্রা ইচ্ছা'। সাধারণতঃ ইডিপাস ইচ্ছা বলতে ছেলে মেয়েদের উভয়ের ইচ্ছাকে বোঝায়।* মানসিক দিক থেকে ছেলেদের মধ্যে পুরুষ-ইচ্ছা ছাড়াও স্ত্রী-ইচ্ছা আছে, মেয়েদের ক্ষেত্রেও এই উভয় ইচ্ছাই বর্তমান। সাধারণতঃ ছেলেদের ক্ষেত্রে পুরুষ ইচ্ছাটি প্রবল এবং মেয়েদের মধ্যে স্ত্রী ইচ্ছা। ঐ কথা স্মরণ রাখলে বোঝা সহজ কেন ছেলেরা বাবার ভালবাসাও আকাঙ্ক্ষা

---

* ইডিপাস একটি গ্রীক নাটকের চরিত্র। ইডিপাস তার পিতাকে বধ করে তার মাকে বিয়ে করে। সে অবশ্য জানত না যে ওরা তার বাবা-মা।

করে এবং মেয়েরা মায়ের ভালবাসা আকাঙ্ক্ষা করে ।*

ইডিপাস ইচ্ছা অধিকাংশের মনেই নির্জ্ঞান। যে সমাজে আমরা বাস করি সেই সমাজে ঐরকম চিন্তাধারা গর্হিত, পাপ বলে মনে করা হয়। ইডিপাস ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে মনে একটি গূঢ়ৈষা বা কমপ্লেক্স গড়ে ওঠে। সচেতন মনের স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন, বিপরিত মানসিক সংগঠনের এটি একটি অংশ ।

খ) প্রক্ষেপ

একটি মেয়ের প্রতি একটি ছেলে যৌন আকর্ষণ বোধ করলো। ঐ যৌন-আকর্ষণ ভাল নয়, গর্হিত ছেলেটির মনে হল। প্রক্ষেপ কৌশলের দ্বারা ছেলেটি ঐ আকর্ষণ মেয়েটির ঘাড়ে চাপাল। সে মনে করতে লাগল —'না, আকর্ষণ আমার প্রতি ঐ মেয়েটিরই, আমার নয়'। ঘটনাটি যদি মেয়েটির হয়ে থাকে, সে ভাববে এবং বলবেও, 'আমি কি দোষ করলাম ! ছেলেটি এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে ভাব করলো'। সত্যকথা, প্রেমে তুপক্ষেই জড়িত, তুপক্ষেরই ইচ্ছা থাকে, একতরফা প্রেম হয়না। প্রেম অপরাধ কণ্টকিত বলে এই বাস্তব বহুক্ষেত্রে স্বীকার করতে মন পরাঙ্মুখ হয়।

নিজের ইচ্ছা অন্যের ঘাড়ে চাপানো এটা প্রায় নিত্যকারের ব্যাপার। প্রক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে খুব কম লোকই পারে। খুব বাড়াবাড়ি প্রক্ষেপের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় মানসিক রোগে—বিশেষতঃ ভ্রমবাতুলতা বা প্যারানোইয়া রোগে। অন্যকে আঘাত করার ইচ্ছা রূপ নেয় সচেতন ভয় ও আশঙ্কায়—নিশ্চয়ই অন্যরা তাকে আঘাত করবার মতলব আঁটছে।

---

* ভালবাসা চাওয়া সবসময়েই সব খানিই যৌন রঙে রঞ্জিত—একথা সত্য মনে না করলেও চলে।

গ) অন্তঃক্ষেপ

প্রক্ষেপে নিজের মনোভাব অন্যের উপর আরোপ করা হয়। অন্তঃক্ষেপ ঠিক তার বিপরীত। শিশুকে মা বলছেন 'না, এ কাজটা তুমি ক'রোনা, ওটা ভালো নয়'। বাবা ছেলেকে বলছেন, 'তুমি পড়াশুনা কর'। শিশুর ইচ্ছা সে খেলে। একদিকে শিশুর ইচ্ছা, অন্যদিকে বাবা মায়ের অনুশাসন—একটা বিরোধ সৃষ্টি হল, শিশুর মনে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হল। 'এটা করব, এটা করব না'। শেষ পর্যন্ত শিশুর কাছে মা-বাবার অনুশাসনটাই বড় হল। মা-বাবা তাকে ভালবাসেন, সে ভালবাসা হারাতে সে রাজী নয়।

কিন্তু অমন মনোভাব ও আচরণ সুখের নয়। বাইরের অনুশাসন তাকে মানতেই হচ্ছে এটা তাকে মনে মনে খাটো করে। ধীরে ধীরে মা-বাবার ইচ্ছাকে সে নিজের অন্তরে গ্রহণ করলো—মা-বাবার ইচ্ছাকে সে নিজের করে নিল। একদিন যেটা ছিল বাইরের অনুশাসন এখন সেটা হল তার নিজের অন্তরের অনুশাসন। নিজেকে নিজে বললে, 'না এটা ক'রনা—এটা ভালো নয় ; ওটা ভালো, ওটা ক'র'। অন্তঃক্ষেপ সুষ্ঠ ও সম্পূর্ণ হলে মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, মনের স্থৈর্যও ফিরে আসে। এই অন্তঃক্ষেপের ফলে শিশুর মনে অধিশাস্তা বা অধিঅহমের জন্ম নেয়।

শাসন ও অনুশাসন এবং অধিঅহম

যার কাছ থেকে শিশু ভালোবাসা পায় বা পাবার আশা করে, তার ভালোবাসা হারাবার ভয়ও শিশু জীবনের একটি বড় কথা। ভালোবাসা পাত্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, শাসন অনুশাসন, শিশুর অন্তঃক্ষেপের প্রধান কারণ। যার ভালোবাসা শিশু কোনদিন পায়নি, যার ভালোবাসাকে শিশু মূল্য দেয়না, তার শাসন শিশুর চোখে উৎপীড়নেরই নামান্তর। অমন উৎপীড়ন শিশুকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে, বিদ্রোহী করে—অমন

উৎপীড়নকে শিশু কখনও আত্মীকরণ করেনা। দুষ্ক্রিয়পরায়ণেরা পিতা-মাতার ভালোবাসা পায়নি, পেলেও সামান্যই পেয়েছে—তাদের জীবনে জুটেছে শাস্তি, পিতামাতার ভৎ´সনা ও নিগ্রহ—অবজ্ঞা, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার। এমন কথা বহুলাংশে সত্য।

শিশু সম্বন্ধে মা-বাবার মনোভাব তার কাছে আয়না সদৃশ*। ছোটবেলায় ঐ আয়নাতে সে নিজেকে দেখে, মা-বাবা তাকে ভালো বললে শিশু নিজেকে ভালো ভাবে, মন্দ বললে নিজেকে সে মন্দ ভাবতে শেখে। তার সম্বন্ধে মা-বাবার অভিমতকে সে নিজের অন্তরে গ্রহণ করে। অন্তঃক্ষেপের ফলে যে শিশু দিবারাত্র শুনছে সে খারাপ—'আমি ভালো নই, আমি খারাপ', এই ধারণাটি তার মনের মধ্যে প্রোথিত হয়ে যায়।

ঘ) আবেগের স্থানান্তরণ

একটি লোক ঘরে বসে কফি খাচ্ছিলেন। এমন সময় তার বাড়ীতে আগুন লাগে। এর পর থেকে কফি সম্বন্ধে তার মনে ভয়ের জন্ম হল। ভয়ের কারণটি সম্বন্ধে ভদ্রলোক তেমন সচেতন ছিলেন না। কার্য কারণ সম্বন্ধে ভদ্রলোক বিশেষভাবে সচেতন হওয়ার পর কফি সম্বন্ধে অমন ভয় বহুল পরিমানে দূর হয়ে গেল।

ঙ) আবেগের পাত্রান্তরণ

বাবার উপর মায়ের রাগ হয়েছে। কিন্তু বাবার উপর খোলাখুলি মা রাগ করছেন না—বাবাকে তিনি সমীহ করেন, আবার কিছুটা ভয়ও করেন। ছোট ছেলের উপর মা সেই ঝালটা ঝাড়লেন, তাকে খুব মারলেন। একে বলা হয় 'আবেগের পাত্রান্তরণ'। আবেগের স্থানান্তরণেরই এটি একটি রূপ।

* Cyril Burt—The Young Delinquent.

বাবাকে শিশু ভয় করে। মাঝে মাঝে বাবা তাকে বকেন, মারেনও। বাবার চিৎকারে শিশু শঙ্কিত ও ভীত হয়। আবার, শিশু বাবাকে ভালবাসে, বাবাও তাকে ভালবাসেন। শিশু বাবাকে ভয় করতে চায় না। শিশুর নিজ্ঞান মন বাবাকে দুইভাগে ভাগ করে—'ভালোবাবা' ও 'মন্দবাবা'। বাস্তবে তার চোখে বাবা ভালো। মন্দবাবার একটি প্রতীক সে খুঁজে নেয়। ছোট ছেলে হ্যানসের * চোখে প্রতীক হয়েছিল ঘোড়া। বাবা ভালো—হ্যানস তাকে ভালবাসে। ঘোড়া মন্দ, ভয়াবহ—হ্যানস তাকে দেখলে আতঙ্কিত হয়। বাবার প্রতি তার অবদমিত ভয় পাত্রান্তরিত হল ঘোড়ার উপর। পাত্রান্তরণের এমন দৃষ্টান্ত জীবনে ভূরিভূরি ঘটে থাকে।

চ) যুক্তি উদ্ভাবন বা যুক্ত্যাভ্যাস

কোন কোন ক্ষেত্রে মা নিজেকে বোঝান এবং ছেলেকে বলেনও—'তুমি বড় দুষ্টু হয়ে গেছ। পড়াশোনায় একেবারে মন নেই কেবল খেলা কর। মার-ই তোমার একমাত্র ওষুধ'। শিশুকে মারার প্রধান কারণ, বহুক্ষেত্রেই শিশুর অন্যায় নয়, অন্য কোন কারণে মায়ের মনে বিরক্তি ও রাগ। কিন্তু আমার রাগ হয়েছে তাই আমি শিশুকে মারছি—একথা ভাবতে বা বলতে নিজের কাছে নিজেই মা ছোট হয়ে যাবেন। আত্মপক্ষ সমর্থন করবার জন্য মা আত্মপ্রবঞ্চনার পথ বেছে নিলেন, একটা যুক্তি উদ্ভাবন করলেন। এই যুক্তি যে সত্য নয়, এটা যে মা বোঝেন না—এমন নয়, তবে সবটা বোঝেন না। বুঝতে চান না—অস্পষ্টতার আড়ালে সত্যকে রাখতে চান। যে জীবন আমরা যাপন করি, তা বহুলাংশে মিথ্যাশ্রয়ী। নিজের কাছে নিজের অপ্রকট হওয়ায় সৌন্দর্য থাকতে পারে, আবার বিপদও আছে। যুক্তি উদ্ভাবনের অনেক দৃষ্টান্ত আছে—যাদের সত্যিকারের কারণটি সচেতন মন কিছু জানে না, মন গড়া কারণটিকেই মানুষ সত্য বলে বিবেচনা করে।

* Sigmund Freud—Collected Papers

ছ) ক্ষতিপূরণ সাধন

ডেমোস্থেনিস ছোটবেলায় তোতলা ছিলেন। ঐ ত্রুটি তাকে পীড়িত করত, অপরের চোখে তাকে ছোট করত, নিজেকে তার ছোট মনে হত। তিনি সঙ্কল্প করলেন…তিনি বড় হবেন। সাধনার ফলে শেষ পর্যন্ত হলেনও তাই। শৈশবের হীনতাবোধ তাকে উচ্চাশার পথে ঠেলে দিয়েছিল। একে মনোবিদ্যায় ক্ষতিপূরণ সাধন বলা হয়।

হীনত্ববোধে পীড়িত মানুষ বড় হবার পথ বেছে নেয়। যাদের প্রতিভা আছে—তারা পারেও। আবার, যাদের মধ্যে প্রতিভা নেই, সাধনা নেই—তারা সারাজীবন হীনতাবোধে ভোগে। এদের মধ্যে কেউ কেউ রাজাউজির জাতীয় আকাশ কুসুম কল্পনায় নিজেকে বিভোর করে, অসুস্থতার পথ বেছে নেয়। তাদের মধ্যে বিরাটত্বের ভ্রান্তবিশ্বাস জন্মায়।*

জ) বিপরীত মনোভাব

যদি কোন আবেগ বা ইচ্ছা স্বাভাবিক প্রকাশে দুস্তর মানসিক বাধার সম্মুখীন হয়, সময় সময় ঐ ইচ্ছা বা আবেগ বিপরীতধর্মী ইচ্ছা বা আবেগে আত্মপ্রকাশ করে। কাম ইচ্ছা মানুষের স্বাভাবিক। যাদের জীবনে অমন পরিতৃপ্তি রুদ্ধ—যেমন অল্পবয়সী বিধবা, বেশী বয়সেও বিবাহ সম্ভব হয়নি এমন কোন স্ত্রী-লোক—কোন কোন সময়ে দেখা যায়—কামের

---

* প্রকৃত কথা—ছোট বড় এই দুটি কথার কোন মানে হয়না। কে বড়, কিসে বড়? বিচার করলে—কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়। সবাই একই মানুষ। ক্ষুধাতৃষ্ণা, প্রেম, ঘৃণা—সবই তাদের এক। সবাই এই পৃথিবীতে জন্মায়, কিছুকাল থাকে, তারপর চিরদিনের জন্য চলে যায়। এর ব্যতিক্রম কোথায়ও নেই। কিন্তু এই সত্য কি আমাদের মনে থাকে? ছোটবড় ভাবাটা মানুষের মজ্জাগত—কিন্তু সেটা যে ভুল এটা বোঝাও তাদের কঠিন। মরীচিকার পিছনে মানুষ চলছে, চলবেও। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে, পারমার্থিক জ্ঞানের দ্বারা, মনঃ-সমীক্ষার দ্বারা এই ভ্রান্তি অনেকাংশে নিরসন সম্ভব।

প্রতি তাদের তীব্র ঘৃণা। তবে এমন ঘৃণা যে অতৃপ্ত স্ত্রীলোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ একথা সত্য নয়। অবরুদ্ধ, অবদমিত ভালোবাসা মাঝেমাঝে আত্মপ্রকাশ করে ভয়ে।

ঝ) আচরণ ও মনোভাবে আবেগশূন্যতা

মানসিক জগতের সবচেয়ে বড় সত্য—আবেগ। আবেগ ও ইচ্ছা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ইচ্ছা ও আবেগ তুই মিলেই একটি মানসিক সত্য —এমন কোন কোন মনোবিদ মনে করেন। ওরেকসিস একটি গ্রীক শব্দ। ওরেকসিস নামকরণ করে, আবেগ ও ইচ্ছার অন্তর্নিহিত অভিন্নতা কেউ কেউ বোঝবার চেষ্টা করেছেন। আবেগ যোগায় প্রেরণা, ইচ্ছা দেয় রূপ। কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে সব কিছুই তারা করছে, কিন্তু আবেগশূন্যভাবে। তাদের আচরণে, এমনকি ইচ্ছাতেও আবেগের কোন স্পর্শ নেই।

জীবনে যা চায় এরা তা পাবেনা—এমন একটা নিগূঢ় ভয় তাদের মনে বাসা বেঁধেছে। মনপ্রাণ দিয়ে চাইতে, সমস্ত আবেগ দিয়ে যে চাওয়া ব্যর্থতার আঘাত তাদের গুরুতরভাবে বাজবে। সন্ত্রস্ত মানুষ আবেগকে তার মনোজগৎ থেকে নির্বাসন দেয়। ব্যর্থতার ক্ষোভ থেকে মুক্তি পাবার এটি একটি অন্যতম পথ, মানসিক প্রতিরক্ষার এটি একটি কৌশল।

আবেগের উদ্‌গতি বা উন্নয়ন

এ পর্যন্ত যেসব মানসিক প্রতিরক্ষার কৌশলের কথা বলা হল—তাতে কিছুটা মানসিক অসুবিধা, কিছুটা অস্বস্তি ও অস্বচ্ছন্দতা বোধ থাকে।

জোনসের ধারণা—উদ্গোগতি বা উন্নয়ন উদ্যোগ ঐ অস্বচ্ছন্দবোধ মুক্ত। ইচ্ছার জৈবিক পরিতৃপ্তি মনের সবকিছু নয়, মনের স্বীয় তাগিদেই সে কিছু পরিমাণে উদ্যোগের পথ বেছে নেয়। এতে কিছুটা ত্যাগ তাকে

করতে হয় কিন্তু ঐ ত্যাগ তাকে পূর্ণতর আনন্দের সন্ধান দেয়।

প্রবৃত্তির উদ্গোগতি—উচ্চতর অভিব্যক্তির দ্বারা ব্যক্তির নিজের ও সমাজের হিতসাধন করে। মানসিক ব্যাধি ও দুষ্ক্রিয়া প্রবৃত্তি পরিতৃপ্তির নিম্নতর প্রকাশ।

উদ্গোগতির সর্বোত্তম প্রয়াস চারুকলা, কাব্য ও সঙ্গীত। বিজ্ঞান ও দর্শনচর্চা। আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধেও একথা বলা চলে। এই সমস্তের প্রেরণা যোগায় প্রধানতঃ রূপান্তরিত যৌনশক্তি। যোধন প্রবৃত্তি অমন প্রেরণার একটি উৎস। অমন রূপান্তরণে অবদমনের একটি স্থান আছে। জৈবিক ইচ্ছা অবদমিত হলে প্রতিভাযুক্ত মনে সেটা কল্যাণকর্মের প্রয়োজনে রূপান্তরিত হয়। সময় সময় মানুষের অকল্যাণও ঐ শক্তির দ্বারা সাধিত হয়। রাজনীতিবিদ এবং বিজ্ঞানীরাও এ্যাটম বোমা বানিয়েছেন, তার প্রয়োগ করেছেন।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটি সৃজনাত্মক প্রতিভা রয়েছে—কম বা বেশী। যৌনশক্তি বা যোধন প্রবৃত্তির রূপান্তরণেই ঐ প্রতিভার জন্ম, একথা না ভাবলেও চলে। তবে একথা নিশ্চয়ই সত্য যে জৈবশক্তি রূপান্তরণের ফলেই ঐসব প্রতিভার কলেবর বৃদ্ধি পায় এবং পূর্ণতা লাভ করে।

সৃজনাত্মক প্রতিভার পরিচয় সব কাজেই পাওয়া যায়। একটি কাঠের চেয়ার বানানো থেকে পদার্থবিদ্যার উচ্চতর গবেষণায়। সৃজনাত্মক কাজ মানসিক স্বাস্থ্যের সহায়ক।

প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে একটি স্বকীয়তা আছে। তার পূর্ণতর বিকাশকে ম্যাসলো নামকরণ করেছেন 'আত্মোপলব্ধি'*। মানসিক স্বাস্থ্যকে তা অটুট রাখতে সাহায্য করে। কবি, শিল্পী ও বিজ্ঞানীদের

* Self-actualisation

জীবনে কিছুটা মানসিক অসুবিধা থাকে। কিন্তু তাদের চিত্তের ঐশ্বর্য, সুষ্ঠু—আত্মপ্রকাশের ফলে তারা একেবারে ভেঙ্গে পড়েন না, পুরোদস্তুর মানসিক রোগ তাদের কমই হয়।* সিজোফ্রেনিয়া রোগীদের রোগ নিরাময় ত্বরান্বিত করবার জন্য—'কর্মথেরাপি' ডাক্তারেরা ব্যবহার করেন।

* Frank Barron—In Creativity. Edited by P. Versons.

মানসিক স্বাস্থ্য

মানসিক স্বাস্থ্য বলতে কি বোঝায়—সর্বাগ্রে এটাই আমরা আলোচনা করব। মানসিক স্বাস্থ্য সম্পন্ন তারাই, যারা মানসিক রোগগ্রস্ত নয়। শারীরিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যের তুলনা করে বিষয়টির অবতারনা করছি। শরীর দিয়েই শুরু করছি। এমন কোন লোক আছে কি, যার কোনদিন শারীরিক রোগ হয়নি? সর্দি, জ্বর, মাথাধরা ও পেটের অসুখ—এগুলি মানুষের নিত্যসঙ্গী। কারুর বেলায় বেশী ও কারুর বেলায় কম। কিন্তু এমন কিছু রোগ আছে, যেগুলি দীর্ঘস্থায়ী বা চিরস্থায়ী। এদের সম্বন্ধেই শুধু বলা চলে যে, অমন রোগগ্রস্তদের দৈহিক স্বাস্থ্যের প্রকৃতই অভাব ঘটেছে।

মানসিক রোগের ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা কিছুটা অন্যরকমের। অমন রোগ একবার হলে তা ছাড়তে চায়না। মানসিক রোগাক্রান্তরা চিকিৎসার ফলে বা আপনা থেকে ভালো হলেও তাদের পরিপূর্ণ মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া কঠিন, অনেক সময় অসম্ভব। চারিত্রিক কিছু অসুবিধা তাদের থেকে যায়ই। এজন্যই বলা যায় যে, মানসিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রথম লক্ষণ তারা মানসিক রোগে ভোগে না। কিন্তু একথা কি সবখানি সত্য? মানসিক রোগ বহু ধরণের। কেবলমাত্র কোন এক ধরণের রোগে লোকে সাধারণতঃ ভোগেনা। রোগ সাধারণতঃ হয় মিশ্র ধরণের। দু-চার জাতীয় রোগলক্ষণ একসঙ্গে রুগ্ন ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায়। যে রোগলক্ষণটির প্রাধান্য, সেই রোগটিই কারুর হয়েছে এমন আমরা বলি।

বিভিন্ন জাতীয় রোগ সম্বন্ধে 'মানসিক রোগ' অধ্যায়টিতে আমরা

মোটামুটি আলোচনা করব। এখানে বিভিন্ন জাতীয় মানসিক রোগের কিছু কিছু লক্ষণ আমরা উল্লেখ করব। অহেতুক বা সামান্য কারণে উৎকণ্ঠা, আশঙ্কাগ্রস্ত মন, অকারণ বা অল্পকারণে অবসাদ ও বিষণ্ণতা ইত্যাদি। এদের মধ্যে উৎকণ্ঠা প্রায় সবরকম মানসিক রোগেই বর্ত্তমান। কিন্তু অহেতুক উৎকণ্ঠায়, সামান্য কারণে উৎকণ্ঠায় কি আমরা সবাই ভুগিনা? রুগ্ন ব্যক্তিদের ভয় মাত্রাতিরিক্ত, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে তেমন নয়। কিন্তু যুক্তি বিবেচনা বর্জিত ভয় ও আশঙ্কায় ভোগেনা এমন লোক খুব কমই আছে। আমাদের সকলেরই কিছুনা কিছু অসুবিধা আছে, তবুও আমরা অধিকাংশই সাধারণের চক্ষে সুস্থ স্বাভাবিক বলেই বিবেচিত হব। সাধারণ লোকদের জীবনে উৎকণ্ঠা, বিষাদ মাত্রাতিরিক্ত নয়। সংক্ষেপে বলা যায় এক আধটু অসুবিধা সবার জীবনে আছে। সেই সব রোগলক্ষণ যখন মানুষকে বিপর্যস্ত করে তখনই তেমন মানুষকে আমরা মানসিকরোগী বলি।

তবে কি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত মানুষ হতে পারেনা, কিম্বা নেই? নিয়ত প্রফুল্ল, উদ্বেগশূন্য মানুষ কি হয় না? গীতায় অমন মানুষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—তাঁরা নিরুদ্বিগ্নচিত্ত, সুখ-দুঃখ, জয়পরাজয়কে এঁরা সমভাবে গ্রহণ করেন। এঁরা স্থিতপ্রজ্ঞ—সাধনা দ্বারাই অমন অবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভব। এমন অবস্থা আদর্শ মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচয়। এমন আদর্শ মানসিক স্বাস্থ্যেকে সামনে রেখেই ব্যক্তিবিশেষের মানসিক স্বাস্থ্যকে বিচার করবার দরকার। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের স্বাস্থ্যের স্বরূপকে বিচার করেই আমরা বলি—এরা মোটামুটি সুস্থ। একে বলা হয় পরিসাংখ্যিক সুস্থতা বা সাধারণ মানসিক স্বাস্থ্য। একে অনেক সময় যুক্তিযুক্ত মানসিক রোগ লক্ষণমুক্ত বলা হয়।

অমন রোগ মুক্তি মানসিক স্বাস্থ্যের একটি দিক। কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্য কি কেবলমাত্র রোগলক্ষণ মুক্ত মন? প্রকৃতপক্ষে মানসিক স্বাস্থ্যের কয়েকটি সদর্থক বৈশিষ্ট আছে যাদের কোন মতেই উপেক্ষা করা চলেনা।

সুস্থ ব্যক্তিদের মনে সন্তুষ্টি আছে, শান্তি আছে। প্রাত্যহিক জীবনে যা ঘটে তার মধ্যে তারা আনন্দ খুঁজে পায়।

মানুষের প্রতি তারা বন্ধুভাবাপন্ন, মানুষকে তারা প্রকৃতই ভালবাসে। অন্যদের প্রতি ভয় থাকলে কেউ কেউ ভালবাসার ভান করে। সুস্থ ব্যক্তিদের ভালোবাসা সে ভালোবাসা নয়। মানুষের শত্রুতাচরণ সত্ত্বেও তাদের মনে মানুষের প্রতি সহজ প্রীতির ভাবটা অক্ষুণ্ণ থাকে।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কিছু সুপ্ত সম্ভাবনা থাকে। কিছু কিছু লোকের মনে অন্তর্নিহিত বাধার জন্য সেসব সম্ভাবনা প্রস্ফুটিত হয় না। যারা সুস্থ তাদের মধ্যে বাধা কম। স্বচ্ছন্দ বিকাশের ক্ষমতা তাদের মধ্যে থাকে। বাইরের বাধা আলাদা জিনিষ। অপরিসীম দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, ঘোরতর কুসংস্কারের অন্ধকার যে সমাজে, যে যা হতে পারত তা সে হতে পারছেনা, এমন হাজার হাজার দৃষ্টান্ত আছে। মানসিক স্বাস্থ্য বিচারে সে বাধার কথা আমরা বলছিনা।* যে অনতিক্রম্য মানসিক বাধা মানুষের সহজ বিকাশকে রুদ্ধ করে, তার মন সুস্থ নয়।

মানসিক স্বাস্থ্যের দুটি দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। একটি নেতিবাচক দিক ও অপরটি সদর্থক দিক। অপেক্ষাকৃত রোগ মুক্তির দিকটা নেতিবাচক দিক এবং অন্যপক্ষে সদর্থক দিক হল মনের সুখিত্ব, মানুষের প্রতি বন্ধুভাব, ব্যক্তির প্রতিভার বাধামুক্ত বিকাশের ক্ষমতা।

মানসিক স্বাস্থ্যে বাস্তবজ্ঞানের স্থান

যাদের জীবনে বাস্তবজ্ঞানের পূর্ণবিকাশ হয়েছে বাস্তবজ্ঞানের দ্বারা

* একথা বলার মানে এই নয় যে বাইরের অমন সব বাধা দূর করার প্রয়োজন কিছুমাত্র কম। মানুষকে মানুষের মত বাঁচবার অধিকার দিতেই হবে। দারিদ্র্য দূর করতে হবে, শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে, কুসংস্কারের জগদ্দল পাথরকে দূরে ঠেলে সহজ সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করবার সুযোগ যাতে প্রতিটি মানুষ পায় তা নিশ্চয়ই করতে হবে।

যে জীবন পরিচালিত—তারাই সুস্থ যদি আমরা মনে করি, তবে ঐ কষ্টিপাথরের বিচারে অধিকাংশ মানুষই পূর্ণ স্বাস্থ্যের অধিকারী নয়। কিন্তু কিছু অসুবিধা থাকলেও সে সব বাধা মানুষের জীবন যাত্রায় বিশেষ বিঘ্ন ঘটায় না—আদর্শ মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী না হলেও সাধারণ ভাবে তারা মনের দিক দিয়ে যে সুস্থ এমন আমরা মনে করি। অমন লোকেরা পড়াশোনা করতে পারে, কাজকর্ম করতে পারে, মানুষের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধটি মোটামুটি ভালো। অমন সাধারণ স্বাস্থ্য নিয়েই চিকিৎসকেরা, শিক্ষক-শিক্ষিকারা সন্তুষ্ট থাকেন।

এবারে মানসিক স্বাস্থ্যের সদর্থক বৈশিষ্ট্য নিয়ে কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

সদর্থক বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

ক) সুখিত্ব

সুখিত্ব একটি স্থায়ী মনোভাব। এটা ক্ষণেকের সুখ বা আরামবোধ নয়। যে সুখী সব ব্যাপারেই তার ঐ মনোভাবটি মোটামুটি বজায় থাকে। দুর্ভাগ্য এলে অল্পক্ষনের জন্য তা মনকে আচ্ছন্ন করে। কিন্তু ধীরে ধীরে মনের নিজস্ব সুরটি মনে ফিরে আসে*। সুখিত্বের তারতম্য আছে—কেউ বেশী সুখী, কেউ কম। কিন্তু একান্তরূপে কেউই অসুখী নয়।

সুখিত্বের তিনটি অংশ। ১। শান্তি, ২। সন্তোষ ও ৩। প্রাত্যহিক ঘটনা থেকে সুখলাভের ক্ষমতা।

শান্তি

যে মনে শান্তি আছে—উৎকণ্ঠা তাকে পীড়ত করে না, বিরক্তিতে সে মন নিয়ত তিক্ত হয়না। বিষন্নতার কালো মেঘ তার মনকে সদা সর্বদা আচ্ছন্ন করে না, জীবনকে তার একঘেয়ে বলে বোধ হয়না, অর্থহীন

* Perly Nunn—Education its data : First Principles.

মনে হয়না, কাজকর্মে সে সর্বদাই একটা নতুনত্বের আভাস পায়। এটা সত্য—শান্তি মনের নিজস্ব সুর। জীবনের কাছ থেকে ক্ষণেকের জন্য সরে দাঁড়াতে পারলে, কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসতে পারলে, অন্তর থেকে শান্তিভরা মনকে অভিষিক্ত করে।

কিছুই কিছু নয়, কোন কিছুই থাকবেনা অমন চিন্তা যখন কামনা-বাসনার মূলকে কিছুটা শিথিল করে, শান্তি তখন মনে উদয় হয়। অহমবোধ মানুষের শান্তিলাভের অন্তরায়। অহমবুদ্ধিকে আশ্রয় করে মানুষের কামনাবাসনার আধিক্য।

সন্তোষ

নিজের যা কিছু আছে, সেটা নিয়ে যারা সন্তুষ্ট তাদের মনে সন্তোষ আছে। নিজের আরও ভাল হোক, আরও উন্নতি হোক এরা চায় না এমন নয়। তবে কেন হল না, এমন চিন্তায় এরা অহর্নিশ দগ্ধ হয়না। এদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সহজ ও সীমিত, এদের সামর্থ্য ও সাধনার সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা যাদের বেশী, মূলতঃ নিজেদের তারা গ্রহণ করতে পারছে না। আমি 'আমি' থাকতে চাই না—অন্য কেউ হতে চাই, অন্য কিছু হতে চাই—এটাই উগ্র উচ্চাকাঙ্ক্ষার গভীরতর অর্থ।

নিজেকে, নিজের বাস্তবকে এরা ঘৃণা করে, এরা সুখী হবে কেমন করে! এমন আত্ম-বিদ্বেষ এদের মনের কাছে স্পষ্ট না হলেও গভীর মনে এটাই আসল কথা।

কিছুদিন আগে লেখকের একটি অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে সন্তোষের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যের উচ্চ সদর্থক পারম্পর্য, উগ্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানসিক অস্বাস্থ্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত।

দৈনন্দিন ঘটনা থেকে আনন্দ আহরণের ক্ষমতা

মানুষের জীবনে বড় বড় নাটকীয় ঘটনা কমই ঘটে। দৈনন্দিন ঘটনা নিয়েই মানুষের জীবনযাপন। সুখিত্ব প্রাত্যহিক জীবনের ছোট ছোট

আনন্দকে আশ্রয় করেই প্রকাশ পায়। কিন্তু তবু একথা সত্য-ঘটনা বা বস্তুবিশেষ জীবনের আনন্দের প্রধান উৎস নয়, তারা সুখী যারা প্রায় সব ব্যাপারেই সুখ পায়, সামান্য কিছুতে যারা আনন্দ খুঁজে পায়—আনন্দ তাদের মনে। শীতের সকালে এক কাপ চা খেয়ে একজন বিশেষ আনন্দ পেল—'বাঃ শীতের সকালে চা, কী চমৎকার'! কিন্তু আরেকজন চা খেল উদাসীনভাবে, অভ্যাসবশতঃ। অপর একজনের মনে হল—'চা'টা তেমন ভালো নয়, মিষ্টিও কম হয়েছে—চা'টা বিস্বাদ', যার যা মনোভাব—চা থেকে সে তাই আহরণ করলো।

ছোট-খাটো ঘটনা থেকে আনন্দ আহরণের ক্ষমতা সুখিত্বের একটি বৈশিষ্ট্য। কেবল মাত্র নাটকীয় ঘটনা ছাড়া যাদের মনে সুখের রেখাপাত করেনা, তারা সুখী নয়, বহুলাংশে অসুখী।

মানসিক রোগ মুক্তি ও সুখিত্ব

মানষিক রোগমুক্তির সঙ্গে সুখিত্বের একটি গভীর সম্বন্ধ আছে এমনও পাওয়া গেছে। অনুসন্ধানে দুটির মধ্যে '৬ থেকে '৭ পর্যন্ত পারম্পর্য্য লক্ষ্য করা গেছে। দুটি এক নয়, তবে তাদের সম্বন্ধটি খুবই নিকট। সুখী যারা, তারা বহুলাংশে মানসিক রোগ মুক্ত, মনের স্বাস্থ্য যাদের ভালো তারা অনেকাংশে সুখী।

খ) বন্ধুভাব

সুখিত্ব ছাড়াও আরও দুটি সদর্থক বৈশিষ্ট্য সুস্থব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায়, তার একটি হল বন্ধুভাব। যারা সুস্থ, মানুষের প্রতি তারা বন্ধু-ভাবাপন্ন। মানুষের কাছে মানুষের চেয়ে বড় কিছু নেই, মানুষ অমৃতের উৎস, আবার কখনও কখনও এই মানুষই মানুষের কাছে গরল হয়ে ওঠে। মানুষের প্রতি যাদের সহজ বন্ধুভাব মানুষের সঙ্গ ও সাহচর্যে তারা আনন্দ পায়। মানুষের প্রতি যাদের অবিশ্বাস, মানুষের সন্নিধ্যকে তারা ভীতির চক্ষে দেখে, মানুষের প্রতি তাদের বৈরীভাবই প্রধান, মানুষের নৈকট্যকে

তারা দুর্ভাগ্য বলে মনে করে। জীবনে আনন্দের একটি বড় উৎস ধারা থেকে তারা বঞ্চিত।

মানুষের প্রতি যাদের বন্ধুভাব তাদের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা যায়। এরা সহজে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে। অবার সেই বন্ধুত্বও এরা বজায় রাখতে পারে। অনেকে আছে—যারা বন্ধুত্বকে এড়িয়ে চলে, মিশলেও উপুর উপুর মেশে, সত্যিকারের বন্ধু এদের কেউই নেই। আবার কারুর কারুর বেলায় দেখা যায় বন্ধুত্ব করতেও এদের দেরী হয়না, আবার ভাঙতেও এদের সময় লাগেনা। ছোটদের বেলায় ভাঙা বন্ধুত্ব সহজেই জোড়া লাগে। এদের বেলাতে একবার ভাঙলে তা সহজে আর জোড়া লাগেনা। এরা বিকৃত মানসিক শৈশবে ভোগে। মানসিক রোগের এটি একটি বৈশিষ্ট।

কারুর কারুর আচরণে আপাতঃদৃষ্টিতে মানুষের প্রতি বন্ধুভাব। অন্যেরা যে যা বলে তাতেই তারা সায় দেয়। অন্যদের এরা মনে মনে ভয় করে। প্রকৃত কন্ধুত্ব ভীরুতা নয়, নিজেকে প্রকাশে, নিজের মতামত জ্ঞাপনে এরা ভয় পায়না। মানুষের প্রতি বিশ্বাস, বন্ধুভাবের অপরিহার্য অঙ্গ। মতান্তর হলেই মনান্তর হবে এ কেমন কথা! এমন যদি কখনও ঘটেও তাই বলে অমন বন্ধুত্বের খাতিরে নিজেকে অস্বীকার করতে হবে? এর মধ্যে সুস্থমনের দৃঢ়তা কোথায়? সুস্থমন সবল, যারা শক্তিমান, প্রয়োজনে একা থাকতে ভয় পায়না। দুর্বল ভীরুমন নিজেকে বিশ্বাস করে না, অপরকেও বিশ্বাস করেনা।

গ) অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বাধামুক্ত বিকাশের ক্ষমতা ঃ—

মনের বাধার ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বীয় সম্ভাবনাকে মানুষ বিকশিত করতে পারেনা। মানসিক বাধা আলস্য, মনের অস্থিরতা, চিত্তের বৈকল্যরূপে প্রকাশ পায়। যেখানে একমনা নিষ্ঠার দরকার সেখানে তাদের ইচ্ছায় অভাব হয়। এক পথে গেলে অন্যপথে

যাবার কথা এদের মনে আসে। যে পথে চলছে, সে পথের বাধা-বিঘ্নকে এরা বড় করে দেখে, চলতে ভয় পায়—অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্য পথের আকর্ষণ তখনই তাদের কাছে বড় হয়। একটা বয়সে লক্ষ্য তখনও স্থির হয়নি অমন অনুসন্ধানে কিছুটা স্বাভাবিক। কিন্তু সারা-জীবন ধরে এটা ছাড়ছে, ওটা ধরছে—এটা সুস্থমনের পরিচায়ক নয়। পূর্ণতালাভের পথ এক মনে একাগ্র হয়ে এক পথে চলা।

II

মানসিক স্বাস্থ্য কামের পূর্ণবিকাশের স্থান

এইবার মানসিক স্বাস্থ্য কি, এ প্রশ্নটির বিচার একটু ভিতর থেকে করা হবে। যৌনপ্রবৃত্তি নিঃসন্দেহে জীবনের অন্যতম প্রধান প্রেরণা। এই প্রবৃত্তির সহজ ও স্বাভাবিক পথ এই সমাজে বাধাসঙ্কুল। শুধু আচরণে নয় মনেও যৌন কৌতূহল ও যৌনইচ্ছাকে পাষাণ চাপা দেওয়া হয়। নিজের অঙ্গ সম্বন্ধে শিশুর কৌতূহল আছে। একটি বয়সে সব কিছুরই নাম জানতে চায়—হাত-পা, চোখ-মুখ, নাক-কান, এমন কি যৌন অঙ্গেরও। সব কিছুরই সহজ উত্তর সে বাবামায়ের কাছ থেকে পায়—কিন্তু যৌনঅঙ্গের নাম জিজ্ঞাসা করলে বাবামায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়, শিশুকে শুনতে হয়, চুপ, অমন কথা জিজ্ঞেস করতে নেই। শিশু ভয় পায়। অনেক সময় একেবারে চুপ করে যায়। শিশুর জীবনে তারপর থেকেই যৌনইচ্ছার অবদমনের দীর্ঘ কাহিনী। শিশুর যৌন আচরণের প্রতি বড়দের মনোভাব যৌনইচ্ছার অবদমনকে আরও দৃঢ়মূলে প্রোথিত করে।

মানুষের জীবনে কোন প্রেরণাই এতখানি বাধাপ্রাপ্ত নয়। একারণেই ফ্রয়েড দেখতে পেয়েছেন—যৌন অবদমনই মানসিক রোগের এক প্রধানতম কারণ।

যৌনবিকাশের স্তর

যৌনইচ্ছা ও আচরণের স্বাভাবিক বিকাশের একটি গতি আছে। এ কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। যথা (১) স্বতঃকাম (২) আত্মকাম ও (৩) বস্তুকাম। বস্তুকাম আবার দুটি ভাগে বিভক্ত। যথা (১) সমকাম ও (২) বিপরীতকাম।

১) স্বতঃকাম

দুই এক মাসের শিশুর কাছে জগৎ একাকার। আমি, তুমি, সে, এটা, ওটার মধ্যে যে কোন পার্থক্য আছে, এমন জ্ঞান তার নেই। অমন অবস্থায় তার অনুভূতি হল—আরাম বোধ আর কষ্ট বোধ, ভালো লাগছে, ভালো লাগছেনা। তার মধ্যে 'আমি' বোধ জন্মায় নি—আছে শুধু আরামবোধ ও কষ্টবোধ।

২) আত্মকাম

একটু একটু করে শিশু বড় হয়। সে নিজের ও মায়ের পার্থক্যটি বোঝে। মাকে কাছে পেলে সে প্রসন্ন হয়, মাকে না পেলে সে কাঁদে। মায়ের বুক থেকে সে যে কেবলমাত্র আহার ও পুষ্টি গ্রহণ করে এমন নয়, মায়ের স্পর্শে, মায়ের দুধ চুষে একপ্রকার দেহজ আরামও সে অনুভব করে। ঐ আরামকে, বিশেষতঃ সুখের আরামকে যৌন আরাম বলে মনে করলে অত্যুক্তি হবে না। পরবর্তীকালে স্পর্শ সুখ, চোষা, চুম্বন যৌন পরিতৃপ্তির অংশ রূপে দেখা দেয়।

শৈশবের ঐ স্তর আত্মকামের স্তর। শিশু 'আমি সর্বস্ব', 'আমার জন্যই সবকিছু, এই বিশ্বভূমণ্ডল আমার চারিদিকেই প্রদক্ষিণ করছে।'

৩) বস্তুকাম

আত্মকামের পরেই আসে বস্তুকামের স্তর। নিজের কাছে নিজের যেমন মূল্য, অন্যদের ততটা পুরোপুরি না হলেও, তাদেরও কিছু মূল্য দিতে

শিশুরা শেখে। এই বস্তুকামের পরিপূর্ণতা বয়ঃসন্ধিকালে। বস্তুকামের প্রথম দিকে আত্মকামের ছাপটি সুস্পষ্ট। ব্যাটবল তার খেলার জন্য দরকার, আর দরকার অন্তত একজন খেলার সাথীর। শিশু ব্যাট করবে আর তার সাথী বল করবে। এরা সবাই তার সুখের উপকরণ।

ক্রমে শিশু অনুভব করে যে খেলার সাথী তার মতন একজন মানুষ—তারও সুখ দুঃখবোধ আছে—সুখদুঃখ লাভেরও সে সমভাবে অধিকারী। বয়ঃসন্ধিকালে—বিশেষত্ব কিছুটা পরিণত হলে কিশোর-কিশোরীর চোখে তার বন্ধুও মূল্যবান হয়ে ওঠে। এই স্তরে অন্যকে ভালোবাসা, অন্যের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াও বিচিত্র নয়। বস্তুকামের দুটি ভাগ—সমকাম ও বিপরীত কাম। সমকাম সমলিঙ্গ ব্যক্তিদের—প্রতি ছেলে বা মেয়েদের আকর্ষণ। এই কামে ছেলেরা ছেলেদের ভালবাসে ও মেয়েরা মেয়েদের। এই জীবনে এমন ইচ্ছার সুস্পষ্ট কামের রূপে প্রকাশ কম, এ রূপ নেয় সমসামাজিক ভালো-বাসার। কামের পূর্ণবিকাশ বিপরীত কামে। ছেলেরা আকৃষ্ট হয় মেয়েদের প্রতি ও মেয়েরা ছেলেদের প্রতি। এটা অবশ্য দেখা যায় যৌবনে।

কামের বিকাশ

মনের অন্তর্নিহিত সহজাত প্রেরণাই ঐ কাম বিকাশের প্রধানতম কারণ। তবে কোন কোন লোকের বেলায় দেখা যায় যৌন বিকাশ পূর্ণতা লাভ করেনি—আত্মকাম বা সমকামের স্তরে অবরুদ্ধ রয়েছে।

অঙ্গভিত্তিক কামবিকাশ

কামবিকাশকে আরেকদিক থেকে দেখা বলে। তাকে বলা যায়—অঙ্গভিত্তিক। যে সব অঙ্গের দ্বারা প্রধানতঃ কাম চরিতার্থ হয়—পরপর তাদের নাম উল্লেখ করি। [১] মুখ [২] পায়ু [৩] লিঙ্গ ও যোনি।

সঠিক বলতে গেলে বলতে হয় যে দেহের এমন কোন অঙ্গ নেই যার দ্বারা যৌন সুখলাভ করা যায় না। প্রেমিক-প্রেমিকারা পরস্পরকে দেখে, কথা শোনে, কথা বলে, পরস্পরকে স্পর্শ করে—গোটা দেহের সাহায্যেই যৌনসুখ লাভ করে। যৌন সুখ লাভের প্রধান অঙ্গ বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন রকমের। একান্ত শৈশবে মুখ, একটু বড় হলে পায়ু ও উপযুক্ত বয়সে লিঙ্গ বা যোনি।

মুখকাম

একান্ত শৈশবে মুখই যৌন সুখলাভের প্রধান অঙ্গ। মায়ের দুধ চুষে, সময়ে সময়ে কামড়ে সে সুখ পায়।

পায়ুকাম

ধীরে ধীরে পায়ু তার কাছে বড় হয়। পায়ুস্পর্শন, দলনমর্দন, মল নিষ্কাশন, মল নিরোধ এ সবেতেই সুখ পায়।

লিঙ্গ ও যোনি

লিঙ্গ ও যোনির প্রাধান্য কৈশোর ও নবযৌবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। গোড়াতে লিঙ্গ ও যোনির নিজস্ব মূল্যটাই তাদের চোখে বড় হয়। লিঙ্গ দ্বারা প্রস্রাব করার মধ্যেও সে তার শক্তির পরিচয়, গর্ব ও গৌরব অনুভব করে। ক্রমে লিঙ্গ ও যোনি তার কাছে প্রতিভাত হয় বিপরীত কাম বস্তুর সঙ্গে যৌন সংসর্গের অঙ্গরূপে।

যোনি ও লিঙ্গ বড় হলেও মুখ ও পায়ুর সুখলাভের প্রয়োজন সারাজীবন থাকে। লিঙ্গ ও যোনির প্রাধান্যে মুখ, পায়ু ও অন্যান্য অঙ্গদের অন্তর্ভুক্ত করে বড়দের যৌনজীবন সংগঠিত হয়। যৌন সংসর্গে নরনারী চরম সুখ বা অন্তসুখ লাভ করে। কিন্তু দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, বিভিন্ন যৌন অঙ্গ স্পর্শ করা, চুম্বন ইত্যাদি দ্বারা প্রেমিক প্রেমিকারা 'আদিসুখ' লাভ করে। এই আদিসুখ আনন্দ যোগায় আবার সঙ্গে

সঙ্গে উত্তেজিত করে। চরম সুখলাভে নরনারীকে ঠেলে দেয়। চরম সুখলাভে সাধারণতঃ পূর্ণ যৌন পরিতৃপ্তি ঘটে, যৌন উত্তেজনা সাময়িক-ভাবে প্রশমিত হয়—সুখকর ক্লান্তি দেহ মনে নেমে আসে। অনেকে অমন সুখলাভের পর ঘুমিয়ে পড়েন।*

সংবন্ধন

আংশিক ও পূর্ণ

কামের পূর্ণবিকাশ সকলের জীবনে সমভাবে হয় না। অনেক ক্ষেত্রে জীবনে যৌনবিকাশ আগেকার কোন স্তরে আবদ্ধ হয়ে যায়। একে বলা হয়—কাম সংবন্ধন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে—সম-কামেই মন আবদ্ধ। একটি পুরুষ—অন্য পুরুষই তার যৌনপাত্র—মেয়েদের সম্বন্ধে সে একান্ত উদাসীন। আত্মকামে আবদ্ধ মানুষরা নিজেকে নিয়ে তন্ময় থাকে। এরা চূড়ান্ত স্বার্থপর। অন্যদের কথা ভাববার স্পৃহা এদের মধ্যে নেই।

পূর্ণসংবন্ধন অপেক্ষাকৃত বিরল। আংশিক সংবন্ধনের দৃষ্টান্তই বেশী। বিষয়টিকে আরেকটু ব্যাখ্যা করে বলি। কামবিকাশ যেন একটি নদীর স্রোতধারা। উৎস তার পাহাড়, সমুদ্রে তার শেষ। নদীটি সমতলভূমি বেয়ে চলেছে। নদীটি প্রথমে একটি স্রোতধারা। কিছুদূরে গিয়ে দুটি ধারায় তা বিভক্ত হল। একটি প্রধান স্রোতধারা, দ্বিতীয়টি শাখানদী। প্রধান স্রোতধারাটি আরও এগিয়ে চললো—আবার তারই থেকে বেরুলো আরেকটি শাখা। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন দেখা গেছে—

* কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ মেয়েদের বেলাতে এই রাগমোচন বা চরমসুখ ঘটে না। এর কারণ অনেকসময় স্ত্রীমনে যৌনশৈত্য কিম্বা পুরুষের প্রয়োজনীয় যৌনক্ষমতার দৈন্য। আদি সুখের দ্বারা যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধির পর যৌনকর্মটি সম্পন্ন হলে সাধারণতঃ রাগমোচন সম্ভব হয়। সময় সময় পুরুষেরা ধৈর্যের অভাবে আদিসুখ, প্রেমনিবেদন কাজটি অসম্পূর্ণ রেখে চরম সুখ পাওয়ার প্রয়াস তারা করে। মেয়েদের জীবনে বোধহয় ভালোবাসা ও প্রেম গভীরতরভাবে যুক্ত।

শাখা নদীটির মধ্যদিয়ে নদীর বেশীর ভাগ জল প্রবাহিত হচ্ছে, যেটি প্রধান নদী সেটি শীর্ণকলেবর।

কাম বিকাশের ধারার প্রথমটি স্বতঃকাম। তারপর একজায়গায় প্রধান স্রোতটি রূপ নিল আত্মকামের—স্বতঃকামও কিন্তু একবারে লুপ্ত হলনা। একটি অপেক্ষাকৃত শীর্ণ শাখারূপে প্রধান স্রোতের পাশাপাশি সে বয়ে চললো। আত্মকামরূপী প্রধান শাখা রূপ নিল বস্তুকামে। প্রথমদিকে সমকামের, তারপরে বিপরীতকামে। স্বাভাবিক জীবনে সেটাই কামের প্রধান ধারা। আগেকার কোন কাম প্রয়োজনই কিন্তু লুপ্ত হলনা। সব কয়টিই বিভিন্ন শাখারূপে দেহমনে বয়ে চললো।

সুস্থমনে, স্বাভাবিক বিকাশের ফলে বিপরীত কাম পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু এমনও দেখা যায়—কোন কোন জীবনে বিপরীত কামের জন্ম হয়েছে সত্য, কিন্তু তবু তা দুর্বল—সমকামবাসনাই প্রবল। শাখা-নদীটিই হয়েছে পুষ্ট, প্রধান স্রোতধারা ক্ষীণ ও শীর্ণ। এটা আংশিক সংবন্ধনের দৃষ্টান্ত। নারীকে যদি কেবলমাত্র নারীই আকৃষ্ট করে, পুরুষকে পুরুষ—তাকে বলা যায় পূর্ণসংবন্ধন। কিন্তু মেয়েদের প্রতি পুরুষের যৌন ইচ্ছা আছে, তবে তা তেমন বলবান নয়, তার থেকে বেশী ভালো লাগে পুরুষদের, তাদের সঙ্গ ও সাহচর্য তাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। একে বলা হয় আংশিক সংবন্ধন।*

---

* আশ্চর্য, সমকামের অবদমিত তৃষ্ণা অনেক সময় একজাতীয় প্রতিরক্ষার কৌশল অবলম্বন করে। বিপরীত কামের প্রতি এমন লোকদের তৃষ্ণার শেষ নেই। তাদের দেহমনে সমকামের তাড়ণাকে ভোলবার তাদের এই হাতিয়ার। গভীরমনে এরা সমকামী। কিন্তু সচেতন মনে অত্যধিক বিপরীত কামের সুরায় এর বিস্মৃতির পথ খোঁজে। নারীকে এরা ঘৃণা করে—কিন্তু নারীসঙ্গ এদের চাইই। লর্ড বায়রণ এমন একটি দৃষ্টান্ত। এমন লোকদের নারী সম্ভোগে, কিন্তু নারীর প্রতি তাদের ঘৃণাও চরিতার্থ হয়।

প্রত্যাবৃত্তি

প্রত্যাবৃত্তি আরেকটি মানসিক প্রক্রিয়া। এর একটি দৃষ্টান্ত দিই। একটি মনে আত্মকামে মনের আংশিক সংবন্ধন ঘটেছিল। তার মধ্যে বস্তুকামের আবির্ভাব হল কিন্তু তা দুর্বল। বস্তুকামের পরিতৃপ্তিলাভে তারা ক্ষীণ প্রচেষ্টা প্রতিকূল পরিবেশে বাধাপ্রাপ্ত হল। বস্তুকামের প্রত্যাবৃত্তি ঘটলো আত্মকামে, তার মনে হল তার কাম চরিতার্থ করবার জন্য অন্যকারুকে দরকার নেই—নিজেই সে নিজের কামপাত্র হল। কল্পনা বর্জিত হস্তমৈথুনে সে লিপ্ত হল। প্রত্যাবৃত্তি এবং আংশিক সংবন্ধনের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। কিছুটা সংবন্ধনের ক্ষেত্রেই ক্ষেত্রবিশেষে প্রত্যাবৃত্তি ঘটে।

সংবন্ধন ও প্রত্যাবৃত্তি সুস্থ কামবিকাশের অন্তরায়স্বরূপ। মানসিক স্বাস্থ্যলাভে সুচারু ও পূর্ণ কাম ও প্রেম বিকাশের প্রয়োজন আছে।

III

আবেগজীবনের পূর্ণবিকাশ

আবেগজীবনের বিকাশের আরেকটি দিক আছে। শিশু জন্মায়, বাবামায়ের, বিশেষতঃ মায়ের ভালো বাসার উপর একান্ত নির্ভরতাই তার বেঁচে থাকবার, বড় হবার একমাত্র পাথেয়। একটু বড় হলেই শিশু সেটা হৃদয়ঙ্গম করে। সে মা বাবার ভালোবাসা চায়। ভালোবাসা চাওয়া ও পাওয়া নিয়েই তার জীবন শুরু। ভালোবাসা চাওয়ার সুষ্ঠু পরিতৃপ্তি তার জীবনে অত্যাবশ্যক। জল ও বাতাসের মতনই প্রায় শিশুর জীবনে ভালোবাসা দরকার।

ভালোবাসা যে একমাত্র শিশুরাই চায় একথা বলা চলে না। বড়রাও চায়। সারাজীবন ধরেই মানুষ ভালোবাসা চায়। তবে শৈশবের ভালোবাসা জীবনদায়ক—তাই তার চাওয়াটা হয়ত খুব বেশী। বড়দের ভালোবাসা প্রধানতঃ দরকার নিঃসঙ্গতা ঘোচাবার জন্য, অন্যদের

সঙ্গে তার ঐক্যবোধের জন্য।

নিদারুণ দারিদ্রে ভালোবাসা চাওয়াটা অবশ্য জীবনের প্রয়োজনের উপরই বেশী জোর দেয়। একজন বয়স্ক সাঁওতাল রমনীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—ছেলে তোমাকে ভালবাসে। তার কাছে তুমি কি চাও? উত্তরে সে বললে—"বুড়া বয়সে যেন কিছু খাইতে দেয়।"

পারা বা আত্মপ্রতিষ্ঠার স্তর

শিশু বড় হয়। একমাত্র ভালোবাসা পাওয়ার দ্বারা তার মন ভরে না। নিজের পায়ে সে দাঁড়াতে চায়। নিজের কাজ সে নিজে করবে, নিজের হাতে সে খাবে, স্নান করবে, জামাকাপড় পরবে, হাঁটবে, ছুটবে—এই সব কাজ করে সে আত্মপ্রসাদ লাভ করবে। এইভাবে হাজারো আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে পা সে বাড়ায়। এটাকে বলা যেতে পারে 'পারবার প্রেরণা ও জয় করবার অদম্য কামনা'।* আবেগ-জীবন বিকাশের এটা দ্বিতীয় স্তর।

ভালোবাসা দেওয়া

এর পরে আসে আবেগজীবনের তৃতীয় বা চরম স্তর। ভালোবাসা পেয়ে, বহুলভাবে পেয়েও, মন সম্পূর্ণভাবে ভরে ওঠেনা। সে দিতে চায়, অন্যদের জন্য সে কিছু করতে চায়। অন্যদের ভালোবাসতে, স্বার্থপরতার অন্ধকারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে অন্যদের মধ্যে নিজেকে সে হারাতে চায়। আবেগজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশে—না পাওয়ার ক্ষোভে মন দীর্ণ হয়না, না পারবার অক্ষমতা পীড়িত করেনা, অন্যকে দিয়ে, ভালোবেসে, মন প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আবেগজীবনে প্রত্যেক স্তরে সুষ্ঠু পরিতৃপ্তি আবশ্যক। শিশু জীবনে দরকায় ভালোবাসা পাওয়া। অতঃপর দেখতে হবে নিজের সম্বন্ধে তার যেন আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে। জীবনে পারবার বহু

---

* Will to Power

সুযোগ পাওয়া তার দরকার—যে বয়সে যেমন উপযুক্ত সুযোগ তাই। একটি বয়সে বালির পাহাড় বানিয়ে, তারপর কাদা ছেনে পুতুল গড়িয়ে, ছবি এঁকে, ভাষায় কিছুটা দখল লাভ করবার পর কেউ কেউ কবিতা লিখে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারে। বড়রা যদি সমঝদার হন, তাদের প্রশংসা করেন—ছেলেমেয়েদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। তবে এটা ঠিকই তার নিজের কাছে নিজের পারাটাই বড়। অবজ্ঞাসূচক কিন্তু মন্তব্য মারাত্মক। ছোটদের আপন মনে কাজ করতে দেওয়া দরকার।

দেবার সুযোগেরও দরকার আছে। বাড়িতে ছোট কেউ থাকলে, কোন গৃহপালিত পশু থাকলে তেমন সুযোগ হয়। দেওয়াটা শুধু বড়দের একচেটিয়া নয়, ছোটরাও দেয়, দিতে পারে—তবে বড়দের তুলনায় সেটা অনেক কম। যে যা পারে তাকে সেইসব পারার ক্ষেত্রেই সুযোগ পেলে, দিয়ে সে কৃতার্থবোধ করবে। জ্ঞানী জ্ঞান বিতরণ করবে, ধনী অর্থ, সক্ষম অক্ষমকে সাহায্য করবে, বড়রা করবে ছোট-দের। স্বার্থগন্ধবিরহিত দানের দ্বারাই প্রকৃত আত্মোপলব্ধি সম্ভব।

আবেগজীবনের বিকাশে সময় সময় সংবন্ধন ও প্রত্যাবৃত্তির ঘটে। পিতামাতার অপরিমিত ভালোবাসা পেয়ে একটি মেয়ে বড় হয়েছে। ভালোবাসা চাওয়াই তার জীবনের প্রধান সুখ। ঐ মেয়ের বিয়ে হল—সে শ্বশুরবাড়ীতে গেল। তার ডাক পড়লো, "ভালোবাসো, অন্য-দের ভালোবাসা দাও, অন্যদের জন্য কিছু কর, অন্যদের সেবায় নিয়োজিত হও"। তার মন কিন্তু দেবার জন্য তেমন তৈয়ারী নয়। আবেগ জীবনের অপরিণতির জন্য ঐ ডাকে সে সাড়া দিতে পারলো না। তার অপটু সেবাতে শ্বশুর বাড়ীর কেউই খুশী হলেন না। ক্ষোভ ও ব্যর্থতার বোঝা নিয়ে সে বাপের বাড়ীতে ফিরে এল। চাওয়াই যে সে শুধু জানে। তার মনোভাব—বাবা মায়ের ভালোবাসা এত দিন সে পেয়ে এসেছে আজও সে তাই পাবে। এটি সংবন্ধন ও

প্রত্যাবৃত্তির একটি দৃষ্টান্ত।*

সুখী হতে হলে প্রয়োজন আবেগজীবনের পূর্ণবিকাশ। তেমন জীবন চায়, পায়ও, যে পারে দেবার জন্য তার মন উন্মুখ।

আবেগজীবনে যে শিশু রয়ে গেছে, সুখী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। অমন 'শিশুদের' মানসিক রোগলক্ষণ না থাকলেও—এরা বিকৃত চরিত্রের লোক। মানসিক রোগ বিচারে মানসিক রোগলক্ষণ প্রধানতঃ বিচার্য। তবে চারিত্রিক বিকৃতির কথাও ভাবতে হবে।

IV

মানসিক বিকাশের পূর্ণতা
সুস্থ জীবনে অহম সবল, বাস্তবজ্ঞান প্রবল

মানসিক জীবনের সুস্থতার আরেকটি দিকের বিচার সম্ভব। অমন জীবনে অহম থাকে সবল, বাস্তব জ্ঞানেরও হয় সম্যক বিকাশ। শিশুমন একান্তরূপে ইদ্‌ময়। আদিম প্রবৃত্তির দ্বারা ইদম গঠিত। এদের মধ্যে প্রধান দুটি হল—কাম এবং ক্রোধ। প্রবৃত্তির তাড়ণাতে শিশু চলে।**

জীবনে শিশু নতুন অতিথি। বাস্তবজ্ঞান তার খুবই সামান্য, ন্যায় অন্যায়, উচিত অনুচিত বোধ তার মধ্যে জন্মায়নি অমন জীবন ইদমের দ্বারা পরিচালিত হবে তাতে আর আশ্চর্য কি আছে! ইদমতড়িত জীবনের সুরটি হল সুখ পাওয়া ও কষ্টকে এড়ানো। একে বলা হয় সুখনীতি। পরবর্তীকালে আরেকটি নীতিও ফ্রয়েডের চোখে পড়েছে ঃ

---

* জীবনে ভালোবাসা কেউ কেউ খুব পায়, আবার কারুর ভাগ্যে ভালোবাসা পাওয়া খুবই কম। উভয় অবস্থাতেই মন ভালোবাসা চাওয়ার স্তরে থাকে—ঐ স্তরেই মনের সংবন্ধন ঘটে।

** বড়রাও ঐ ব্যাপারে খুব কম নয়। গ্রডেক লিখেছেন—আমরা চলিনা, (প্রবৃত্তি) আমাদের চালায়। ফ্রয়েড তার একটি বইয়ে—ঐ উক্তিটি উদ্ধৃতি করেছেন। ফ্রয়েড—Civilisation and its Discontents

যা ঘটেছে, বারবার তাই ঘটুক—এমন একটি ইচ্ছা। শিশুর আশা, আশঙ্কা ও আচরণেও তাই প্রকাশ পায়। শিশুমনে এটি একটি অনিবার্য নিয়ম। একে বলা হয় 'অনুসঙ্গ পুনরাবৃত্তির নিয়ম।

সংক্ষেপে ইদম পরিতৃপ্তির দুটি নিয়ম হল :

[১] মুখনীতি ও [২] অনুসঙ্গ পুনরাবৃত্তির নিয়ম।*

অহম ও বাস্তবজ্ঞান

শিশু বড় হয়। তার মধ্যে বাস্তবজ্ঞান জন্মায়, তার বাস্তবজ্ঞান বাড়ে। তার মিষ্টি খেতে ইচ্ছা করলো। বাবার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে, দোকান থেকে সে কিনে খেল। সে জানে যে পয়সা ছাড়া দোকানদার তাকে মিষ্টি দেবে না। ছোট শিশু হয়ত দোকানে মিষ্টি দেখা মাত্র হাত বাড়িয়ে মিষ্টি তুলে নেবে। মিষ্টি পয়সা দিয়ে কিনতে হয় সে তা জানেনা। বড় হলে অভিজ্ঞতা হয়, বাস্তবজ্ঞান জন্মায়। পয়সার যোগাড় করতে না পারলে পাঁচ বছরের শিশুও মিষ্টি খাবার ইচ্ছা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করে। চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে একটি ব্যবধান আছে বাস্তবজ্ঞান এই শিক্ষা তাকে দিয়েছে।

ইদমের একটি অংশ অহমে রূপান্তরিত হয়। অহম বাস্তবজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একে বলা হয় অহমের 'বাস্তবনীতি'। বাস্তবনীতি কিন্তু সুখনীতিরই পরিবর্দ্ধন। সারাজীবন মানুষ সুখই চায়, আর চায় কষ্টকে এড়াতে। কিন্তু তার জন্য কোন পথে তাকে যেতে হবে, সেই পথে কতটুকু পাওয়া যাবে আর কতখানিই বা তাকে ত্যাগ করতে হবে, বাস্তববোধ এই জ্ঞানটুকু তাকে দেয়। সংক্ষেপে প্রেরণা যোগায় প্রবৃত্তি, তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, অনেক সময় সংযতও করে বাস্তবজ্ঞান।

---

* 1) Freud & Signurd - Beyond the Pleasure Pinciple

2) Freud S – The ego & the Id

ধীরে ধীরে শিশু বড় হয়। শিশুকে কোন কোন চাওয়া থেকে, কোন কোন আচরণ থেকে বিরত থাকতে হয়—বড়দের ভালোবাসা হারাবে এই আশঙ্কায়। এই বহির্শাসন শিশু ক্রমে অন্তরেও গ্রহণ করে, আগেকার একটি অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি।* অন্তরের শাসনাধিপতি হল—বিবেক (সচেতন অংশ) এবং অধিঅহম বা অধিশাস্তা। অহম থেকে অধিঅহমের জন্ম আবার অহমের জন্ম ইদম থেকে। এ জন্যই বলা চলে অহম এবং অধিঅহন ইদমেরই অংশবিশেষ।

মনের প্রত্যেকটি অংশের কাজের কিন্তু স্বকীয়তা আছে। ইদম চলে এক নিয়মে, অহমের চলার নীতি আবার অন্য, অধিঅহমের কাজের নীতিটিও আলাদা।

একটি বয়স্ক লোকের জীবনে ইদম্, অহম ও অধিঅহম সবই থাকে। ইদমের শক্তি বা এনার্জি ভাগ হয়ে যায় ঐ তিনটি অংশের মধ্যে। মানসিক রোগগ্রস্তরা কিন্তু মূখ্যতঃ, মনে মনে শিশুই থাকে। তাদের মানসিক শক্তিটা থাকে প্রধানতঃ ইদমের ভাণ্ডারে।

অধিঅহমের আতিশয্য ও বিকৃতরূপের দ্বারা রুগ্নমন পীড়িত হয়। রুগ্ন ও দুষ্ক্রিয়তাপরায়ণদের জীবনে সবচেয়ে দুর্বল থাকে অহম। কোন কোন বিপথগামী ইদমের দ্বারাই প্রধানতঃ পরিচালিত হয় অহম ও অধিঅহম দুইই যেখানে দুর্বল।

সুস্থমনের শক্তির প্রধান ভাণ্ডার হল অহম। অমন জীবনে বাস্তবজ্ঞান স্বচ্ছ, ব্যাক্তিগত আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও তার সবচেয়ে বেশী। অসুস্থ মনে প্রধানতঃ ইদম, কিয়ৎপরিমানে অধিঅহম, মানসিক শক্তি বন্দী হয়ে থাকে। মানসিক চিকিৎসার প্রধান কাজ হল ইদম ও অধি-অহমের কারাগার থেকে ঐ শক্তিকে মুক্ত করা, ঐ শক্তিকে অহমের ভাণ্ডারে স্থান করে দেওয়া। কারাগারমুক্ত ঐ এনার্জি, অহমের শক্তিবৃদ্ধি

* প্রতিরক্ষার কৌশল, অন্তঃক্ষেপে অংশটি দেখুন।

করবে, জীবনের পথ চলায় 'বাস্তবনীতি' সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

গোড়া থেকেই যারা সুস্থ, অহমই তাদের জীবনে প্রধান। জীবনে ইচ্ছাকে তারা উপেক্ষা করেনা কারন ইচ্ছাপূরণইত জীবনের শেষ কথা। কিন্তু ঐ ইচ্ছা বাস্তবজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। তাৎক্ষণিক ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা যেমন ভ্রান্ত, তেমনি ভ্রান্ত ইচ্ছাকে অস্বীকার করা।

মানসিক রোগ

দেহ ও মনের মধ্যে একটি নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। সম্বন্ধটি কি, এ বিষয়ে নানা মতামত থাকলেও সহজ ভাষায় এটা আমরা বলতে পারি —মন দেহকে প্রভাবিত করে, দেহ মনকে প্রভাবিত করে। বহুমূত্র, রক্তের চাপ, আন্ত্রিক রোগ প্রভৃতি ব্যাধির মূল কারণটি মানসিক—এমন কথা চিকিৎসা শাস্ত্রে বলা হয়। সিফিলিস রোগজীবাণু যখন কারুর স্নায়ুতন্ত্র আক্রমণ করে তখন রোগীর মনে কিছু কিছু মানসিক রোগ লক্ষণ প্রকট হয় ; শত্রু ষড়যন্ত্র করছে, দুষ্টু পোকারা চারিদিকে কিলবিল করছে —এ জাতীয় ভ্রান্ত বিশ্বাস, আমূল প্রত্যক্ষ তাদের মধ্যে দেখা যায়।

মানসিক রোগকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করে দেখা হয়ঃ—
(১) দেহযন্ত্রে কোন ত্রুটিহেতু ব্যাধি। একে অঙ্গীয় ব্যাধি বলা চলে।
(২) মানসিক ক্রিয়ার ত্রুটিহেতু ব্যাধি। একে কার্মিক ব্যাধি বলা চলতে পারে।

অঙ্গীয় মানসিক ব্যাধি

অঙ্গীয় মানসিক ব্যাধি মুখ্যতঃ মস্তিষ্কের ব্যাধি। এ জাতীয় রোগে সাধারণতঃ দুই প্রকারের লক্ষণ দেখা যায় ঃ

(১) বৌদ্ধিক

নতুন কোন অভিজ্ঞতা গ্রহণ ও পরিপাকের শক্তি এদের নষ্ট হয়ে যায়। যে সব ঘটনা তাদের বর্তমান জীবনে ঘটে সে সব তারা মনে রাখতে পারে না। কারুর নাম, স্থানকাল বিস্মৃতি এদের পক্ষে স্বাভাবিক। দেখা গেছে নিজের নাম, সে কে—কোথায় সে থাকে—তাও

তাদের মনে থাকে না।

(২) আবেগজনিত

নিজেদের আবেগ জীবন ও প্রবৃত্তির উপর তাদের কর্তৃত্ব কমবেশী হ্রাস পায়। সহজেই এমন রোগীরা কেঁদে ফেলে, রাগ করে ও হাসে। ক্রমশঃ এরা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে—অন্যদের অধিকার সম্বন্ধে এরা বিশেষ সচেতন থাকে না। নিজেদের কোন রোগ হয়েছে এমন একটা ধারণা এদের মধ্যে প্রকট হয়। চুরি করা, অত্যধিক যৌনপ্রবণতা এদের মধ্যে দেখা যায়। নিজেদের যত্ন নেওয়া, নিত্যকার অভ্যাস সম্বন্ধেও এদের অমনোযোগ লক্ষ্য করা যায়।

বার্দ্ধক্যে দেহ ও মনের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। দেহ ও মনের সামর্থ্যের হ্রাস পায়। এই অবস্থাকেই জরা বলে। কে কোন বয়সে জরাগ্রস্থ হবে বলা কঠিন। আশি বছর বয়সেও দেখা যায় কারুর মধ্যে পূর্ণ কর্মোদ্যম ও বহুল পরিমান শক্তি সামর্থ্যের সে অধিকারী। আবার, ষাট বছর বয়সেই কেউ প্রায় পঙ্গু হয়ে যায়।

জরাগ্রস্তদের মধ্যে বেশ কিছু মানসিক ব্যাধি ও বিকৃতি দেখা যায়। এইসব ব্যাধিতে শুধু দৈহিক কারণটাকেই বড় করে দেখলে চলবে না। বৃদ্ধদের সমাজের ও পরিবারে ভূমিকা ও তাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া এসব রোগ সৃষ্টির কিছুটা কারণ, এটা স্মরণ রাখতে হবে। কিছু কিছু বৃদ্ধদের মধ্যে স্মৃতি বিভ্রম, তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এমন ধারণা, লক্ষ্যহীন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করা এসব দেখা যায়। তাদের মৃত্যুর পর তাদের মস্তিকে অস্ত্রোপ্রচার করে দেখা গেছে—তাদের মস্তিষ্কের উপরিভাগে বহিস্তরীয় অংশে ত্রুটী ঘটেছে।

মৃগী রোগ

মৃগী রোগ যে অঙ্গীয় ব্যাধি তেমন কথা সম্পূর্ণ দাবী না করলেও

মৃগীরোগ নির্নয়ে এনসেফালোগ্রামের সাহায্যে রোগটি বাস্তবিকই মৃগী রোগ কিনা এটা নির্ণয় করা হয়। মস্তিষ্কের অমন পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মৃগী রোগের যোগ আছে।

মৃগী রোগের বহুধরণ আছে। প্রধান দুটির কথা এখানে উল্লেখ করবো। 'অরা'র পরই রোগী সংজ্ঞা হারায়, শক্ত হয়ে পড়ে যায়। পড়বার আগে প্রথমেই সে চীৎকার করে ওঠে ও মাটিতে শক্ত হয়ে পড়ে যাবার দরুণ তার শরীরের নানা জায়গায় আঘাত লাগে। অনেক সময় দাঁত দিয়ে জিভ কামড়ে ধরে জিভ রক্তাক্ত হয়ে যায়। হাত পায়ে খিচুনি ধরে। সাধারণতঃ এমন অবস্থায় সে থাকে আধ মিনিট থেকে তিন মিনিট পর্যন্ত। জ্ঞান হবার পর রোগী খুব ক্লান্ত বোধ করে—ঘুমিয়ে পড়ে। আধ ঘণ্টা থেকে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকে। ঠিক একই ধরণ যে সব সময় হয় তা নয়। হিষ্টিরিয়া রোগেও রোগী অজ্ঞান হয়। তবে বুঝে সুজে ঠিক জায়গায় শুয়ে রোগী অজ্ঞান হয়। তাছাড়া অজ্ঞান অবস্থায় রোগী অমন আড়ষ্ট হয় না—জিভও কামড়ায় না। মৃগীরোগের উপরোক্ত ধরণকে 'গ্র্যাণ্ড-ম্যাল বলা হয়'।

মৃগী রোগের আরেকটি ধরণ আছে—'পেটিট-ম্যাল'। রোগী হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়, শূন্যদৃষ্টিতে দুই থেকে পাঁচ সেকেণ্ড পর্যন্ত তাকিয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ জেগে গিয়ে যে কাজটি করছিল, সে কাজে মনোযোগ দেয়। এমন যে অন্যমনস্ক হয়েছিল, সেটাও সে বুঝতে পারে না। ছয় থেকে চৌদ্দ বৎসরের ছেলে মেয়েদের মধ্যে এমন অসুখ দেখা দেয়। এই রোগ এমন কিছু মারাত্মক নয়। কিছু কিছু ঐ জাতীয় আত্মবিস্মৃত অন্যমনস্কতার পরে গ্র্যাণ্ড-ম্যাল রোগের রূপ নেয়।

মৃগীরোগের আক্রমণে মস্তিষ্কের ধূসর পদার্থের আকস্মিক নিষ্কাষণ ঘটে—এমন পাওয়া গেছে। ইলেকট্রোগ্রামে এই ব্যাপারটি ধরা পড়ে। তবে এটা সবসময়েই হয় এমন নয়।

মৃগীরোগ বংশানুক্রমিক কিনা এটা নিয়ে মতদ্বৈধ আছে। সত্যিকথা, এর কারণটি কি—সেটা আজও আমরা সঠিক জানিনা। মানসিক উত্তেজনা, ভয়, ব্যর্থতা অনেক সময় রোগ আক্রমণ ঘটে। কোন কোন ক্ষেত্রে ঋতুর সময় মেয়েদের এই রোগ আক্রমণ করে। মৃগীরোগে চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে তুএকটি কথা নীচে উল্লেখ করা হল।

১) ওষুধ : কোন্ ওষুধে রোগী উপকৃত হবে—এটা ডাক্তারের দায়িত্ব। কিছু নিজেদের অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা, কিছুটা প্রয়োগের দ্বারা ডাক্তারেরা বুঝতে পারেন। কি············রোগীকে ওষুধ দিতে হবে—এটাও ডাক্তারদের বিশেষ ভাবতে হয়। ওষুধের দ্বারা বেশীরভাগ রোগই উপকৃত হয়। রোগ উৎপাটিত না হলেও—রোগীর অজ্ঞান হওয়াটা বন্ধ হয়ে, কিংবা অজ্ঞান হবার সংখ্যা রীতিমত কমে যায়।

২) স্থান পরিবর্তন, এমনকি বাড়ী থেকে হাসপাতালে গেছে—তাতেও রোগের যথোচিত উপশম হয়। গৃহে ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আবার আক্রমণ আরম্ভ হয়। মনের দিক থেকে অস্বাস্থ্যকর গৃহপরিবেশের সঙ্গে মৃগীরোগের কোন যোগ আছে।

মানসিক কারণে যে সব মনোরোগের উদ্ভব হয়—তাদের প্রধানতঃ তুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। ১) উদ্বায়ু বা নিউরসিস, ২) বাতুলতা বা উন্মাদ রোগ।

নিউরসিস :

১) বায়ু রোগ

অহেতুক, অপরিমিত উৎকণ্ঠা—এই রোগের প্রধান লক্ষণ। পরীক্ষা সামনে—পড়ছি, সব ভুলে যাচ্ছি। পাশ করতে পারবকিনা! ট্রেন ধরতে হবে—আমি সময়মত পোঁছাতে পারব না, ট্রেন ফেল করব। বাবা অফিসে গেছেন—অফিসে তিনি গুরুতর অসুস্থ হবেন না'ত! ফেরার পথে কোন তুর্ঘটনা হবে না'ত! এজাতীয় মাত্রাধিক আশঙ্কায় রোগীদের মন নিয়ত জর্জরিত থাকে।

উৎকণ্ঠা বা আশঙ্কা পীড়ায়—সব কিছুতেই মনে আশঙ্কা বা উৎকণ্ঠা —কি হবে, কি না হবে, নিশ্চয়ই কিছু না কিছু অমঙ্গল হবে এমন ধরণের ভাবনায় এদের মন অনুক্ষণ পীড়িত থাকে। ঐ আশঙ্কা তীব্র— চলাফেরায়, চোখেমুখে তার ছাপ পড়ে যায়। এই আশঙ্কা থেকে রেহাই নেই—না জাগরণে, না ঘুমিয়ে। ঘুমালেও এদের দুঃস্বপ্ন দেখার অবধি নেই।

ক) অবস্থা বা বস্তু আতঙ্ক (ফোবিয়া)

বস্তুভয়

কোন বস্তু সম্বন্ধে অত্যধিক ভয়। আরশোলা, টিকটিকি, কুকুর, বিড়াল, সাপ—এমন এক বা একাধিক বস্তুর সম্বন্ধে এদের আতঙ্ক।

অবস্থায় আতঙ্ক

জলে আতঙ্ক, অন্ধকারে আতঙ্ক, ছোট ঘরে থাকতে আতঙ্ক, খোলা জায়গায় যেতে আতঙ্ক—এসব রোগের বিভিন্ন লক্ষণ।

খ) আবেশ বা বাতিক রোগ

কোন চিন্তা এসব রোগীদের পেয়ে বসে, কিছুতেই সে চিন্তাকে ছাড়াতে পারে না ; বিশেষ কোন কাজ এরা না করে থাকতে পারে না— বুঝছে অমন চিন্তা, অমন আচরণের কোন মানে নেই—তবুও নিরুপায়, অমন চিন্তা তাদের মনে আসবেই, অমন কাজ তাদের করতেই হবে। আবেগ চিন্তা বা আচরণ বাধ্যতামূলকভাবে তাদের মনের মধ্যে গেড়ে বসে। ঐ ধরণের চিন্তা, আবেগ বা আচরণকে আবেশ বা বাতিক বলে। ঐসব চিন্তাভাবনা, কাজকর্ম থেকে বিরত থাকলে – কী একটা বিপদ হবে, এ জাতীয় উৎকণ্ঠা এদের মনের মধ্যে থাকে। কোন পার্কের পাশ দিয়ে যাবার সময় ডক্টর জনসনকে পার্কের কটি রেলিং আছে গুণে গুণে যেতে হত। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় প্রত্যেকটি ধাপ গুণে গুণে এক

ভদ্রলোককে উঠতে হত। কোন ভুল হলে আবার নীচে নেমে প্রথম থেকে গুণে উঠতে হত। সাপ কথাটি মুখে এলে সাপ তাকে কামড়াবে —এমন একটা ছেলের ধারণা হয়েছিল। তার প্রতিষেধক ছিল তিনবার আস্তিকমুনির নাম উচ্চারণ করা। রাত্রিতে শুয়েছে—অমনি তার মুখে এল—'সাপ'। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি আস্তিকমুনির নাম তিনবার উচ্চারণ করলো। কিন্তু তাতে কি রেহাই আছে। আবার মুখে এল— 'সাপ'। আবার আস্তিকমুনিকে স্মরণ। সেই কথা শেষ হবার পর আবার সাপ—আবার 'আস্তিকমুনি'। নিজের সঙ্গে অমন যুদ্ধ করতে করতে যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়ছে—ততক্ষণ তার মুক্তি নেই। শুচিবায়ি ও একটি বাতিক রোগ। কেবলি হাত পা ধোয়া, স্নান করা—সব সময়েই অশুচিবোধ, অশুচির হাত থেকে রেহাইয়ের প্রচেষ্টা।

গ) রূপান্তরিত হিষ্টিরিয়া

এই রোগ নিজ্ঞ্যান ইচ্ছা দৈহিক রোগলক্ষণে আত্মপ্রকাশ করে। কোন দৈহিক কারণ নেই—তবু শরীরটা অবশ হয়ে গেল—পক্ষাঘাতের মতই ; দৃষ্টিশক্তি হারাল, কানে শুনতে পায় না, কথা বলতে পারে না, মাঝে মাঝে মূর্ছা যায়—ইত্যাদি। পরীক্ষা করে দেখা গেল—ঐসব রোগীর দেহযন্ত্রে কোন বিকার নেই, চোখ মুখ অঙ্গ সব ঠিকই আছে—কানা হবার, বোকা হবার, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হবার কোন দৈহিক কারণ নেই—কারণ হচ্ছে মানসিক—তাদের নিজ্ঞ্যান ইচ্ছা। স্নায়ু তন্ত্রে কোন গোলমাল নেই—তবুও রোগিনী মাঝে মাঝে ফিট হয়। হিষ্টিরিয়া মৃগীরোগ নয়—বুঝেসুঝে ঠিকমত জায়গায় শুয়ে রোগিনী ফিট হয়। হাত-পা সঞ্চালন করে। অমন হাত-পা সঞ্চালন অর্থবহ—যারা বোঝবার তারা বোঝেন। সুখী বিবাহের পর অমন হিষ্টিরিয়া অনেক সময় সেরে যায়।

২) বাতুলতা বা উন্মাদ রোগ

এবার বাতুলতা কিম্বা উন্মাদ রোগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হবে। প্রথমেই নিউরসিসের সঙ্গে উন্মাদ রোগের পার্থক্যটি কি তা বলা যাক। নিউরটিক রোগীদের আচার ও আচরণ যে অর্থহীন, রোগীরা নিজেরাও তা বোঝে না এমন নয়। তাদের ভয়, চিন্তা বা আচরণের কোন মানে নেই—কিছুটা এরা তা জানে, প্রকৃত সত্য সম্বন্ধে এদের অন্তর্দৃষ্টি আছে।

নিজেদের রোগ সম্বন্ধে উন্মাদ রোগীদের কোন অন্তর্দৃষ্টি থাকে না। ভ্রমবাতুলতা রোগাক্রান্তদের কেউ কেউ বিশ্বাস করে—তাদের বিরুদ্ধে এক বিরাট ঘোরতর ষড়যন্ত্র চলছে, তাদের মারবার জন্য একদল লোক নানান চক্রান্ত করছে। কেউ যদি বলে তাদের ঐ ধারণা ভ্রান্ত—ঐ বিশ্বাসের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই—রোগীদের ভ্রান্ত বিশ্বাস কিছুমাত্র শিথিল হবে না। আশ্চর্য নয়, তারা ভাববে অমন কথা বলে বিপদ সম্বন্ধে তাদের অসতর্ক করে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। যারা অমন কথা বলছে তারাও শত্রুপক্ষের লোক। চিত্তভ্রংশী বাতুলতা বা সিজোফ্রেনিয়া রোগীরা অমূল প্রত্যক্ষে ভোগে। কত কি তারা দেখে, কত কি শোনে! তাদের বলা হল তাদের অমন দেখা, শোনা সব ভুল। অন্যজগতে যাদের বাস, তারা এ জগতের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক। অমন উক্তি তাদের কানে পৌঁছাবেই না। যদি পৌঁছায়, প্রত্যুত্তরে তারা হাসবে। তারা দেখছে, শুনছে—অন্যদের কথায় তারা কর্ণপাত করবে কেন! অমন রোগীদের সঙ্গে অন্যান্যদের কোন আবেগ বা ভাববিনিময়ের সেতু নেই। তারা নিজেদের জগতে নিমগ্ন। সাধারণ লোকেরা তাদের মনোজগতের বাসিন্দা নয়।

নিউরসিস ও উন্মাদরোগের দ্বিতীয় পার্থকটি হল—নিউরুটিকেরা একেবারে অকেজো হয়ে যায় না—স্বাভাবিক জীবনযাত্রার জন্য যা প্রয়োজন .এরা তা মোটামুটি করতে পারে। পড়াশুনো করে, জীবিকা

অর্জনের জন্য কাজকর্ম করে, স্ত্রীপুত্র নিয়ে ঘরসংসারও করে। এসব করতে এদের যে কোন অসুবিধা হয় না—এমন নয়, তবে সবকিছু মোটামুটি চলে যায়। উন্মাদরোগী অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাজের বাইরে চলে যায়। উন্মাদরোগীরা না পারে পড়াশোনা করতে, না পারে কাজকর্ম করতে—না হয় তাদের পারিবারিক জীবন যাপন করা। স্বামী বা স্ত্রী হিসাবে, পিতামাতা হিসাবে তারা একেবারেই অচল।

উন্মাদরোগ প্রকৃতই এক অভিশাপ। রোগীর মন যে কোথায় থাকে—তা খুঁজে পাওয়া কঠিন। অন্যদের সঙ্গে মানবোচিত সম্পর্কের ক্ষমতা তাদের প্রায় লোপ পায়। মনঃসমীক্ষকেরা বলেন—উন্মাদরোগে সচেতন মনকে দাসিত করে নির্জ্ঞান দেহমনকে আশ্রয় করে। নির্জ্ঞানের স্বরূপ—এমন একটি প্রশ্নের উত্তরে ফ্রয়েড উন্মাদরোগগ্রস্থ ব্যক্তিদের মনের প্রতি অঙ্গলি নির্দেশ করেন।

উন্মাদরোগ প্রধানতঃ তিনজাতীয়।

(ক) খেদোন্মত্ত বাতুলতা যা আধাইত উন্মাদরোগ, (খ) ভ্রমবাতুলতা বা প্যারানইয়া ও (গ) চিত্তভ্রংশী বাতুলতা বা সিজোফ্রেনিয়া।

ক) খেদোন্মত্ত বাতুলতা

ঐ রোগে রোগীর মন কখনও কখনও বিষাদে আচ্ছন্ন হয়—রোগী কথা বলে না, হাসে না, তার হাত পা নাড়তে ইচ্ছা করে না—অনেক সময় শুয়ে থাকে, কাঁদে। রোগীর অমন বিষন্নতার কোন কারণ নেই। কিছুদিন অমন অবস্থায় থাকবার পর ধীরে ধীরে ঐ বিষাদ কেটে যায়। মন মোটামুটি স্বচ্ছ, দুঃখ নয়, আনন্দও নেই—এমন অবস্থা। তারপর মন ধীরে ধীরে উল্লাসিত হয়ে ওঠে। উল্লাস-উত্তেজনায় রোগী উন্মত্তের মত আচরণ করে। ছুটোছুটি, অনর্গল কথা বলে—দ্রুত, দ্রুততর—শেষ পর্যন্ত সে যে কি বলছে তা তার নিজেরও বোধগম্য হয় না। কিছুদিন অমন চলার পর মন স্তিমিত হয়ে আসে—

ধীরে ধীরে মন বিষাদাক্রান্ত হয়। বাস্তব বর্জিত খেদ ও উন্মত্ততার আবর্ত্তন—এই রোগের লক্ষণ।

কোন কোন রোগীর মধ্যে উল্লাস তেমন আসে না। মন সবসময়েই অবসন্ন ও বিষাদগ্রস্ত হয়ে থাকে। অমন রোগ নিউরসিসও হতে পারে, আবার উন্মাদ রোগেও ঘটে। আধিক্য, বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্করহিত এবং রোগীদের মধ্যে অন্তদৃ ষ্টির অভাব—উন্মাদ রোগের লক্ষণ।

খ) ভ্রমবাতুলতা বা প্যারানইয়া

এই রোগে রোগীর মনে দুইজাতীয় ব্যাধিসুলভ ভ্রান্তবিশ্বাস দেখা যায়। রোগীরা নিজেদের বিরাট কেউ বলে ভাবে। মহিলা হলে তার মনে হয় সে বুঝি ইন্দিরা গান্ধী বা মার্গারেট থ্যাচার বা অমন আর কেউ। পুরুষ রোগীদের কারুর কারুর ধারণা হয় সে নেপোলিয়ান, আলেকজাণ্ডার, আয়েনষ্টাইন বা নিজে একজন ঈশ্বরের অবতার। এসব বিশ্বাস থেকে তাদের নড়ানো যায় না। যে নিজেকে নেপোলিয়ান বলে ভাবছে তাকে বলা হল নেপোলিয়ান সেন্টহেলেন দ্বীপে বহুকাল আগে মারা গেছেন। এর সম্ভবতঃ উত্তর হবে—ওটা ইংরেজদের রটনা। আমি শত্রুদের হাত থেকে পালিয়ে ভারতবর্ষে এসেছি। এদেশের রোদবৃষ্টিতে আমার বর্ণ কালো হয়ে গেছে।

বিরাটত্বের ভ্রান্তবিশ্বাসের সঙ্গে প্রায়ই যুক্ত থাকে—তার বিরুদ্ধে এক ঘোর ষড়যন্ত্র, শত্রুরা তাকে ধরবার, তাকে মারবার চেষ্টা করছে।

অনেকক্ষেত্রে বিরাটত্বের ভ্রমটা মনে অত স্পষ্ট থাকে না—থাকে রোগীর ঘোর অনিষ্টের চেষ্টা চলছে—এমন ভ্রান্তবিশ্বাস।

ভ্রমবাতুলতার আরেকটি ধরণ আছে। এটি কিছুটা মৃদু। কেউ কেউ ভাবে—সেই অন্যদের লক্ষ্যস্থল। তাকেই মানুষ সব সময়ে সমালোচনা করছে, দুজনকে ফিসফিস করে কথা বলতে দেখলে রোগীর তৎক্ষণাৎ ধারণা হয়—তারই সম্বন্ধে কথা হচ্ছে, ভালকথা নিশ্চয়ই নয়—খারাপ কিছু। তার প্রতি অন্যদের বিরূপ দৃষ্টি। রোগীদের বোঝান

যায় না—মানুষ মুখ্যতঃ চলাফেরা করে নিজের ধান্দায়, অন্যদের দিকে তাকাবার তার সময় কোথায়। বিশেষ কোন কোন ব্যক্তি ব্যতীত অন্যদের প্রতি সে উদাসীন। এটাই সত্য—এটাই সুস্থ মনোভাবের পরিচায়ক। কোন ঘটনা ঘটলে দু-চারদিন, দু-একসময় কেউ কারুর নিন্দা করলো—তারপর সবাই চুপ করে গেল। নিজেদের কাজেই মানুষ তন্ময় হল। যাদের কাজকর্ম নেই—অন্যদের নিন্দা করে তারা কিছুটা আত্মপ্রসাদ লাভ করে। তবে তাদের অমন নিন্দাবাদের মূল্যই বা কী—আর কোন্ সুস্থ ব্যক্তিই বা তাদের কথা শুনছে।

কিন্তু রোগীর মন সন্দিগ্ধচিত্ত। রোগী ভাবে সবাই তার দিকে তাকাচ্ছে, তার নিন্দা করছে, তার অনিষ্টাচরণের কথা ভাবছে। এই রোগকে বলা হয়—**প্যারাফ্রেনিয়া**।

আরেকজাতীয় সন্দেহবায়ুও আছে। অকারণে স্বামী, স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করে, স্ত্রীরা করে স্বামীদের। কিছু সন্দেহ প্রবণতা অনেকের মধ্যেই আছে। কারুর কারুর মনে আবার পুরুষ বা স্ত্রীতে আসক্ত হবার দমিত ইচ্ছা থাকে—প্রক্ষেপে সে অন্যদের মধ্যে দোষটা দেখে, এটা একটি কারণ। কিন্তু সময় সময় সন্দেহ মাত্রাতিরিক্ত হয়। অমন এক ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে অফিসে যেতেন। এতৎ সত্বেও আশ্চর্য, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সন্দেহ দূর হয়নি। সন্দেহের কারণটি যেখানে নিজের মন, বাইরের ঘটনা দ্বারা তাকে কতটুকু প্রভাবিত করা যায়।

পুরোদস্তুর ভ্রমবাতুলদের সংখ্যা কম। কিন্তু কিছু কিছু অমন জাতীয় ভ্রান্তবিশ্বাস অনেকের মধ্যেই আছে। সে নিজে কি, তার মূল্য কতটুকু—এর সঠিক বিচার ক'জন করতে পারে, বা করে। নিজে যা—তার চেয়ে ঢের বেশী ভাবা, বা সবসময় কম ভাবা—এটা প্রায়ই দেখা যায়। এর মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের উপর বিরাটত্ব আরোপ করে। বড় চাকুরে, বড় নেতা এদের মধ্যে অনেক সময় এমন দেখা যায়। পদগৌরবে, মান ও প্রতিপত্তির আধিক্যে মানুষ নিজের স্বরূপ ভুলে

যায়। এটা ঠিকই যারা বেশী মাইনে পায়, বেশী অর্থ উপার্জন করে—জীবনের সুখ সুবিধা তারা বেশী ভোগ করে, কিন্তু তাই বলে তারা অতিমানব নয়। সাধারণের মত তারাও একজন মানুষ। তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে, কামনা-বাসনা আছে, বাঁচবার ইচ্ছা আছে ও মৃত্যুভয় রয়েছে। খোলস থেকে বেরিয়ে আসলেই বোঝা যায় একজন রাজা ও একজন কৃষকের মধ্যে সত্যিকারের কোন পার্থক্য নেই। রাজ্যচ্যুত রাজা, অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী ও পরাজিত নেতাদের দেখলেই এ সত্য প্রকট হয়।

মানুষের শত্রুতাচরণের ভয় বোধহয় অধিকাংশেরই আছে। বড়দের অবশ্য শত্রু অনেক বেশী, কিন্তু তাদের মনে তাদের প্রতি শত্রুতাচরণের আশঙ্কা শত্রুর সংখ্যার চেয়ে ঢের বেশী।

অকারণে স্ত্রী চরিত্রে সন্দেহ সম্বন্ধে একজন অধ্যাপক আলোচনা করছিলেন। শুনে একটি ছাত্রী বললো—"তাহলে স্যার সব পুরুষই অমন ভ্রান্তবিশ্বাসের শিকার। স্ত্রীকে সন্দেহ করেনা অমন পুরুষ বাংলাদেশে আছে নাকি ?"

গ) চিত্তভ্রংশী বাতুলতা বা সিজোফ্রেনিয়া

এইরোগে কয়েকটি জিনিষ চোখে পড়ে।

১) মানুষের কাছ থেকে রোগী সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একটি রোগী বলেছিল—"আমার ও জগতের মাঝখানে আছে একটি কাঁচের দেওয়াল ; আমার কাছে জগৎ মৃত"। নিজের মন গড়া একটি জগতে এরা বাস করে। নিজের মানসসৃষ্টদের সঙ্গে কথা বলে, তাদের কথা শোনে। যে ভাষায় তারা কথা বলে, অনেক সময় তার মানেও বোঝা যায় না। তারা নিজেরা ভাষা বানায়। সে জন্য সাধারণের কাছে ঐ ভাষা দুর্বোধ্য।

২) রোগীর মন শতধাদীর্ণ—তার মানসিকতায় কোন সংলগ্নতা, সম্বন্ধতা থাকে না।

৩) তাদের যা বলা হবে তার উল্টোটা তারা করে, এমন দেখা যায়। ঐ নেতিমূলক মনোভাব অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়—সক্রিয় নয়।

৪) এদের কারুর কারুর মধ্যে দৃঢ়মূল ভ্রান্তবিশ্বাসও গড়ে ওঠে। ওটা প্যারানইয়া ও সিজোফ্রেনিয়া—এই দুইয়ের এক মিলিত ব্যাধি।

অনেক সময় অল্পবয়সেই চিত্তভ্রংশী বাতুলতা রোগের সূত্রপাত হয়, কৈশোর ও নবজীবনেতে বটেই। শিশু—সিজোফ্রেনিক এমনও কিছু কিছু আছে।

দেহের গঠনের সঙ্গে এই রোগের সম্বন্ধ আছে, সুইস মনোবিজ্ঞানী ক্রেশমার * এমন মনে করেন। এই দাবী পুরোপুরি সমর্থিত এমন কথা বলা চলেনা। ওঁর মতে—পরবর্ত্তীকালে যারা সিজোফ্রনিয়া রোগাক্রান্ত হন—ছোট বেলায় তাদের অধিকাংশের হয় মানসিকতা, যাকে সিজোথাইম মানসিকতা বলা চলে। এই মনোভাবের লোকেরা বাল্যকাল থেকেই অন্তর্বৃত, বাইরের কারুর সঙ্গে তেমন মেশেনা, অন্যদের প্রতি তাদের কেমন একটা অবিশ্বাস। এদের প্রকৃত বন্ধু প্রায় নেই বললেই চলে। কারুর কাছে নিজের মনের কথা এরা বলতে পারেনা, কারুর কাছে নিজেকে এরা খুলে ধরে না।

সিজোফ্রেনিয়া রোগটির চারটি ভাগ আছে।

(১) সরল সিজোফ্রেনিয়া, (২) হেবেফ্রেনিয়া, (৩) ক্যাটাটনিয়া ও (৪) প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়া।

(১) সরল সিজোফ্রেনিয়া

এই রোগাক্রান্তদের আগ্রহ ক্রমে ক্রমে সব কিছুতে লোপ পায়। পড়াশুনা, খেলাধূলা—কোন কিছুতেই তাদের আর মনে থাকেনা। বুদ্ধিবৃত্তিও ক্রমশঃ কমে আসে, তাদের আবেগজীবনও ক্রমশঃ ভোতা হয়ে যায়। ভ্রান্তবিশ্বাস বা অমূল প্রত্যক্ষে কিন্তু এরা ভোগে না।

---

* Kreshmer

(২) হেবেফ্রেনিয়া

সাধারণত যৌবনেই এই রোগ হয়। মাথাধরা, অসুস্থবোধ করা, মাঝে মাঝে বিষণ্ণতা, উদাসীনতা—এইসব নিয়েই রোগটি আরম্ভ হয়। ক্রমে দেখা যায় রোগী শিশুর মতন আচরণ করছে, অকারণে কখনও হাসছে, কখনও বিষণ্ণ আবার কখনও উদাসীন। এরা অনেকেই ভ্রান্ত—বিশ্বাস ও অমূল প্রত্যক্ষের শিকার হয়। ধারে কাছে কেউ নেই, রোগীদের কানে নানান কথা পৌঁছয়, তাদের অপরাধের জন্য কেউ তাদের অভিযুক্ত করছে এমন জাতীয় কথাও শুনতে পায়। বুদ্ধিও এ রোগে প্রভাবিত হয়।

সরল সিজোফ্রেনিয়া ও হেবেফ্রেনিয়ার মধ্যে মাঝে মাঝে পার্থক্য লক্ষ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই রোগ দুটি নিরাময় করা কঠিন।

(৩) ক্যাটাটনিক সিজোফ্রেনিয়া

এ রোগ সধারণতঃ পঁচিশ বছরের আগে হয়। এ রোগের তিনটি ধরণ : ক) বিষাদ, খ) স্তম্ভ বা রোগজড়তা ও গ) উত্তেজনা।

(ক) বিষাদ

রোগী বিষণ্ণ বোধ করে। অনিদ্রারোগে আক্রান্ত হয়, এদের কাজ কর্ম কমে আসে। এদের মন বাস্তব জগত থেকে সরে যায়। এদের কেউ অনিষ্ট করবার চেষ্টা করছে এমন ভ্রান্তবিশ্বাস ও তারই সাথে অপরাধবোধে মন জর্জরিত হয়, দেহমন ক্রমেই আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। বিষণ্ণতার ছাপ কিন্তু এদের মুখের উপর পড়েনা—মাঝে মাঝে এরা অকারণে ভ্রূকুঞ্চন করে। কোন কিছুতেই এরা মনোনিবেশ করতে পারেনা। এদের মধ্যে নেতিমূলক মনোভাব প্রবল।

(খ) স্তম্ভ বা রোগজড়তা

বিষণ্ণতা ও অবসাদের পর রোগীর মধ্যে আসে একজাতীয় রোগ-

জড়তা। ঘন্টার পর ঘন্টা রোগী একজায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, বসে থাকে, শুয়ে থাকে। এরি মধ্যে কিছু কিছু অঙ্গভঙ্গিও সে করে। এই অবস্থাতে কিন্তু সে কি শুনছে, কি করছে সব কিছুই সে কিন্তু জানে। স্তম্ভ কাটলে পরে ঐ সমস্তই তার কাছ থেকে আদায় করে নেওয়া যায়। স্তম্ভের সময় তার গায়ে একটা পিন ফুটিয়ে দিলেও সে রা শব্দ করেনা, সরে যাবার চেষ্টা করেনা।

(গ) উত্তেজনা বা উন্মাদনা

এই অবস্থায় রোগী উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অর্থহীন আচরণের প্রাবল্যে, দ্রুত অসংলগ্ন কথা বলা, যার ভাষা দুর্বোধ্য—এমন দেখা যায়।

এমন রোগীর সঙ্গে মানসিক যোগাযোগ করা সম্ভব নয়। তার অস্থিরতার জন্য তাকে সামলানো দায় হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে অমূল্য প্রত্যক্ষও হয়। রোগী সিজোফ্রেনিয়া রোগাক্রান্ত কিনা এটা বোঝা কোন কোন ক্ষেত্রে কঠিন ভুল হওয়া আশ্চর্য নয়। গোটামানুষটাকে দেখে, তার সমস্ত আচরণ লক্ষ্য করেই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করা দরকার।

প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়া

ভ্রমবাতুলতা ও চিত্তভ্রংশী বাতুলতা কোন কোন ক্ষেত্রে একই সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে। এই রোগ আরম্ভ হয় সন্দিগ্ধ মন নিয়ে—তারপর রোগীর মন সব কিছু থেকে সরে আসে। সবাই শত্রুভাবাপন্ন এমন একটা ভয় মনের অভ্যন্তরে থেকে যায়।

সিজোফ্রেনিয়া রোগ নিরাময় কঠিন। সরল সিজোফ্রেনিয়া ও হেবাফ্রেনিয়া রোগের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে সত্য। যে ক্ষেত্রে রোগ আক্রমন প্রবল, রোগীর বুদ্ধি বেশী, অন্যের সঙ্গে যারা সহযোগিতা করতে পারে—তাদের রোগ অপেক্ষাকৃত সহজে সারে। রোগীর মধ্যে অন্যের সঙ্গে সহযোগিতার ক্ষমতা সর্বপ্রকার মানসিক রোগ নিরাময়ের

বোধ হয় সব চেয়ে বড় হাতিয়ার।

সর্বশেষে যোগ করা দরকার, মানসিক রোগ দেহের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করেনা একথা সত্য নয়। অত্যধিক উৎকণ্ঠায় এণ্ডোক্রিণ গ্লাণ্ডের নিঃসরণে ঘনঘন প্রস্রাব করতে হয়, শরীর ঘামে ভিজে যায়, ঘুমের ব্যঘাত ঘটে। বিষাদ রোগে ক্ষুধাতৃষ্ণা লোপ পায়। মানসিক রোগে অবশ্য মনের গোলমালটাই বড়, দৈহিক রোগে দেহের। তবে দেহমনের সম্পর্ক এত নিবিড় যে একে অন্যকে প্রভাবিত করবেই।

মানসিক রোগ বিভিন্ন জাতীয়—তবু একথা সত্য একাধিক রোগ-লক্ষণ প্রায়ই একই সঙ্গে দেখা যায়। যে রোগলক্ষণ রোগের তাই নামকরণ করা হলেও ঐ কথা ভোলা ঠিক হবেনা যে, অন্যান্য রোগলক্ষণের অধিকাংশই রোগীদের মধ্যে বর্তমান। অন্তর্নিহিত যে মানসিক ক্রিয়ার ফলে মানসিক রোগের উদ্ভব হয় তা সব রোগের ক্ষেত্রে বহুলাংশে একরকম। এদের পার্থক্য প্রধানতঃ গুণগত নয়, পরিমানগত।

কামবিকৃতি

সমকাম

কামবিকৃতি মানসিক রোগ নয়। তবু এটা বহুর ভাবনার কারণ হয়।

কামবিকাশের কয়েকটি স্তর আছে—সে সম্বন্ধে 'মানসিক স্বাস্থ্য' অধ্যায়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। প্রাপ্তবয়স্কদের কামবিকাশের পরিণতি—নরনারীর যৌনমিলন। কিন্তু যে সব স্তরের মধ্য দিয়ে ছোটবেলায় মানুষেরা অমন স্তরে উপনীত হয়—তার দুটি হল আত্মকাম ও সমকাম। কিছু কিছু পুরুষ এবং কিছু কিছু নারী দেখা গেছে—সমকামী। পুরুষের যৌনপাত্র যেখানে পুরুষ; নারীর নারী। জেলে আবদ্ধ পুরুষ ও নারীর মধ্যে এটি দেখা যায়। ছেলেদের বোর্ডিংয়ে ও মেয়েদের বোর্ডিংয়েও কিছু কিছু এমন দেখা যায়। কামশক্তি সম্ভবতঃ মূলতঃ এক। বিপরীত কামে আত্মপ্রকাশের কারুর বাধা ঘটলে—

সমকামে তাকে সে চরিতার্থ করে। স্বাভাবিক কাম পরিতৃপ্তির পূর্ণ সুখ তাতে পাওয়া না গেলেও কিছু সুখ তাতে হয় বৈকি। প্রাপ্তবয়সে সমকাম স্বাভাবিক কামতৃপ্তির একটি বিকল্প। নরনারী যখন দুষ্পাপ্র নয়, স্বাভাবিক মিলনের বাধা যখন আর থাকে না—তখন বিকল্পের প্রয়োজন দূর হয়ে যায়। নরনারীর স্বাভাবিক মিলনে তা রূপ নেয়। কৈশোরে ছেলেরা ছেলেদের আকর্ষণ করে, মেয়েরা মেয়েদের। এই সময়ে সমকাম আচরণ বেশী দেখা না গেলেও সমসামাজিকতার তীব্র আকর্ষণ ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায়। ছেলেরা মেয়েদের সম্বন্ধে প্রায় উদাসীন হয়, মেয়েরা ছেলেদের সম্বন্ধেও তাই।

এটা কামবিকাশের একটি স্বাভাবিক স্তর। কিশোর কিশোরী ক্রমে যুবক যুবতী হয়—সমকাম ইচ্ছা বিপরীত কামবাসনায় পরিণতি লাভ করে। কৈশোরে সমকাম নিয়ে ভাবনার কিছু নেই।

মুষ্টিমেয় কিছু নরনারী কিন্তু দেখা যায় সমকামেই তাদের সারাজীবন আগ্রহ। নারী পুরুষকে আকর্ষণ করে না, পুরুষ করে না নারীকে। এদের মধ্যে কিছু আছে বিপরীত কামের প্রতি তাদের উদাসীন্যের, কারণ বিপরীত কল্প্যে সম্বন্ধে তাদের বিতৃষ্ণা ও ভয়—যেটার অধিকাংশটাই নির্জ্ঞান। এদের মধ্যে সম্ভবতঃ কারুর কারুর জীবনে এমন ঘটনা ঘটেছিল যা বিপরীত কামের চিন্তা বা কাজের প্রতি তাদের প্রবল ভয় ও বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করেছে। বিপরীত কাম ইচ্ছার কথা 'ভুলে' তারা বেঁচেছে। এসব লোকদের মানসিক চিকিৎসা করলে, স্বাভাবিক কাম জীবনে এরা ফিরে আসতে পারবে, স্বাভাবিক যৌন সম্ভোগের আনন্দ এরা ভোগ করতে পারবে।

হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও বিপরীত কামের হাতছানি যাদের ডাকে না—অল্পসংখ্যক হলেও এমন কেউ কেউ আছে। সমকামই এদের প্রকৃতি।

দেহমনে কাম বিবর্ত্তনের প্রধান কারণটি হল একটি সহজাত অন্তর্নিহিত তাগিদ বা প্রেরণা। কারুর কারুর জীবনে ঐ তাগিদটি

দুর্বল। বিবর্ত্তন সমকামের স্তরে এসেই থেমে যায়। এমন লোকেরা সমকামই বোঝে, বিপরীত কামের স্পন্দন এরা হৃদয়ে শুনতে পায় না।

তারা যখন প্রকৃতিগত ভাবেই এমন—তাদের কামসুখলাভ থেকে সমাজ বঞ্চিত করা সঙ্গত-কিনা-এটা ভাবা দরকার। তবে অমন একজন সমকামী অন্য কোন ব্যক্তির অনিচ্ছাসত্ত্বে জোর খাটিয়ে তাকে সমকামের পাত্র বা পাত্রী করে, তা খুবই দূষনীয়—তা অপরাধই। কিন্তু দুজন সমকামী স্বেচ্ছায় যদি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়—তবে তাদের সেই স্বাধীনতা খর্ব করা উচিত হবে কি? সুখলাভের অধিকার সকলেরই আছে। আধুনিক মনোবিদদের অনেকেই অমন ধারণা। ঐ জাতীয় সমকাম আচরণের প্রতি সমাজের আরও উদার মনোভাব বোধহয় দরকার।

হস্তমৈথুন

হস্তমৈথুন কে অনেকে কামবিকৃতি মনে করেন। হস্তমৈথুন বহুক্ষেত্রে সঙ্গমের বিকল্প রূপে কাজ করে। তবে যে সবক্ষেত্রে হস্তমৈথুনের আনুসঙ্গিক কল্পনা যৌন সঙ্গমের সেটাকে কামবিকৃতি বলে ভাববার দরকার নেই।

ছোটরা হস্তমৈথুন করছে দেখতে পেলে বড়রা বিশেষ ভাবিত হন। ভাবা হয়—ওটা অস্বাভাবিক, কামের আতিশয্যের অভিব্যক্তি—এর পরিণাম হবে মারাত্মক। বড়রাও কিছু কিছু হস্তমৈথুন করে। আমেরিকাতে অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে অধিকাংশ পুরুষ এবং বহু নারীরা হস্তমৈথুন করে।

আজকের মনোচিকিৎসকদের অভিমভ—হস্তমৈথুন অস্বাভাবিক কিছু নয় এবং এর পরিণাম কোন প্রকারেই দেহমনের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। তবে হস্তমৈথুন যারা করে তারা নিজেদের অপরাধী বলে ভাবে। ঐ অপরাধ-বোধ দেহমনের অনিষ্ট করে। একথা ঠিকই অত্যধিক হস্তমৈথুন খারাপ—তেমনও অত্যাধিক মৈথুন, অত্যাধিক আহারও। সব কিছুই পরিমিত হওয়া দরকার।

সাধারণ ভাবে বলা যায়—এই সমাজে যৌন-উত্তেজনা বড়ো বেশী। বিজ্ঞাপন, নাটক নভেল, টি ভি সিনেমা ঐ উত্তেজনা বাড়িয়েই চলেছে। সহজপথে ঐ উত্তেজনা প্রশমনের সুযোগ অনেক কম। হস্তমৈথুনের দ্বারা যদি ঐ উত্তেজনাকে কিছু প্রশমিত করা যায়—তাতে আপত্তি করবার কী আছে?

তবে যদি কারুর মধ্যে দেখা যায় যৌনসঙ্গম অনীহা, বিতৃষ্ণা—হস্তমৈথুনের দ্বারাই তাদের পরিতৃপ্তি—তাদের সম্বন্ধে ভাবতে হবে বৈকি। সর্বাগ্রে দেখতে হবে—স্বাভাবিক মিলনে তাদের বাধাটা কেন।

স্বাভাবিক যৌন কাজে কল্পনা করেই সাধারণতঃ মানুষ হস্তমৈথুন করে। এমন কি দেখা যায়—ঐ জাতীয় কল্পনার সে ধার ধারছে না, হস্তমৈথুনেই তার সুখ তাহলে কিছুটা চিন্তার বিষয়। ওটা অনেকসময় স্বতঃকামের পর্যায়ে পড়ে। অমন লোকদের কামবিকাশ স্বতঃকামের স্তরে আটকে যায়নিত!

সংক্ষেপে সচরাচর যেসব হস্তমৈথুনের কথা শোনা যায় তা অস্বাভাবিক নয়, অন্যায়ত নয়ই এবং ঐসবের দ্বারা দেহমনের কোন অনিষ্ট হয় না।

বিভিন্ন ধরনের কামবিকৃতি

বিভিন্ন জাতীয় কামবিকৃতিতে যৌন লিঙ্গকে প্রাধান্য না দিয়ে দেহের অন্য কোন অঙ্গকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। পুরুষের সমকামে পায়ু। কারুর কারুর কাছে পাই হয়ত হল প্রধান। তবে ঐ ধরনের কামবিকৃতির সংখ্যা নগন্য।* অমন কামবিকৃতিতে লিঙ্গ ও যোনি সম্বন্ধে ভীতি বিশেষ ভাবে দেখা যায়। লিঙ্গ ও যোনি আঘাত ও আক্রমণের যন্ত্র এমন একটা ধারণা ভুক্তভোগীদের মধ্যে দেখা যায়। অমন ভুল ধারণাটা ভাঙ্গা যে খুব সহজ তা সত্য নয়, কারণ ঐ ভয়ের বেশীর

* Fetishism

ভাগটাই থাকে নির্জ্ঞানে। তবু ধৈর্য ধরে বহু চেষ্টা করে ধীরে ধীরে ওটা দূর করতে পারলে যৌন আকাঙ্খা লিঙ্গ ও যোনিমুখী হবে—যৌজীবনে দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যার যথা স্থান তা গ্রহন করবে।

ধর্ষকাম

ধর্ষকাম কামবিকৃতির আরেকটি রূপ। এটা খুব অল্পদের মধ্যেই অবশ্যই দেখা যায়—যদিও অন্যদের শারীরিক কষ্ট ও ক্লেশে কোন কোন পুরুষ সুখ পায়। দ্য সেড নামক একজন বিশেষ ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তার দাসদের অনবরত চাবুক মেরে তিনি যৌনসুখ লাভ করতেন। একে বলা হয় ধর্ষকাম।*

মর্ষকাম

চাবুক খেয়ে তাতে চরম সুখ ভোগও কেউ কেউ করে—যদিও তাদের সংখ্যা কম। আর্নেষ্ট ম্যাস ছিলেন অমন দলভুক্ত। মারধোর থেকে আনন্দ কিন্তু কেউ কেউ পায়।** বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ায় চাষী-স্ত্রীকে স্বামী যদি না মারতো—তাহলে স্ত্রীদের ধারণা হত স্বামী তাকে তেমন ভালবাসছে না। যৌন কাজে একটু লাগিয়ে দিলে পুরুষদের অনেকে আনন্দ পায়—তেমন ঐ কষ্ট থেকে স্ত্রীরাও সুখ পায়। পুরুষ কাজে একটু ধর্ষকামের আভাষ আছে—স্ত্রীদের মধ্যে মর্ষকামের। এসব যখন মাত্রাধিক্য পৌঁছায় তখন তা নিশ্চয়ই কামবিকৃতি।

শিশুর মানসিক রোগ ও অসমঞ্জস আচরণ

মানসিক রোগ মাত্রের সূত্রপাত শৈশবে না হলেও, পরবর্ত্তীকালে যে সব মানসিক রোগ দেখা যায় তার কিছু কিছু আভাষ শৈশবেও পাওয়া যায়। অন্তবৃত্তি—শৈশবে কোন বন্ধুবান্ধব নেই, একা থাকতে ভালবাসে—খেলাধূলায় আগ্রহ কম—এমন লোকদের কেউ কেউ বয়সে

* Sadism
** Masochism

চিত্তভ্রংশী বাতুলতা বা সিজোফ্রেনিয়া রোগাক্রান্ত হয়। কাঁদুনে শিশু— প্রায়ই বিমর্ষ। এদের কেউ কেউ পরবর্ত্তী কালে বিষাদরোগে ভোগে। কারুর প্রতি কোন বিবেচনা নেই, না বলে পরের জিনিষ নিতে যাদের বাধে না, বদ্‌মেজাজী, পরবর্ত্তীকালে তারা যদি দুষ্ক্রিয়তার পথ বেছে নেয় তবে আশ্চর্য হবার কি আছে।

শৈশবের এইসব আচরণ কিন্তু মানসিক রোগ বা দুষ্ক্রিয়া নয়।* শিশুর অহম দুর্বল—সব কিছুই সহজে তাকে অভিভূত করে। এ কারণে বলা চলে শৈশবে অমন অনেক কাজ অস্বাভাবিক নয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বহু অসুবিধাই সে কাটিয়ে ওঠে। অতীত ভবিষ্যতকে নিয়ন্ত্রিত করে, একথা কিছুটা সত্য হলেও সবখানি সত্য নয়।

বয়স্কদের যে সব রোগ হয় প্রায় সে সমস্ত রোগই শৈশবে হতে পারে। প্রশ্ন এই—এসব রোগের মধ্যে কোন্ কোন্‌টা আবার বেশী হয়। এমন রোগ বা বিকৃত আচরণ দেখা যায় কিনা—যা প্রাপ্ত বয়স্ক-দের মধ্যে দেখা যায় না, বা কম দেখা যায়?

অটিজম

শিশুদের কারুর কারুর মধ্যে 'অটিজম' বলে একজাতীয় মানসিক বিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। অটিজমের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য:

(১) মানুষ সম্বন্ধে এরা সম্পূর্ণ উদাসীন। মানুষের প্রতি এদের কোন আবেগই দেখা যায় না। আবার দেখা গেলেও তা অত্যন্ত ক্ষণিক ও দুর্বল।

(২) এদের আচরণে বুদ্ধিবৃত্তির সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়।

---

* অন্তর্বৃত্তি—নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের প্রতি লোভ—এমন শিশুদের কেউ কেউ জীবনে বড় শিল্পী বা বৈজ্ঞানিক হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত আছে। শৈশবের স্বার্থপরতা কোন কোন ক্ষেত্রে হিংসার থেকে উঠে। ভালোবেসে হিংসাকে অতিক্রম করার কাহিনী বিরল নয়, স্বার্থপরতা সেখানে পরার্থপরতায় শেষ হয়। শৈশবের কান্না পরবর্ত্তী জীবনে মানুষকে 'দুঃখবাদী দার্শনিক' করে এমনও দৃষ্টান্ত রয়েছে।

অটিজমকে কেউ কেউ শৈশবকালীন সিজোফ্রেনিয়া বলে মনে করেন। অন্যদের ধারণা—ঐ দুইয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। সিজোফ্রেনিয়া রোগে অলীক দর্শন, অলীক শ্রবণ স্বাভাবিক। এই জগৎ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। কিন্তু তাদের নিজেদের নির্জ্জন মনগড়া এক জগৎ আছে। ঐ জগৎ সাধারণের চক্ষে অবাস্তব হলেও রোগীদের চক্ষে সত্য। সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে তাদের কাজকারবার। অতিষ্ট শিশুদের মধ্যে ঐ সবের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

সুস্থ শিশুরা নিজেদের কল্পনায় বাস্তবতা আরোপ করে, কল্পলোকে তারা বাস করে কিন্তু মনে মনে তারা জানে, ঐ সব মিছিমিছি, সত্য নয়। কল্পনা ও বাস্তবের প্রাচীর যখন ভেঙ্গে যায়, কল্পনা যখন কারুর কাছে অমোঘে সত্য হয়ে ওঠে তখন তা আর কল্পনাবিলাস থাকেনা, হয়ে দাঁড়ায় রোগ। সিজোফ্রেনিয়া রোগের এটি একটি বৈশিষ্ট্য। শৈশবে সিজোফ্রেনিয়া রোগ হতেও দেখা যায়।

আর একটি মানসিক রোগ বেশী দেখা যায়—সেটা বস্তুভয়। জন্তু-জানোয়ারে প্রতি অত্যাধিক ভয়—কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া, সাপ, আরশোলা, টিকটিকি এসবকে শিশু ভয় করে। জগৎ সমন্ধে শিশুরা কম জানে, এসব কিছু কিছু ভয়কে অস্বাভাবিক বলা চলে না। তবে ভয় যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, যে শিশু দিনেরাত্রে সব সময়ে ভাবে আর ভয় পায় তখন ভাবনার কথা বৈকি। একটি শিশু রাত্রিতে ঘুমোতে পারত না—ভয় বিড়াল এসে তার পা কামড়ে দেবে। দিনে বিড়াল দেখলে সে সেখান থেকে ছুটে পালাত। এটি একটি বস্তুভয় রোগের দৃষ্টান্ত। অপরিচিতের প্রতি ভয়, অন্ধকারের ভয়, বাড়াবাড়ি হলে ছাড়ানো খুব শক্ত, সে সব রোগের পর্যায়ে পড়ে।

বর্ত্তমান সভ্যতাকে অনেকে 'উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। অহেতুক ভীতি, সব কিছুতেই উৎকণ্ঠা—এটা সভ্যজীবনে কিছুটা স্বাভাবিক। অমন ভয় ও আশঙ্কা যখন মাত্রাতিরিক্ত হয় তখনই

তাকে রোগ বলা হয়। শৈশবেও অমন অহেতুক উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কা-পীড়িত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

আত্মকেন্দ্রিকতা শিশুজীবনে স্বাভাবিক। নিজেকে খুব বড় করে ভাবা, তার বাবা বিরাট কেউ, লেখার নিবগুলি সব সোনার এমন উক্তি করতে আমরা একটি শিশুকে দেখেছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অমন ধারণার সঙ্গে প্যারানইয়ার ভ্রান্তবিশ্বাসের সঙ্গে তুলনা চলে।

শিশুদের মধ্যে বাতিক রোগেরও লক্ষণ দেখা যায়। ডান পাশে মুখ করে না শুলে ঘোরতর বিপদ হবে এমন একটি শিশুকে ভাবতে দেখা গেছে। একটি শিশু মাথার কাছে একটি ক্লিপ রেখে শুত—নইলে তার ভয়ানক ভাবনা হত।

শারীরিক কারণ ছাড়াও হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে—কোন কিছু চোখে দেখতে পাচ্ছে না, ডান হাতটা নাড়তে পারছে না—এমন কোন কোন শিশুর মধ্যে ঘটে। একটুতেই বমি করে ফেলা, তড়কা, এইসবে মানসিক রোগের পরিচয় পাওয়া যায়।

যাকে অপরাধ বা দুষ্ক্রিয়া বলা হয়, শিশুদের মধ্যে তা থাকে কি—একথা সর্বপ্রথম বিচার্য। ছোটদের অধিঅহম গড়তে সময় লাগে। ভালোমন্দ জ্ঞান, হিতাহিত জ্ঞান—ছোটদের মধ্যে সামান্যই আছে। এ জিনিষটা অন্যের, হাত দিতে নেই, এ বোধটা তাদের সামান্য। অন্যকে মারলে তার লাগে এটা সে কতটুকু বোঝে—পরানুভূতির ক্ষমতা তার মধ্যে খুবই কম। শিশুরা চলে ইদের (id)* তাগিদে, রাগ হলে তারা হাত পা ছোঁড়ে, সুবিধা পেলে মারধোর করে, কষ্ট হলে তারা কাঁদে, ভালোবাসার মুহূর্তে তারা ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু জানেনা। এসবের মধ্যে তাদের মনের নিয়ম নিয়ন্ত্রণের কোন বালাই নেই। ইচ্ছা হওয়া মাত্র বড়রা তার চরিতার্থ করে না। উচিত ও অনুচিতের কথা ভাবে, ইচ্ছাপূরণে কোন বাস্তব বাধা আছে কিনা বিবেচনা করে।

* **Inherited instinctive impulses of the individual as part of the unconscious.**

শৈশবে মনের—স্বাভাবিক বিকাশ ও প্রাথমিক স্তরে, অভিজ্ঞতার দ্বারা বাস্তবজ্ঞান ও বাস্তব বুদ্ধিও গড়ে ওঠেনি—এই সময় তাদের কিছু কিছু আচরণ যদি সামাজিক নিয়ম নীতি ভঙ্গ করে, অন্যদের ক্ষতির কারণ হয়, তাদের দুষ্ক্রিয়া বলে কোনমতেই অভিহিত করা চলে না। এইসব আচরণকে অসমঞ্জস আচরণ বলে আখ্যায়িত করা হয়। এসব অপরাধের পর্যায়ে না পড়লেও এতে শিশুর অভিভাবকদের অসুবিধা হয়, শিশুরও মনোকষ্টের কারণ হয়। শিশুর অসমঞ্জস আচরণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। অসমঞ্জস আচরণ দুই প্রকারের—(১) আত্মবিরোধী, (২) অসামাজিক ও সমাজবিরোধী।

(১) আত্মবিরোধী আচরণ

কোন কোন শিশুর মধ্যে আত্মবিশ্বাসের একান্ত অভাব। কেউ অত্যধিক লাজুক, অত্যধিক ভীতু, কেউ বা নির্জীব প্রাণশূন্য। এই সব শিশুরা নিজেরা নিজেদের শত্রু। এইসব শিশুদের অমন আত্মবিরোধী মনোভাব ও আচরণের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। শিক্ষক শিক্ষিকা-দের কাছে এরা বড় সমস্যা নয়, এরা স্কুলের শৃঙ্খলা ভাঙ্গছে না—কিন্তু মনোচিকিৎসকরা এদের নিয়েই ভাবেন। এরা কিছুটা মানসিক রোগের পথেই অগ্রসর হয়েছে। আত্মবিরোধী মনোভাব ও আচরণের একটা ছোট তালিকা উল্লেখ করছি।

শৈশবে আত্মবিরোধী আচরণ

(১) খেলে না, খেলতে ভালোবাসে না।
(২) কারুর সঙ্গে মেশে না, মিশতে পারে না।
(৩) সদা বিষণ্ণ।
(৪) আত্মবিশ্বাসের একান্ত অভাব, হীনত্ববোধ।
(৫) নিজেকে মন্দ ভাবা।
(৬) প্রাণশক্তি ও প্রাণচাঞ্চল্যের একান্ত অভাব।

(৭) অত্যধিক পরিমাণে অস্থিরচিত্ত।

(৮) কোন ব্যাপারেই মনোনিবেশে অপারগ।

(৯) ঘুমের মধ্যে বিছানায় প্রস্রাব করা।

(১০) বাড়াবাড়ি আঙ্গুল চোষা।

(১১) অনিদ্রা, ইত্যাদি।

(২) অসামাজিক ও সমাজবিরোধী মনোভাব ও আচরণ

অসামাজিক ও সমাজবিরোধী মনোভাব ও আচরণের কথা বলতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন করতে হয় শিশুর সমাজ কি? উত্তর হবে শিশুর পরিবার, তার বিদ্যালয় ও খেলার মাঠ। একটা বয়স পর্যন্ত শিশু আইনের চক্ষে অপরাধী নয়। শিশুর অসামাজিক বা সমাজবিরোধী কাজে শিক্ষক-শিক্ষিকারা রুষ্ট হন, পিতামাতা ক্ষুব্ধ ও ভাবিত হন, বন্ধুবান্ধবেরা তাকে এড়িয়ে চলে। শিশুর সমাজবিরোধী আচরণের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নীচে দেওয়া হল।

শৈশবে সমাজবিরোধী আচরণ*

(১) চুরি।

(২) অন্যকে গুরুতর আঘাত করা।

(৩) অত্যধিক বদমেজাজী মনোভাব।

(৪) রাগ হলে কেঁদে কেটে হাত পা ছোঁড়া, মাটিতে মাথা ঠুকে সবাইকে পাগল করে তোলা।

(৫) বাড়াবাড়ি রকমের ঝগড়া করা।

(৬) সর্বদা মিথ্যে কথা বলা।

(৭) স্কুল পালানো।

* ঐ তালিকা থেকে হস্তমৈথুনকে আমরা বাদ দিয়েছি। বেশীরভাগ মনোবিদদের ধারণা—বাড়াবাড়ি না হলে হস্তমৈথুন সুস্থ স্বাভাবিক শিশুদের আচরণ।

অসামজিক ও আত্মবিরোধী আচরণের মূল কি এ নিয়ে মনোবিদরা কিছু কিছু অনুসন্ধান করেছেন। কারণ না জানলে আচরণের মূল উৎপাটন সম্ভব নয়।

অসমঞ্জস আচরণের কারণ

শিশুর অসমঞ্জস আচরণের কারণ সম্বন্ধে ভাবতে গেলে এর প্রথম উত্তর হল—শিশু বোঝেনা, শিশু জানে না। শিশুর বাস্তবজ্ঞান কম, অধিঅহম দুর্বল, অন্যদের সুবিধা অসুবিধা বোঝবার তেমন ক্ষমতাও ওদের মধ্যে নেই। ঐসব অক্ষমতা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হয়ে যাবে। একথা বলা চলে যে প্রাণপ্রাচুর্যের উদ্দাম প্রকাশ অমন আতিশয্যের একটি কারণ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, গাছ মিথ্যা কথা বলে না, ব্যাভিচার করে না, তবু গাছ গাছই, মানুষ মানুষই। গাছ মানুষের জীবনের আদর্শ হতে পারে না। শিশুর ক্ষেত্রেও ঐ কথা হাজার গুণ বেশী খাটে। মানসিক স্বাস্থ্যবিচারে একটি প্রাণশূন্য শিশুর থেকে একটি দুরন্ত শিশু অনেক ভালো। শিশু সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলার পরোয়া করে না। তবু তার ভবিষ্যৎ আছে। যে প্রাণ প্রাচুর্যে সে ভুল পথে গেছে, সেই প্রাণ প্রাচুর্যের সহায়তায় সমাজ জীবনে নিজেকে সে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। এমন দৃষ্টান্ত বহু আছে।

সমাজবিরোধী আচরণের কারণ সম্বন্ধে যা পাওয়া গেছে সাধারণভাবে তার দু-একটি সত্যকে এখানে উল্লেখ করা হবে। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আরম্ভ করি। একটি ছোট ছেলে পয়সা চুরি করত বাবার পকেট থেকে। মায়ের কাছ থেকে সে চাইত, চেয়ে নিত। বাবা শিশুকে পারতপক্ষে কিছু দিতেন না। তিনি শিশুকে অপছন্দ করতেন। তাকে খুব মারধোরও করতেন। ছেলেটির একটি বড় বোনের প্রতি বাবার ভালোবাসা ছিল। তাকে প্রতি মাসে কিছু হাত খরচ দিতেন। ছেলেটি বাবার পকেট থেকেই চুরি করত, কিছু কেনবার জন্য পয়সা তার দরকার। কিন্তু অনুসন্ধানের দ্বারা এটা পাওয়া গেছে, তার চুরির

এটাই প্রধান কারণ নয়। বাবার উপর তার রাগ। বাবার পকেট থেকে চুরির মধ্য দিয়ে সেই রাগ শিশু চরিতার্থ করছে, বাবার সঙ্গে লড়াই করবার জোর শিশুর নেই। তাই 'চোরের মত' বাবার উপর সে তার আক্রোশ মেটাতো।*

শিশুর মানসিক রোগ, অসমঞ্জস আচরণ, এমন কি দুষ্ক্রিয়ার মূলে দুটি জিনিষ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। পিতামাতার স্নেহ থেকে যারা বঞ্চিত, বিশেষতঃ পিতামাতার অত্যধিক শাসনে যারা পীড়িত—অমন শিশুদের জীবনে ঐ জাতীয় অভিশাপ নেমে আসে। বঞ্চিত হবার ক্ষোভ ও রোষ, অত্যধিক শাসনের ফলে যে পুঞ্জীভূত ক্রোধ শিশুমনে জমা হয়, সে রোষ দুইভাবে আত্মপ্রকাশ করে। একথা বোধহয় বলা চলে ক্রোধ আত্মাভিমুখী হয়ে শিশুকে প্রধানতঃ মানসিক রোগগ্রস্ত করে, আর ক্রোধ বহির্মুখীরূপে প্রধানতঃ দুষ্ক্রিয় ও সমাজবিরোধী অসমঞ্জস আচরণের রূপ নেয়। শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য অটুট রাখবার জন্য, অসুস্থ শিশুকে সুস্থ করে তোলার জন্য পিতামাতার যথোচিত স্নেহ ও ভালোবাসা যেমন দরকার, তেমন পিতামাতার শাসনপীড়ন যেন মাত্রা না ছড়ায়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আমাদের অভিজ্ঞতা শিশুপীড়ন সর্বদা পরিত্যজ্য। ভালোবাসা একটু আধটু কম হলে অসুবিধা হয় না—কিন্তু পীড়ন বেশী হওয়া সর্বদা অনিষ্টকর। স্নেহ ভালোবাসায় পক্ষপাতিত্ব শিশুদের হিংসার কারণ হয়। ব্যক্ত বা অব্যক্ত ঐ হিংসায় রাগ ও কষ্ট সমভাবে দুইই থাকে। বাবামায়ের, বিশেষতঃ মায়ের, ভালোবাসা যে অন্য ভাইবোনদের তুলনায় কম পেল, সে নিজেকে ছোট ও মন্দ ভাববে তাতে আশ্চর্য কি আছে! "ভালোবাসার উপযুক্ত আমি নই—আমি অপদার্থ, আমি খারাপ—তাই মা আমাকে ভালোবাসেন না"। একটি সাত বছরের মেয়ে আমাদের একথা বললো। এটাই অবহেলিত শিশুদের

* J. C. Dasgupta—Behaviour Problems of School Children, Calcutta University, 1968.

চিন্তার ধারা। নিজেকে যে মন্দ ভাবে সে মন্দ কাজ করবে এতে আশ্চর্যের কি আছে। দশ বছরের একটি ছেলে চুরি করতো—বাড়ীর জিনিষপত্র। একদিন সে স্বগতোক্তি করছিল—'কিছু চুরি হলেই সবাই বলে আমি চুরি করেছি। চুরি না করলেও আমার নামে দোষ—তাই আমি চুরিই করি'।

ভালো কাজ করবার স্পৃহার জন্য দরকার নিজেকে ভালো ভাবা—অমন ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটি আত্মমর্যাদাবোধ গড়ে তোলা।

কিছু কিছু পিতামাতা আছেন, যারা তাদের ভালোবাসা ও শাসন দিয়ে শিশুকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেন। তাদের মনোভাব—তারাই সব বোঝেন, শিশু কিছুই বোঝেনা। শিশুর ইচ্ছাঅনিচ্ছাকে এরা মূল্য দেন না, শিশুর ভালোমন্দে নিজেদের মতামতকে তাঁরা খাটান। শিশু কি খাবে, কতটা খাবে, কি পরবে, কখন কোন কাজটা তাকে করতে হবে, তারা সবটা স্থির করেন। একথা ঠিক, শিশু ছোট, সব কিছু সে বোঝেনা। তাই বলে বাবামায়ের চোখে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্য নেই—এ কেমন কথা! শিশু বাবামায়ের একটি অংশ বিশেষ হয়ে বড় হয়, তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্যবোধ গড়ে ওঠে না। কিন্তু এতে শিশুর বড় হবার, তার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা ক্ষুণ্ণ হয়। শিশুর মনের গভীরে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়। এমনও দেখা গেছে সিজোফ্রেনিয়া রোগীদের অনেকের মা অত্যধিক প্রভুত্বপরায়ণ।*

পিতামাতা যেখানে দিবারাত্র ঝগড়াঝাটি করেন এমন পরিবেশে শিশু ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়। নিজেকে একান্ত অসহায় মনে করে। যেসব পিতামাতা বিছিন্ন সেখানে শিশুরা অসহায় বোধ করে। মনের দিক থেকে তাদের খুবই অসুবিধা হয়।

শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যলাভে পিতামাতার মনোভাব ও আচরণের স্থান সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ—শিশুর প্রতি পিতামাতার আচরণ, পিতা-

* তড়িৎ চ্যাটার্জি—পি এইচ ডি থিসিস।

মাতার নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আচরণ, প্রভৃতি।

শিশুদের অসুবিধা ও অস্বাস্থ্যে পিতামাতারা উদ্বিগ্ন হন, কিন্তু শিশুর প্রতি তাদের মনোভাব ও আচরণের ফল তা তাঁরা বেশীর ভাগ সময় বোঝেন না। মনোবিদদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ মা বাবার সঙ্গে কথা বলে, পিতামাতারা যাতে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন তারই চেষ্টা করা, পিতামাতাকে পরামর্শ দেওয়া। কিছুটা ফল সাধারণতঃ তাতে হয়, তবে সবটা কখনোই নয়। যে ইচ্ছা মানুষদের পরিচালনা করে তা কতটাই বা তাদের ইচ্ছাধীন! খুন যারা করে, খুন করা যে অন্যায় তাদের অনেকেই তা জানে। কিন্তু খুন না করে তারা পারে না। সোপেনহাওয়ারের একটি উক্তি আছে—"ইচ্ছানুযায়ী কাজ আমরা করি, কিন্তু ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছাধীন নয়"।

শিশুদের সাহায্য করবার আরেকটি পথ হল—পিতামাতার কোন প্রতিভূ যেন তারা পায়। ঐ প্রতিভূরা যাতে পিতামাতার গুণটুকু পায়, দোষটুকু বাদ দিয়ে। তবে পিতামাতার স্থান কি কেউ পূরণ করতে পারে! এ দুধের স্বাদ ঘোল দিয়ে মেটানো। তবে এও ঠিক শিশুমনের যেটুকু চাওয়া, তার কিছুটা যদি তারা মেটাতে পারে সেটুকুই লাভ। ঈশ্বরে যাদের বিশ্বাস আছে, ঈশ্বরে যাদের ভক্তি আছে, এমন কি যারা ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারে* —ঈশ্বরের মধ্যে তাদের পিতামাতাকে তারা খুঁজে পাবে। নিজেদের পিতামাতার চেয়ে তিনি বেশী প্রেমময়, পিতামাতার চেয়েও যার উপর বেশী নির্ভর করা যায়। মনের ক্ষত নিরাময়ে আধ্যাত্মিকতার স্থান খুবই বড়।**

স্বাভাবিক শিশুদের মধ্যে একটি সহজ আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদা-বোধ গড়ে উঠে। সে জানে সমাজে ও পরিবারে তার একটি মূল্য আছে, যা করণীয় তা সে করতে পারে—সে অক্ষম ও অপারগ নয়।

---

* এটা কিশোর কিশোরী এবং বয়স্ক লোকদের সবার বেলাই প্রযোজ্য।

** 'মানসিক স্বাস্থ্য ও রোগ' অধ্যায়টি দেখুন।

অস্বাভাবিকদের আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস ভাঙ্গাচোরা—নিজেদের তারা ধিক্কার দিতে শেখে, অপর দিকে ঐ "আমির" প্রতি তাদের করুণার সীমা থাকে না। কল্পনায় ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে আকাশছোঁয়া এক বিকৃত অহঙ্কারের জন্ম দেয়। আত্মপ্রতিষ্ঠার সুস্থপথ অগম্য হলে দুষ্ক্রিয়, সমাজবিরোধী আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ বেছে নেয়। "রাম হতে পারলাম না, রাবণ হলাম"।

সকলে সব কিছু পারে না।. যা পারে, যেটুকু পারে, তাই নিয়েই তার সুস্থ স্বাভাবিক জীবন গড়ে তুলতে হবে। যারা বেশী পারে তাদের সঙ্গে নিজেকে তুলনা না করে, যারা কম পারে তাদের সঙ্গেওতো তুলনা করা চলে। ঐ দিকে শিশুদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে। শিশু যাতে নিজেকে গ্রহণ করতে পারে, এরই মধ্যে স্বীয় মর্যাদা যাতে খুঁজে পায় তারই জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

শিশু বলবে—সে মন্দ, সে অপদার্থ। তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে 'কেন তুমি নিজেকে অমন মন্দ মনে করছ!' তার কথা মন দিয়ে শুনতে হবে। ধীরে ধীরে, ধৈর্য সহকারে তাকে বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে 'তোমার ধারণা কি ঠিক?' বারবার ও কথা শুনতে শুনতে নিজের সম্বন্ধে তার অমন নেতিমূলক ধারণা ধাক্কা খাবে। নিজেকে নিজেই জিজ্ঞাসা করবে, 'নিজেকে আমি যতটা খারাপ ভাবছি—আমি কি ততটা খারাপ? নিজেকে যতটা আমি অপদার্থ ভাবছি—আমি কি সত্যিই অতটা অপদার্থ?' এইভাবে ধীরে ধীরে তার নিজের সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত সুস্থ মনোভাব গড়ে উঠবে। নিজেকে যে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে তার কাছে ভালো হবার পথ নিজে থেকেই মুক্ত হয়ে যাবে।

একথাও সত্য, জগতে মন্দ কেউই নয়। ভ্রান্তি হতে পারে—সে ভ্রান্তির থেকে মুক্তির পথ, শিশুর মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ প্রোথিত করা কি কঠিন? হ্যাঁ, খুবই কঠিন—তবে দীর্ঘকাল চেষ্টার দ্বারা তা করা যায়। পিতামাতার, শিক্ষক শিক্ষিকার ধৈর্য, ভালোবাসা এবং অনন্ত ক্ষমা এ কাজে আবশ্যক। ভালোবাসার যাদুদণ্ডের স্পর্শের দ্বারা সবই সম্ভব।

তবে সেটা সত্যি ভালবাসা হবে ভালোবাসার ভান নয়।

অপরাধ যারা করে অপরাধ করাটা তাদের নেশার মত পেয়ে বসে। ঐ কাজ থেকে বিরত হওয়ার জন্য ত্যাগ ও সংযম দরকার। যারা ভালোবাসা পায় ও পাচ্ছে, অন্যদের ভালোবাসাকে যারা মূল্য দেয়, যাদের মধ্যে একটা মর্যাদাবোধ গড়ে উঠছে তাদের পক্ষেই ঐ ত্যাগ ও সংযম সম্ভব। পিতামাতার বিরূপ মনোভাব, তিরস্কার ও লাঞ্ছনায় যারা নিজেদের মন্দ বলে ভাবতে শিখেছে তাদের মধ্যে "আমি ভালো" এমন সুস্থ মনোভাব গড়ে না তোলা পর্যন্ত বিপথ থেকে সুপথে তাদের ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না।

সাধারণভাবে অমন মন্তব্য সত্য হলেও প্রত্যেকটি অসামাজিক আচরণকে বিশ্লেষণ করে তার যথার্থ কারণটি বুঝতে হবে।

অধিকাংশ সমাজবিরোধী আচরণে শিশু নিজেকে মন্দ বলে ভাবে। আত্মবিরোধী আচরণেও তাই। নিজেকে অপরাধী মনে করা প্রায় সবরকম রোগ ভুক্রিয়ার মূলে আছে। অপরাধী ভাববার কারণ নেই, কিংবা কারণটি সামান্য—তবুও নিজেকে অপরাধী বলে ভাবা এটা মানসিক বিকার বৈকি।

কৈশোরে মানসিক রোগ ও দুশ্চিন্তা

বাল্য ও যৌবনের মধ্যবর্ত্তী বয়সকে কৈশোর বলা হয়। এটা সাধারণতঃ এগারো থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত। একে বয়ঃসন্ধিকাল বলা চলে। বয়ঃসন্ধিকালের দুটি ভাগ—প্রথম ভাগ এবং শেষভাগ। প্রথম ভাগকে কৈশোর এবং পরবর্ত্তীকালকে নবযৌবন বলা হয়। নবযৌবন ষোল থেকে উনিশ বছর পর্যন্ত।

কৈশোর ও কিছুটা নবযৌবনে দেহমনে জোয়ার আসে। যৌন-অঙ্গের পূর্ণতা লাভ, দৈর্ঘ্যে দেহের দ্রুতবৃদ্ধি, মনের আশ্চর্য পরিবর্ত্তন—অভাবনীয়, অজানা আবেগের উদয় দেহমন বিকাশের বৈশিষ্ট।

বয়ঃসন্ধিকাল শৈশবের সমাপ্তি ও কৈশোরের আরম্ভ। একদিকে মৃত্যু ও অপরদিকে নবজন্ম। কেউ কেউ মনে করেন—এসব মূলতঃ মরণইচ্ছা ও জীবনইচ্ছারই অভিব্যক্তি। এই ইচ্ছাদুটির মধ্যে সংঘাতের ফলে মনের স্থৈর্য ও ভারসাম্যের কিছুটা ব্যাঘাত হয়। কিশোর কিশোরীরা কখনও ভাবে, "আমরা বাঁচতে চাই, প্রবল ও প্রচুর রূপে বাঁচতে চাই"। আবার কখনও তাদের ভাবনা, "বেঁচে থেকে লাভ কী, আমি মরতে চাই, মরে বাঁচতে চাই"। এই সময়ে কিশোর কিশোরীদের মনে আসে বিদ্রোহাত্মক, আত্মপ্রতিষ্টার বাসনা (জীবন ইচ্ছার প্রকাশ) আবার সময় সময় অবসাদ ও বিষাদের ঘনমেঘে মন আচ্ছন্ন হয় (মরণ ইচ্ছা)। আত্মহত্যার ঘটনা এবয়সে বিরল নয়। যৌন আকাঙ্ক্ষাও প্রবল হয়—অনেকে হস্তমৈথুন ক'রে কামপরিতৃপ্ত করে। ছেলেদের মধ্যে সমকামিতা, স্ত্রী ইচ্ছার উদয় হয়। মেয়েদের মধ্যে সম-কামিতা ও পুরুষ ইচ্ছা। "আমি কে" এই প্রশ্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে জাগে।

পিতা মাতার উপর নির্ভরতা, তাদের প্রতি আনুগত্য কিছুটা দুর্বল হয়। সঙ্গে সঙ্গে কোথাও তাদের মন বাঁধা পড়তে চায়, কার প্রতি সে অনুগত হবে—এমন ভাবনা তার মনে আসে। তার ইচ্ছা অন্তর্দ্বন্দ্বে দ্বিধাদীর্ণ।

এই সমাজে যৌন উত্তেজনার ছড়াছড়ি। বিজ্ঞাপন, গল্প, সিনেমা ও টেলিভিশন—মূখ্যতঃ যৌন উত্তেজকের কাজ করে। কিন্তু যৌন পরিতৃপ্তি, যৌন উত্তেজনা প্রশমনের পথ কিশোর কিশোরীদের জীবনে প্রায় রুদ্ধ। মানসিক অস্থিরতা, এমনকি মানসিক ব্যাধি ও বিকৃতির, এটিও একটি কারণ।

বড়দের জীবনে যে সব মানসিক রোগ হয়—তার সবকয়টিই কৈশোরে হতে পারে। কোন কোন রোগ আছে কৈশোরেই তার সূত্রপাত। মৃগীরোগ তারই একটি দৃষ্টান্ত। সরল সিজোফ্রেনিয়ায় কিশোর কিশোরীরা ভোগে। বিষাদ রোগ এদের মধ্যে দেখা যায়। বায়ু রোগও এদের মধ্যে হয়—উৎকণ্ঠা, বাতিকরোগ, হিস্টিরিয়া, প্রভৃতি।

শিশুদের অসামাজিক আচরণকে আমরা অসমঞ্জস আচরণ বলে অভিহিত করেছি। তাদের বাস্তবজ্ঞান কম, অধিঅহম্ গড়ে ওঠেনি। কিশোর কিশোরীদের ক্ষেত্রে অমন কথা বলা যায় না। বাস্তবের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় তাদের হয়েছে—আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে, পড়াশুনা না করলে পরীক্ষায় সে ফেল করবে, পয়সা না দিয়ে দোকান থেকে কোন জিনিস কেনা যায় না। কোনটা উচিত, কোনটা অনুচিত, এই বোধটাও তার কিছু কিছু হয়েছে। তার অসামাজিক বা সমাজ-বিরোধী আচরণকে তাই বলা হয় দুষ্ক্রিয়া।

স্কুলের কিছু কিছু নিয়মকানুন আছে, গৃহেরও। এইসব নিয়ম যখন কেউ লঙ্ঘণ করে—তাকেও বলা যেতে পারে দুষ্ক্রিয়ার মৃদুরূপ। স্কুল পালানো, ছোটদের বাড়াবাড়ি রকমের আঘাত করা, অন্য ছেলে-মেয়েদের জিনিষপত্র না বলে নেওয়া, এ সবই দুষ্ক্রিয়ার পর্যায়ে পড়ে।

তাছাড়া রয়েছে বৃহত্তর সমাজের নিয়মকানুন লঙ্ঘণ করা। ঐ বয়সে অমন অপরাধ আইনের চক্ষে দণ্ডনীয় না হলেও অপরাধ বটেই। কোন কোন ছেলেমেয়ে চুরি করে, ছিনতাই করে। একটি বারবছরের ছেলে একটি নবছরের মেয়েকে গলাটিপে মেরেছে—সংশোধনাগারে তাকে রাখা হয়েছে এমন ঘটনাও আছে।

পূর্বেও বলা হয়েছে যে দুটি প্রবৃত্তি শিশু, কিশোর কিশোরী ও বয়স্কদের মানসিক রোগ ও দুষ্ক্রিয়ার মূলে আছে—তার একটি হচ্ছে কাম, অপরটি ক্রোধ। অনেক আধুনিক মনোবিজ্ঞানী ক্রোধকে এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেন। পিতামাতার শাসন মাত্রা ছাড়ালে ক্ষোভ ও ক্রোধ মনে পুঞ্জীভূত হয়। বাবামায়ের উপর তাদের রাগ হয়, আবার নিজের উপরেও রাগ হয়। বাবামায়ের স্নেহের স্বাদ যারা বেশী পায়নি, তাদের রাগটা বিশেষ করে অন্যদের উপর। যাদের বাবা মায়েরা ভালোবাসেন, আবার খুব রাগও করেন তাদের রোষটা আত্মাভিমুখী হয়। তাদের অধিঅহম্ প্রধানতঃ নিপীড়ক, তাদের মধ্যে অপরাধ বোধের আধিক্য বেশী। ঐ অপরাধবোধকে তারা বহুলাংশে অবদমিত করে, ফলে তার মধ্যে মানসিক রোগের সৃষ্টি হয়। অন্যদের প্রতি ছোটদের রাগেরও কিছুটা অবদমন ঘটে। ঐ বহির্মুখী ক্রোধের বিকৃত প্রকাশই তাদের দুষ্ক্রিয়ার পথে ঠেলে দেয়।

বিষয়টিকে আরও বিস্তৃতভাবে বলি। বাবামায়ের ভালোবাসা লাভের সৌভাগ্য যাদের শৈশবে হয়েছে, তারা পিতামাতাকে মুখ্যতঃ ভালবাসে। তাদের ক্রোধ মুখ্যতঃ পিতামাতার বিরুদ্ধে ধাবিত না হয়ে নিজেদের বিরুদ্ধেই ধাবিত হয়। "বাবা মা আমাকে মারছেন—দোষত আমারই" এমন তাদের মনোভাব। এদের কেউ কেউ মানসিক রোগগ্রস্ত হয়। যেখানে পিতামাতা মুখ্যতঃ তাড়নাই করে, স্নেহ, মায়া, দয়া ব্যাপারে উদাসীন, অমন ছেলেমেয়েরা ঐ তাড়নায় নিজেদের দোষের চেয়ে বাবা মায়ের দোষটাই বেশী করে দেখে।

নিজের মূল্য ও মর্যাদা সঠিকভাবে বোধ করবার জন্য দরকার দুটি জিনিষ। (১) জীবনে সাফল্যলাভ এবং (২) যথোচিত ভালবাসা পাওয়া।
এতে বহুলাংশে বঞ্চিত হলে কেউ কেউ দুষ্ক্রিয় হয়ে ওঠে। ভালোবাসা-লাভের দ্বারা মানুষ নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়—'তাহলে আমি আছি'। অভীষ্টকাজে কৃতকার্য হলে মানুষ আত্মপ্রসাদ লাভ করে—অনেক সময় এরা প্রশংসাও পায়।

এসবের দ্বারা মানুষের মনে একটি সুস্থ আত্মসম্মানবোধ গড়ে ওঠে। ভালবাসার যেখানে অভাব ঘটে, যেখানে ছেলেমেয়েরা পারে না, বারবার অকৃতকার্য হয়, সেখানে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করবার জন্য দুষ্ক্রিয়ার পথ বেছে নেয়। 'আমাদের সম্বন্ধে তোমাদের ঔদাসীন্য আমরা সহ্য করব না, তোমাদের অনিষ্ট আমরা করব, ভয় ও কষ্টের সঙ্গে তোমাদের স্বীকার করতে হবে তবে এরাওত আছে'।

বার্ধক্যে মানসিক স্বাস্থ্য

একটি বয়সে মানুষ বৃদ্ধ হয়। আবার কেউ কেউ বৃদ্ধ হবার আগেই মারা যান। তবে অধুনাকালে নানারকম ওষুধপত্র উদ্ভাবনের ফলে মানুষের গড় আয়ু যথেষ্ট বেড়ে গেছে।

বৃদ্ধের সংখ্যাও আজকাল বেশী। আগে বলা হত পঞ্চাশ পার হলেই বুড়ো। কিন্তু এখন ষাট/সত্তরের আগে সাধারণতঃ একথা বলা হয় না।

একথা সত্য, মৃত্যু যেমন অনিবার্য, বার্ধক্য তেমন নয়। মৃত্যুর সঙ্গে মানুষ মনে মনে আপোষ করে, একটা প্রস্তুতিও মনে গড়ে ওঠে। মৃত্যুর আর্কষণও কেউ কেউ অনুভব করে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"মরণ রে তুঁহু মম শ্যামসমান"। জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে বায়রণ লিখেছেন, "তুমিও একদিন বিশ্রাম লাভ করবে"। আর এক জায়গায় লিখেছেন—"আমি মরতে ভয় পাইনা"।

বার্ধক্যে দেহমনের শক্তিসামর্থ্য বিশেষরূপে হ্রাস পায়। মাংসপেশী শিথিল হয়, দেহের চামড়া কুঞ্চিত হয়, শরীর দুর্বল হয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় প্রায় সবকিছুরই ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে আসে।

মনের দিক বিচার করলে বলা যায় বার্ধক্যে স্মরণশক্তি বিশেষ রূপে প্রভাবিত হয়। মনোবিদদের অভিমত বুদ্ধিও হ্রাস পায়।

দেহমনের এমন অক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষদের, বিশেষতঃ পুরুষদের, কর্মজীবনেও গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটে। যারা চাকুরীজীবি তাদের অবসর নিতে হয়। ব্যবসা বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের হয়ত কিছুটা বেশী বয়সে কাজ থেকে সরে আসতে হয়। অর্থোপার্জনের ক্ষমতা তাদের

কমে, সাথে সাথে পারিবারিক জীবনেও তাদের মূল্য, মান মর্যাদা হ্রাস পায়। পরিবারে যে অভিভাবকত্ব ও কর্তৃত্ব তাদের হাতে ছিল তা তাদের আর থাকেনা। দেহমনে অক্ষমতার জন্য তাদের কিছুটা পর মুখাপেক্ষী হতে হয়, অন্যদের অনুগ্রহের উপর তাদের বেঁচে থাকতে হয়।

বৃদ্ধদের মনে এসবের প্রভাব পড়ে। সংসারে তাদের আর দরকার নেই—এমন ধারণা তাদের মনে বাসা বাঁধে। অন্যদের কাছে তারা অনাকাঙ্ক্ষিত, বোঝামাত্র, এমন বোধও তাদের পীড়িত করে। "এ সংসারে আমার আর স্থান কোথায়—এখন মরলেই বাঁচি" এমন কথা তাদের অনেকের মুখেই শোনা যায়।

গৃহেই যাঁদের স্থান, সংসারে এতদিন যাঁরা কর্তৃত্ব করে এসেছেন, সকলকে রেঁধে বেড়ে খাইয়েছেন—তাঁদের ছেলেপুলেরা বড় হয়, সেই ছেলেমেয়েদেরও সংসার হয়—কর্ত্রীকে কর্তৃত্ব ছেড়ে, রাঁধাবাড়ার দায়িত্ব থেকে সরে আসতে হয়। একটা শূন্যতা তাদেরও আশ্রয় করে। মৃত্যুর দিকে তাঁরাও তাকান।

মানুষের দুটি মৌলবাসনা বা তৃষ্ণা আছে। একটি বাঁচবার, অপরটি মরবার। মানুষ বাঁচতে চায়, আবার মরতেও চায়। শৈশবের যৌবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কর্ম প্রচেষ্টায় জীববাসনা প্রকাশিত হয়। 'জীবন অর্থহীন' নিরন্তর এই বোধ, বিষাদ, আত্মধিক্কার, আত্মহত্যা, এসবের মধ্যদিয়ে মৃত্যু ইচ্ছা সরবে প্রকাশিত হয়। মৃত্যু ইচ্ছা অনেক সময় দেহমনে নিঃশব্দে কাজ করে।

প্রায় সাতশ, বিভিন্ন বয়সের নরনারীদের নিয়ে হানসা কোঠারি একটি অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছে। জীবনবাসনা ও মৃত্যুবাসনা কার কতখানি তা পরিমাপের জন্য প্রস্তুত দুটি প্রশ্নাবলী ঐ সব নরনারীদের উপর প্রয়োগ করা হয়। যা পাওয়া গেছে, তার দু-একটি কথা নীচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল। সকলের মধ্যে ঐ দুটি মৌলবাসনা কম বেশী বর্তমান। জীবনের তৃষ্ণা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা কমে আসে,

কিন্তু মৃত্যু ইচ্ছা বিভিন্ন বয়সে একই রকম থাকে। শেষ যাট ও সত্তর বছর বয়সে জীবনের ইচ্ছা যেমন কমে, মৃত্যুর ইচ্ছাও তেমনি বাড়ে। দেহের ক্ষয়ক্ষতি অবশেষে মৃত্যুর মূলে এইদুটি বিপরীতমুখী শক্তির কতখানি প্রভাব একথা বিশেষভাবে বিবেচ্য।

দেহমনের ভিতরের বা বাইরের অসুবিধা মৃত্যু ইচ্ছাকে বাড়ায়। নিজেদের যারা ঘৃণা করে, তাদের মধ্যে মৃত্যু ইচ্ছা বেশী হয়। যে মন অবসাদগ্রস্ত তার মধ্যে মৃত্যু ইচ্ছা প্রবল। যে সব বৃদ্ধদের পরিবারে ঠাঁই হয় না—বৃদ্ধাবাসে গিয়ে থাকতে হয়, তাদের মধ্যে মৃত্যু ইচ্ছা বড় হয়ে ওঠে। এটা অবশ্য বৃদ্ধাবাসের প্রকৃতি কেমন তার উপরে কিছুটা নির্ভর করে।

বড় ছোট, উঁচু নীচু—এই ভাবটা মানুষের মজ্জাগত। পূর্বে একাধিকবার আমরা উল্লেখ করেছি যে, ভাবলে এই মনোভাবের কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়না, তবে আবেগ জীবনের গভীরে যে বদ্ধমূল ধারণা যুক্তি বিবেচনার দ্বারা, তার উৎপাটন করা সহজ নয়। ছোটরা ভাবে—আমরা ছোট, তবুও তারা আশা করে, করতে পারে—আমরা বড় হব, একদিন আমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি হবে। মধ্যবয়সে নিজেদের পরিবারে, বাইরের কাজে নিজেদের ক্ষমতার দ্বারা মানুষ আত্মপ্রসাদ লাভ করে, পরিবার ও কর্মজীবনে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তির স্বাদ পায়। বার্দ্ধক্যে ক্ষমতা কম, প্রভাব প্রতিপত্তি প্রায় নেই বললেই চলে—তারা কিসের আশায় দিন কাটাবে ? মৃত্যু ছাড়া তাদের আর কি আশা করবার আছে !

বৃদ্ধদের কেউ কেউ অতীতে আশ্রয় খোঁজ। অতীতের গরিমার কথা ভাবে, অতীতের গৌরবের কথা তারা বলে। তাই বলা যেতে পারে বৃদ্ধরা বাস করে অতীতে, শিশু ভবিষ্যতে আর যৌবন বাস করে বর্তমানে। অমন উক্তি পুরোপুরি সত্য না হলেও অনেকাংশে সত্য।

বৃদ্ধেরা কমবেশী বিষণ্ণ হয়। গাঢ়, দীর্ঘস্থায়ী বিষণ্ণতা একপ্রকার

মানসিক রোগ। অমন রোগের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। কিন্তু বার্দ্ধক্যের বিষণ্ণতা সম্পূর্ণ বাস্তবভিত্তিহীন নয়। ঐ কারণে অমন বিষণ্ণতা যদি মাত্রাতিরিক্ত না হয়, তাকে রোগ না বললেও চলে। তবে বিষণ্ণতা সুখকর অনুভূতি নয়। বৃদ্ধদেরও নিশ্চয়ই শান্তি ও স্বস্তি পাবার অধিকার আছে।

'ভুলে যাওয়া' বার্দ্ধক্যের একটি লক্ষণ—বিশেষ করে ভুলটা হয় বর্তমান জীবনের ঘটনার। এটি রোগের পর্যায়ে পড়ে যখন মানুষ সব কিছু ভুলে যায়—এমনকি নিজেকে, কি তার নাম, কি তার ঠিকানা। এমন ভুলে যাওয়ার মধ্যে দেহমনের দুইয়েরই গোলমাল রয়েছে।

নানাপ্রকার মানসিক রোগে কেউ কেউ ভোগে। এই বয়সে রোগগ্রস্ত হলে ওষুধপত্রে কিছু কাজ হলেও মনঃসমীক্ষা চলে না। পঞ্চাশোর্দ্ধে ব্যক্তিদের মনঃসমীক্ষায় বিশেষ কাজ হয় না। মনঃসমীক্ষার দ্বারা মানুষের অন্তর্বিরোধের অবসান ঘটিয়ে সুষ্ঠুতর নতুন অভিযোজনের সন্ধান দেওয়া হয়। পঞ্চাশোর্দ্ধ ব্যক্তিদের পক্ষে নতুন অভিযোজন অসাধ্য বা হলেও কঠিন।

আশা আকাঙ্ক্ষা, কামতৃষ্ণা জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীযুক্ত। বার্দ্ধক্যে নিজের ব্যাপারে আশা করবার কিছু থাকে না। তাদের কামতৃষ্ণা সম্বন্ধেও দু-চার কথা বলা চলে। যৌন সামর্থ্য এদের বিশেষরূপে হ্রাস পায়। কাম ইচ্ছাও হ্রাস পায়। তবে একথা সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নয়।

মরণ কোন কোন মনে বড় হয়। বিষাদের একখণ্ড কালো মেঘ তাদের মনের এক কোণকে ঘিরে থাকে। কাম উত্তেজনার হ্রাস তাদের আরও বিষণ্ণ করে। যাদের মনে সহজ প্রশান্তি আছে—আবার যৌন উত্তেজনা তাদের মনকে কিছুটা বিক্ষুব্ধ করে।

বৃদ্ধেরা কিছুটা নিঃসঙ্গ। যারা অন্যদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চায় একা থাকতে হলে তারা নিঃসঙ্গ বোধ করে। নিঃসঙ্গতায়

একপ্রকার পীড়াদায়ক শূন্যতাবোধ থাকে। কিন্তু যে একা থাকতে ভালবাসে তার একা থাকার মধ্যে একটি পূর্ণতাবোধ আছে। তেমন একাকীত্ব বিষণ্ণ নয়, একটি পরিপূর্ণ মুহূর্ত। প্রকৃতিকে যারা ভালবাসে, গাছপালার সান্নিধ্য ও সাহচর্য যারা কামনা করে—প্রকৃতির মধ্যে থেকে তারা আনন্দ পায়। কিন্তু প্রেমপ্রকৃতি, মানুষের সঙ্গসাহচর্য ছাড়িয়ে যারা উপরে উঠে—মহাশূন্যের সঙ্গীত যাদের কানে পৌঁছয় তাদের জীবনে অমন ক্ষণ অপূর্ব মহিমা নিয়ে আসে। একে যদি বৈরাগ্যের সঙ্গে তুলনা করা যায় তবে বলব, ঐ বৈরাগ্য বিষাদক্লিষ্ট নয়, আনন্দের আলোকে উদ্ভাসিত।*

স্বেচ্ছায় একা থাকার অভ্যাস কিছুটা আয়ত্ত করা যায়। আকাশ দেখে, প্রকৃতির সান্নিধ্য লাভ করে নির্জন স্থানে বসে, এ মনোভাবে সুপ্রতিষ্ঠ হওয়া যায়। তবে ভিতরের তাগিদও অনেকখানি দরকার।

বেশী বয়সে ধর্ম মানুষের মনকে টানে। এমন বয়সে ঈশ্বরের নাম করা, জপ ধ্যান করা, দীক্ষা গ্রহণ করা স্বাভাবিক। মৃত্যুকে যারা নিকট মনে করছে, ইহকালে যাদের আর কিছু আশা করবার নেই তারা পরকালের চিন্তা করবে, ঈশ্বরে মন দেবে এতে আর আশ্চর্য কি আছে!

ভালবাসা চাওয়া মানুষের প্রকৃতি। শিশু মা-বাবার ভালোবাসা চায়—মা বাবা তাকে ভালোবাসেন। বড়রা ছোটদের ভালবাসবে এটাই স্বভাবের নিয়ম। ছোটরাও বড়দের ভালবাসে—সে ভালোবাসার মুখ্যতঃ স্বরূপ হচ্ছে 'ভালোবাসা চাওয়া'। ছোটরা বড়দের প্রয়োজনে বড়দের ভালবাসবে এটা সামান্যই আশা করা চলে। বৃদ্ধরাও ভালোবাসা চায়। কিন্তু সে চাওয়া কে পূরণ করবে! তাদের চেয়ে বয়সে বড় আর কে আছে! তাছাড়া যে আকর্ষণী শক্তি শিশুদের আছে বড়দের তেমন শক্তি

---

* বৈরাগ্যের স্বরূপ কি—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—বৈরাগ্য বিষাদক্লিষ্ট নয়, আনন্দে সমুজ্জ্বল। (শ্রী অরবিন্দের গীতাভাষ্য)

কোথায় ? বৃদ্ধদের দেখতে অনেকসময় অন্যদের ভালোও লাগেনা।

একথা স্মরণ রাখতে হবে মানুষের ভালোবাসা দেবার ক্ষমতা সীমিত। এই ভালোবাসার দ্বারা অনেকেরই মন ভরে না।

ঈশ্বরকে আমরা যেভাবে ভাবি—তাতে তাঁর দয়াও অসামান্য, দেবার ক্ষমতাও অপরিসীম। ঈশ্বরের উপর যাদের বিশ্বাস আছে ঈশ্বরের কাছেই তাঁরা ভালোবাসা চান। ঈশ্বরের প্রতি যাঁরা মন ন্যস্ত করতে পারেন, নিবিড়ভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন—ঈশ্বরের ভালোবাসা তারা পেয়েছেন, এমন অনির্বচনীয় অনুভূতি তাদের হয়।

বাইরের সবকিছু থেকে মনকে গুটিয়ে আনতে পারলে মনের কথা মানুষ শুনতে পায়, গভীরতর সত্যের উপলব্ধি তাদের ঘটে। বাইরের দরজা বন্ধ হলে ভিতরের দরজা খুলে যায়। আডলাবের একটি কথা উল্লেখ করি। একটি ছেলে দূরের জিনিষ ভালো দেখতে পেত না তাই তার বল খেলা আর হলনা। সে বই পড়াতে মনোনিবেশ করলো। এটা একদিক দিয়ে যেমন তার পশ্চাৎ অপসরণ অন্যদিক দিয়ে তার মহত্বর জগতে প্রবশের কাহিনী। বার্দ্ধক্যকে যারা ভালোভাবে গ্রহণ করতে পেরেছেন—বার্দ্ধক্যের মূল্যটি তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন।

ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ সম্বন্ধে আরেকটি কথা বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ঈশ্বরের কাছে চাওয়া পাওয়া সবই শৃঙ্খল—সীমার মধ্যে মনকে আটকে রাখে। এমন রুদ্ধশ্বাস বন্দীত্বের থেকে অসীমে মন মুক্তি পায় যখন তার আকাঙ্ক্ষা কেবলমাত্র ঈশ্বর দর্শন, তাঁর সান্নিধ্যলাভ।

ঈশ্বর অনুরাগের এক গভীর স্তরে মানুষ ঈশ্বরের কাছে আত্ম-নিবেদন করে—ঈশ্বরের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তার নিজের পৃথক অস্তিত্ববোধ আর থাকে না।

সংক্ষেপে জীবনের প্রতিস্তরে আনন্দের একটি প্রকৃতি ও ধারা আছে। শৈশবে শিশুর আনন্দ খেলায় ; যৌবনে প্রেমে ; মধ্য বয়সে,

কর্মে, বার্দ্ধক্যে আত্মস্থভাবের পূর্ণবিকাশে।

এই অধ্যায়টিতে আরেকটি কথা না বলে শেষ করলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

বার্দ্ধক্য বয়সের ধর্ম একথা সত্য। তবে দেহে বৃদ্ধ ও মনে বৃদ্ধ সর্বাংশে এক নয়। উৎসাহ উদ্দীপনা তারুণ্যের লক্ষণ বলে এমিল অভিমত প্রকাশ করেছেন। তরুণদের মধ্যে এটি সাধারণতঃ দেখা যায়, তবে একথাও সত্য সকলের বেলায় নয়।

তরুণদের মধ্যে হতাশায় ভুগছে, মন অবসাদক্লিষ্ট, আশা আর করেনা, আশা করবার সাহসও তারা হারিয়েছে তেমন জীবন বয়সে বৃদ্ধ না হলেও মনে বৃদ্ধ। তেমন কিছু বৃদ্ধ আছেন—যারা উৎসাহ উদ্দীপনায় ভরপুর, নতুন কিছু করব, এমন স্বপ্ন তারা দেখেন। মনের দিক থেকে বিচার করলে বেশ কিছুটা তারুণ্য তাদের আছে বৈকি!

শৈশবের আশা যৌবনে স্বাভাবিক নয়, যৌবনের আশা বার্দ্ধক্যেও স্বাভাবিক নয়। বয়সের প্রত্যেক স্তরেই আশা আকাঙ্খা বিভিন্ন ধরণের হবে এটাইত স্বাভাবিক। তবে এর মধ্যে কিছু কিছু আশা ও আগ্রহের কথা ভাবা যায়—যাদের একটা সার্বজনীন রূপ আছে। নিঃস্বার্থভাবে কারুর জন্য কিছু করা, মানুষেকে ভালোবাসার কথা ঐ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐ ভালোবাসা, অমন কল্যাণ প্রচেষ্টা কে কোনদিক দিয়ে করবে - সেটা ব্যক্তিবিশেষের সামর্থ্য প্রকৃতি ও প্রবণতার উপর নির্ভর করবে। সমাজহিতকরা কাজে কিছু কিছু বৃদ্ধ আত্মনিয়োগ করেন—এমনও আমরা জানি। শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক বার্দ্ধক্যেও সৃষ্টি করে চলেন—কথায় বলে তাদের মরবার সময় কোথায়!

লক্ষ্য, উদ্দেশ্যহীন জীবনে মৃত্যুর ছায়া নেমে আসে। অমন জীবন জরাগ্রস্ত। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যপূর্ণতায় যে জীবন সঞ্জীবিত তেমন জীবনই বহুলাংশে বেঁচে আছে।

একদিন সকলকেই মরতে হবে একথা সত্য। কিন্তু মরবার

আগেই যেন মানুষ না মরে, বসে বসে মৃত্যুর দিন গুনছে, মৃত্যুর দিকে মুখ করে বসে আছে এমন কেন হবে! এরই জন্য চাই—স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কাজ, নিজেকে অতিক্রম করে, নিজের অক্ষমতাকে ছাড়িয়ে—লক্ষ্য ও লক্ষ্যসাধনের প্রয়াস।

নাতিনাতনী পরিবেষ্টিত হয়ে থাকবার সুযোগ যাদের আছে, ছোটদের কাজে যারা লাগছেন—ছোটদের মধ্য দিয়েই তারা বাঁচছেন, শৈশবের স্বাদও তারা গ্রহণ করতে পারছেন।

পশুপাখী যাঁরা পোষেণ, তাদের যত্ন যারা করেন, তাদের ভালোবাসেন, তাদের ভালোবাসা যারা পান তারা ঐভাবে বেশ কিছুটা পরিপূর্ণতার স্বাদ পান।

ভালোবাসা মানুষ চায়—না পেলে মন ক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু ভালোবেসেই মানুষ নিজেকে অতিক্রম করে, মানুষ নিজের প্রকৃত মর্যাদা ফিরে পায়।

মানসিক রোগে বংশগতি ও পরিবেশ

১৯৮৮ সালে কলিকাতায় মানসিক রোগে বংশগতি সম্বন্ধে একটি ছোট অনুসন্ধান করা হয়েছিল* পিতামাতা মানসিক রোগী হলে তাদের ছেলেমেয়েরা কি পরিমান রোগাক্রান্ত হয়—তারই একটি হিসাব সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যেই অনুসন্ধানটি হয়েছিল।

মনোবিদ্যা বিভাগে প্রস্তুত একটি প্রশ্নাবলী আশিজন পিতা ও আশিজন মাতা ও তাদের একটি করে সন্তানের উপর প্রয়োগ করে দেখা হয়—এরা কি পরিমানে মানসিক রোগগ্রস্ত।* চারটি ভাগে—প্রত্যেকভাগে কুড়িজন পিতা ও কুড়িজন মাতা বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেকভাগে সন্তানদের কুড়িজনের মধ্যে কতজন সুস্থ-অসুস্থ তা দেখা হয়। নীচে একটি তালিকায় তা লিপিবদ্ধ করা হল :

: পিতামাতা ও সন্তানদের সুস্থ অসুস্থতা :

	পিতামাতা উভয়ই সুস্থ	পিতা সুস্থ মাতা অসুস্থ	মাতা সুস্থ পিতা অসুস্থ	পিতামাতা উভয়েই অসুস্থ	মোট পিতামাতা	
	২০ জন	২০ জন	২০ জন	২০ জন	৮০ জন	৮০ জন
সন্তান অসুস্থ	কেউ নয়			১৯ জন		
সন্তান সুস্থ	২০ জন			১ জন		

* সুদক্ষিণা ভট্টাচার্য।

উপরের তালিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে পিতামাতা উভয়েই অসুস্থ হলে তাদের ছেলেমেয়েরা প্রায় কেউই মনোরোগ থেকে নিস্তার পায় না। উভয় পিতামাতা যে সব ক্ষেত্রে সুস্থ—তাদের ছেলেমেয়েরা সুস্থ হবে এমন আশা করা যায়। পিতামাতার একজনও অসুস্থ হলে ছেলেমেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্য কিছু পরিমানে বিঘ্নিত হয়। পিতার রোগের চেয়ে মাতার রোগের প্রভাবই সন্তানদের উপর বেশী।

উপরোক্ত তথ্য থেকে মানসিক রোগ পুরোপুরি বংশগত এমন সিদ্ধান্ত কিন্তু করা চলে না। কথায় বলে বাবা মা যে বাড়িতে পাগল, সে বাড়ির গোটা পরিবেশটাই পাগল। অমন পরিবেশে যারা মানুষ হয় তাদের মানসিক স্বাস্থ্য বংশগতির দ্বারা ক্ষুণ্ণ হবে, পরিবেশের দ্বারাও খর্ব হবে। ছেলেমেয়েরা অসুস্থ হলে বংশগতি ও পরিবেশের কোনটার কতখানি ভূমিকা এটা নির্ধারণের জন্য আরও সুষ্ঠুতর অনুসন্ধান আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ মানসিক রোগ বিভিন্ন প্রকারের। সমস্ত মানসিক রোগ-লক্ষণকে মিলিয়ে মিশিয়ে একটি একীভূত বিচারে কোন মানসিক রোগের বংশগতি কতখানি এবং পরিবেশের প্রভাব কতখানি তা সঠিকরূপে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। সেজন্য দরকার মানসিক রোগসমূহের আলাদা আলাদা বিচার। ক্যালমান, স্লেটার* প্রমুখ মনোচিকিৎসকেরা ঐভাবে অনুসন্ধান করেছেন।

অনুসন্ধানের সঠিকতর পদ্ধতিতে তারা কাজটি করেছেন। তাদের অনুসন্ধানে নিম্নোক্ত নমুনা ছিল।

(১) একক বা অভিন্ন যমজ

(২) ভিন্ন যমজ

(৩) ভাইবোন

---

* (1) Kallman J—Genetics of Psychoses—Proceedes of First International Congress of Psychiaty Set in Paris, 1950.

(a) Slater E—Genetic Factors in Neuosis, General Psychiaty 1964.

(৪) পিতামাতা

(৫) অনাত্মীয় ব্যক্তি

একই ডিম্বকোষের সঙ্গে একই শুক্রকোষের মিলনে একটি অভিন্ন যমজের জন্ম। মাতৃগর্ভে ভ্রুণটি একটি ফুলের মধ্যেই বড় হয়। জন্মাবার পর দেখা যায় যমজ শিশু দুইটি একই লিঙ্গের, একই রকম তাদের চেহারা, বুদ্ধি একই রকমের, রুচিঅভিরুচি প্রায় একই ধরণের। অভিন্ন যমজদের বংশগতি এক। অভিন্ন যমজেরা সাধারণতঃ একই পিতৃগৃহে বড় হয়। অমন পরিবেশে সাদৃশ্য থাকলেও তা সম্পূর্ণরূপে কখনও এক হয় না। তাদের ক্ষেত্রে পিতমাতার ভালোবাসায় কিছু তারতম্য ঘটা আশ্চর্য নয়। যেসব লোকেদের সান্নিধ্যে তারা আসে তারা সবাই এক নয়। তারা যা কিছু দেখে, যা কিছু শেখে সেটাও নিশ্চয়ই সবটাই এক নয়। অতএব বলা যেতে পারে—তাদের পরিবেশে অনেক মিল আছে কিন্তু কখনও তা এক নয়। অমন যমজদ্বয় দুটি আলাদা গৃহে বড় হয়ছে—এমন কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বা শিশু নিয়েও অনুসন্ধান করা হয়েছে।

ভিন্ন যমজের একই সময়ে দুটি ডিম্বকোষের সঙ্গে দুটি শুক্রাণুর সংমিশ্রণে জন্ম। গর্ভাবস্থায় দুটি ভ্রুণ দুটি আলাদা ফুলে থাকে। জন্মাবার পর দেখা যায় কোন যমজ হয় বিভিন্ন লিঙ্গের, কোন কোন যমজ দুজনই একই লিঙ্গের। তাদের চেহারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ঠিক একরকম নয়। তাদের বুদ্ধি, রুচি অভিরুচির মধ্যে পার্থক্য থাকে। মোট কথা, দুটি সহোদরের মধ্যে যে মিল তাদের মধ্যেও তেমন দেখা যায়। দুটি সহোদরের বয়সের কিছু ব্যবধান থাকে। অন্ততঃ দেড় থেকে দুই বছরের বেশী। ভিন্ন যমজেরা জন্মায় একই সময়ে, একজনের পর আরেকজন। তাদের পরিবেশে মিল থাকলেও কিছুটা পার্থক্যও দেখা যায়।

ভিন্ন যমজ বা ভাইবোনেরা যেহেতু একই পিতামাতার সন্তান তাদের বংশগতির অনেকটা একই রকমের। অনাত্মীয় দুটি লোকের বংশগতির

মধ্যে কোন মিল থাকবার কথা নয়। পরিবেশও তাদের বহুলাংশে অন্যরকমের।

ক্যালম্যান, স্লেটার প্রমুখ মনোচিকিৎসকেরা অনুসন্ধানের ফলে যা পেয়েছেন—নীচে তা উল্লেখ করা হল*

উন্মাদরোগে—বিশেষতঃ সিজোফ্রেনিয়া এবং আবর্ত্তিত খেদোন্মও রোগে বংশগতির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। নিউরসিস বা উদ্বায়ু রোগে পরিবেশের প্রভাবই বড়। বাতিকরোগে বংশগতির প্রভাবটা অবশ্য কিছু বেশী। বাতিকগ্রস্ত লোকেদের আত্মীয়দের কারুর কারুর মধ্যে অমন জাতীয় রোগ দেখা যায়।

কোন কোন পরিবারের অধিকাংশই বিষাদক্লিষ্ট। যে ক্রোমোজম বা জিনের ফলে বিষাদ রোগের উদ্ভব—সেটা হল প্রকট জিন। খেদোন্মত্ত রোগীদের পিতামাতাদের একদশমাংশ অমন রোগে রোগী।

সিজোফ্রোনিয়া রোগাক্রান্ত লোকদের আত্মীয়স্বজনেরাও কেউ কেউ ঐ রোগে আক্রান্ত হন। তবে যে জিনটিকে ঐ রোগের কারণ বলে মনে করা হয়—সেটা অপ্রকট (Recessive) জিন। ঐ রোগে যেসব আত্মীয়স্বজনরা রোগাক্রান্ত হননা তারাও কিন্তু ঐ রোগের জীবাণু বহন করে।

ক্যালমানের অনুসন্ধানেই ফলাফলটি একটি তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হল।

উপরোক্ত সারণী থেকে এটি বোঝা যায় পিতামাতার রোগ থাকলেই সন্তান সন্ততিরা রোগাক্রান্ত হবে—এমন কথা জোর করে বলা যায়না। তবে বংশধরদের কারুর কারুর মধ্যে ঐ রোগ একদিন আত্মপ্রকাশ করবে —এমন যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু অভিন্ন যমজদের বেলায় বলা যায় যে, যে মিলিত কোষাণু থেকে শিশুদের জন্ম—ব্যাধির বীজ তাতে থাকলে উভয়ই অসুস্থ হবে একথা প্রায় নিশ্চিতই।

* Kallman—Ibid

শতকরা কতজন

	সংখ্যা	ভাইবোন	ভিন্ন যমজ	অভিন্ন যমজ	পিতামাতা	সন্তান	জিনের সংখ্যা ও প্রকৃতি
সিজোফ্রেনিয়া	৫৮০৪ (যমজ—৯৫০)	১৪·৩%	১৪·৫%	৮৬·২%	৯·৩%	১৬·৪%	এক অপ্রকাশিত (recessive)
খেদোন্মত্ত রোগ	৪৬১ (যমজ—৮২)	২৩·০০%	২৬·৩%	৯৫·৭%	২৪·৪%		এক অপ্রকাশিত (dominant)
আত্মহত্যা	যমজ ২৮		০·০%	৫·১%			কোন কিছু নেই
ক্ষয়রোগ	২৪৬০ (যমজ—২৮)	২৫·৫%	২৫·৬%	৮৭·৩%	১৬·৯%		
জরাগ্রস্তদের মনোরোগ	৪৭৯ (যমজ—১০৮)	৬·৫%	৮·০০%	৪২·৮%	৩·৪%		কিছুটা বংশগতি কিছুটা পরিবেশ

অনুসন্ধানে নিউরসিস সম্বন্ধে স্লেটার যা পেয়েছেন তার থেকে বলা যায় ঐ রোগে বংশগতির চেয়ে পরিবেশের প্রভাবই বেশী। প্রধানতঃ পরিবেশের চাপের ফলেই নিউরসিসের উদ্ভব হয়। মৃগীরোগ বংশগত* —এর স্বপক্ষে বিশেষ কোন তথ্য আজও পাওয়া যায়নি।

বিবাহ ও সন্তান জন্ম দেওয়ার ব্যাপারে পরামর্শের জন্য কিছু কিছু নরনারী ও তাদের অভিভাবকেরা ডাক্তার ও মনোবিদদের কাছে আসেন। অমন পরামর্শ দেবার সময় ডাক্তার ও মনোবিদদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। মনে রাখা দরকার ঐ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান আজও খুবই সীমিত।

উদ্বিগ্ন মন নিয়েই যুবকযুবতী ও তাদের অভিভাবকেরা পরামর্শের জন্য আসেন। জীবনের একটি প্রধান আশ্রম—বিবাহ ও গাহর্স্থ্য জীবন। যথাসম্ভব নিরুদ্বিগ্নচিত্তে নরনারী যাতে ঐ আশ্রমে প্রবেশ করতে পারে সেটা দেখা দরকার। আত্মীয়স্বজনদের বেশীর ভাগই যদি রোগাক্রান্ত হন সন্তান জন্ম দেবার ব্যাপারে সংযত হওয়াই বিধেয়। সন্তান অমন সব ক্ষেত্রে না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বিবাহ ব্যাপারে দেখা দরকার যে, একজন রোগী হলেও অপরজন যেন রোগী না হয়। দু'জন রোগীর বিবাহ সুখকর হয় না। সন্তান জন্মালেও তার অসুস্থ হবার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে। বিবাহ সুখ থেকে কেউ বঞ্চিত হউক এমন কথা বলার কোন কারণ নেই। তবে রুগ্ন অবস্থায় বিবাহের কোন প্রশ্নই ওঠেনা। খেদোন্মত্ত রোগী একবার ভালো হয়েছে তার কি বিবাহ করা উচিত? ঐ রোগ কিছু ক্ষেত্রে ফিরে আসে। অমন রোগের কথা লুকিয়ে রেখে বিবাহ করা একান্ত অন্যায়। তবে পরস্পর নিজেদের ভালোবাসলে, সব জেনে শুনেও যদি কেউ বিবাহ করে তবে সকলের শুভেচ্ছা যেন তারা পায় সেটাই দেখতে হবে। একদা যে রোগী সে আবারও রোগী হবে একথা অনিবার্যরূপে সত্য নয়।

* **Dawron & Anderson Aids to Psychialy.**

বিবাহ করলে রোগ সেরে যায় অভিভাবকদের মধ্যে এমন একটা ধারণা কিছুটা প্রচলিত আছে। বিবাহ, রোগীদের রোগ নিরাময়ে সহায়তা করে, আবার রোগ বৃদ্ধির কারণও হয়। তবে রোগ নিবৃত্তির অমন চমৎকার পদ্ধতিতে আরেকজনকে যে যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হবে সেটা কি ভেবে দেখা উচিত নয়? অমন নিষ্ঠুর বর্বরোচিত পন্থায় মানুষের কোন বিতর্কমূলক কল্যাণের চেষ্টা অন্যায় ও অসঙ্গত।

মানসিক রোগের কারণ

মনোরোগের উদ্ভব হয় প্রধানতঃ দুই জাতীয় ত্রুটী থেকে—

১) বিকাশজনিত

২) মানসিক ক্রিয়াজনিত

বিকাশজনিত ত্রুটী

আবেগ ও যৌনজীবনের স্বাভাবিক বিকাশ নিয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। স্বাভাবিক বিকাশ সময় সময় রুদ্ধ হয়—আংশিক বা পূর্ণ। আকাঙ্ক্ষার সংবন্ধন ঘটে। আংশিক সংবন্ধন ও বহির্জীবনের বাধার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যাবৃত্তি ঘটে। কোন স্তরে যৌনবিকাশের ত্রুটী ও অসম্পূর্ণতার দ্বারাই মানসিক ব্যাধির রূপ বহুলাংশে নিরূপিত হয়।

দেখা গেছে মানসিক রোগগ্রস্তরা আবেগজীবনে শিশু থাকে—সহজ সুন্দর শিশু নয়, শৈশবের বিকার গ্রস্ত রূপ। ভ্রমবাতুলতা বা প্যারানোইয়া রোগীদের দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করা যাক। ঐ সব রোগীদের কামবিকাশ সমকামের স্তরে বহুলাংশে রুদ্ধ হয়। কৈশোরে প্রধানতঃ কামের যে রূপ। প্যারানোইয়া রোগীরা সব সময়ে আচরণে না হলেও গভীর মনে সমকামী। সচেতন মন ঐ ইচ্ছাকে স্বীকার করে নিতে পারেনা। অস্বীকৃত, অবদমিত ইচ্ছা মনের নির্জ্ঞানে আশ্রয় নেয়। অবদমিত ইচ্ছার রূপটি "ঐ ব্যক্তির প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করছি। ও এসে আমার সঙ্গে কাম আচরণে লিপ্ত হউক"। ঐ অবদমিত ইচ্ছাটি সচেতন মনে ফিরে আসে অন্যরূপ নিয়ে। ঐ লোকটির 'আমার প্রতি আক্রমণাত্মক অভিসন্ধি আছে'। পুরুষের যৌনপ্রেরণা আক্রমণ এমনও মানুষ ভাবে*।

* কিছু কিছু পুরুষ বলপ্রয়োগ করে নারীকে ধর্ষণ করেছে, খুন করেছে—এমন ঘটনাও শোনা যায়।

সিজোফ্রেনিয়া রোগের বহু লক্ষণের উৎস আত্মকাম—একান্ত শৈশবে কামের বিকাশ যে স্তরে থাকে।

রূপান্তরিত হিষ্টিরিয়া কিন্তু কামবিকাশের খুব আগের কোন স্তর থেকে আরম্ভ হয়না। বিপরীত কামের স্তরেই তাদের মন পৌঁছে যায় কিন্তু কামকে সহজ ভাবে গ্রহণ করা তাদের পক্ষে কিছুটা কঠিন। অবরুদ্ধ কিছুটা অবদমিত কামনাবাসনা রোগের লক্ষণে প্রকাশিত হয়।

বাতিকরোগে অধিঅহমের ভূমিকাটি বড়। অধিঅহম গঠনে ক্রোধের—বিশেষতঃ আত্মবিরোধী ক্রোধের একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করে।

এবারে উল্লেখের প্রয়োজন যে কেবলমাত্র বিকাশের অসম্পূর্ণতার জন্য রোগ সৃষ্টি হয়না। রোগ সৃষ্টিতে মানসিক ক্রিয়ারও একটি গুরুত্ব-পূর্ণ অংশ আছে।

সমকামে মন আবদ্ধ থাকলে, মন সমকামী হবে—তার আচরণও বহুক্ষেত্রে তা প্রকাশিত হবে। একে বলা হয় কামবিকৃতি। কিন্তু কামবিকৃতি রোগ নয়। প্যারানোইয়া রোগগ্রস্তদের অবদমিত সমকাম ইচ্ছা সচেতন মনে ফিরে আসে রোগলক্ষণ রূপে রোগীদের কেউ আক্রমণ করবে—এমন আশঙ্কা, তাদের বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র অনেকক্ষেত্রে আক্রমণটা হবে তাদের পিছন থেকে ইত্যাদি।*

যে মানসিক সক্রিয়তার ফলে কামবিকৃতি রোগলক্ষণের রূপ নেয়—সেগুলি হল :

১) অন্তর্দ্বন্দ্ব

২) ইচ্ছার অস্বীকৃতি ও অবদমন

৩) অবদমিত ইচ্ছার সচেতন মনে প্রত্যাবর্ত্তন।

প্রত্যাগত ইচ্ছাটি অবশ্য অন্যরূপ নিয়ে সচেতন মনে প্রবেশ করে, মন ও আচরণকে প্রভাবিত করে।

---

* পায়ুকামের রূপান্তরিত রূপ।

মানুষের মনে কত রকম ইচ্ছারই না উদয় হয়। এর মধ্যে বিপরীত মুখী ইচ্ছাযুগলের সংখ্যাও কম নয়। একই ব্যক্তিকে আশ্রয় করে দুটি বিপরীত মনোভাব প্রায়ই মানুষ একই সময় পোষণ করে। লোকটি ভালো—লোকটি মন্দ, ওকে আমি পছন্দ করি—ওকে আমি পছন্দ করিনা। যে বস্তুর প্রতি আমাদের ভালোবাসা তার প্রতি আমাদের ঘৃণাও আছে। যে মানুষ একই সঙ্গে ভাবে ওকে আমি খুব পছন্দ করি, ওকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনা—সে মানুষের মন অস্থির, অশান্ত।

বৈপরীত্য তীব্র হলে মাঝে মাঝে মনের দুটি ইচ্ছার মধ্যে বিরোধ সংঘাতের রূপ নেয়। মনের অন্তর্দ্বন্দ্বে তা প্রকাশ পায়।

কোনো আচরণে প্রবৃত্ত হতে খুব ইচ্ছা করছে, কিন্তু মনের আরেকটি অংশ বলছে "না, ক'রনা"। ইদমের অন্ধ কামনায় মন তাড়িত হয়, কিন্তু অধিঅহমের অনুশাসনে ঐ কামনা চরিতার্থ করা থেকে মন বিরত থাকে। সময় সময় অমন কামনাবাসনার উদয় হচ্ছে ভাবতেও মন লজ্জিত বোধ করে—ঐ কামনা বাসনা সচেতন মন থেকে বিতাড়িত হয়, অবদমিত হয়।

ইচ্ছা সক্রিয় শক্তির আধার। অবদমিত ইচ্ছা আত্মপ্রকাশের জন্য দুটি পথ গ্রহণ করে। পরিতৃপ্তি তার চাই। কামের কোন একটি স্তরে পরিতৃপ্তির বাধা। কামনার পূর্বেকার কোন স্তরে পরিতৃপ্তি পাওয়া যায় কিনা মন তাই খোঁজে। বিপরীত কামে বাধা, তাহলে সমকামে মন ফেরানো যাক। যৌনশক্তি আত্মপ্রকাশের রূপটি বিভিন্ন হলেও সম্ভবতঃ মূলতঃ একটি যৌনশক্তিরই তারা প্রকাশ।

কোনো স্তরে কাম বাধাপ্রাপ্ত হল। নির্জ্ঞান ইচ্ছা তখন ছদ্মবেশ ধারণ করে। ছদ্মবেশে সচেতনে তার প্রত্যাবর্তন ঘটে, রোগলক্ষণ তারি প্রকাশ। কারুর প্রতি অবদমিত মৃত্যু ইচ্ছা সচেতন মনে রূপ নেয়

লোকটি মারা গেছে বা শীঘ্রই মারা যাবে এমন আশঙ্কা এমন কি ভ্রান্ত বিশ্বাস।

নির্জ্জান ইচ্ছা ছদ্মবেশে সচেতন মনে প্রবেশের পথ করে নেয়। অমন ছদ্মবেশধারণের একটি পদ্ধতি আছে। দুটি বিবাদমান ইচ্ছা আছে বলেই একটি ইচ্ছাকে অবদমিত হতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ ইচ্ছা-দুটির উৎস হল—এক, ইদম, অপরটি অধিঅহম। এক, অন্ধপ্রবৃত্তির তাড়না, অপরটি বিবেকের অনুশাসন। উদ্বায়ুরোগে যে ইচ্ছাটি সাধারণতঃ অবদমিত হয় সেটি কাম বা কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রোধও। সচেতন মনে ঐ ইচ্ছা ফিরে আসে অধিঅহমের ছাপ নিয়ে। এমন রোগ লক্ষণকে ফ্রয়েড দুটি বিরোধী শক্তির আপোষে গঠিত বলে আখ্যায়িত করেছেন। দৃষ্টান্ত—ছেলের সম্বন্ধে মায়ের অত্যধিক উৎকণ্ঠা। "ছেলের সর্দি হয়েছে, এটা নিমোনিয়ার পূর্ব লক্ষণ, ও মারা যাবে নাতো!" ছেলে খেলার মাঠ থেকে ফিরতে একটু দেরী করছে—"নিশ্চয়ই ও কোন মারাত্মক দুর্ঘটনায় পড়েছে।" ছেলেকে নিয়ে মায়ের দিবারাত্র উৎকণ্ঠা—আর সেই উৎকণ্ঠার মাত্রারও কোন অবধি নেই, উৎকণ্ঠায় তিনি ছটফট করতেন। অনুসন্ধান করে দেখা গেল—মা সন্তান চাননি। যতদিন তার সন্তান ছিল না ঝাড়া হাত পায়ে, আমোদ আহ্লাদে সময় কাটতো। ছেলে জন্মালো এক বন্ধন রূপে। কিন্তু ছেলে হবার পর তার প্রতি একটা স্বাভাবিক মমতা জন্মালো। ব্যাপারটা দাঁড়ালো—মা ছেলের মঙ্গল চানও, আবার ছেলের অপসারণ, মৃত্যুও কামনা করেন। ছেলের প্রতি মায়ের ভালোবাসা, কিছু কর্তব্যবোধ—এসবের দরুন ছেলের প্রতি মায়ের বৈরী ইচ্ছা নির্জ্জানে দমিত হল। ঐ বৈরী ইচ্ছা সচেতন মনে ফিরে এল ছেলের সম্বন্ধে মায়ের অপরিসীম উৎকণ্ঠার রূপ নিয়ে। সচেতন মনে তার প্রকাশ—আমি ছেলের মৃত্যু চাইনা, আমি ছেলের ভাল চাই (বিবেককে চোখ ঠারা)-কিন্তু তথাপি ছেলের

বিপদ হবে, ছেলের মৃত্যু হবে। আরেকটি উদাহরন শৈশবে শিশুরা গু ঘাঁটে। মা বাবা তাকে বলেন—"গু ধরতে হয় না, গু ঘেন্না করতে হয়"। কিছু কিছু বড়দের নির্জ্ঞানে কিন্তু গু ঘাটার একটি প্রবল ইচ্ছা থেকে যায়। সচেতন মনে দেখা যায় গু'র প্রতি তাদেরই তীব্র ঘৃণা। সচেতন মনে অধিঅহমের বাড়াবাড়ি অনুশাসন, অন্তরে প্রবল ইদম। মানসিক রোগে দুটি বিপরীত ইচ্ছার এইভাবে অবাঞ্ছিত আপোষ ঘটে।

আকস্মিক প্রবল আবেগে, ত্রাসে* মন বিপর্যস্ত হয়। এটা ঘটে বিশেষতঃ শৈশবে। অমন অভিজ্ঞতাকে মানুষ পরিপাক করতে পারেনা। অভিজ্ঞতার স্মৃতিটি নির্জ্ঞানে নির্বাসিত হয়। যতক্ষণ অভিজ্ঞতায় সেই স্মৃতিটির সচেতন মনে পুনর্বাসন না হচ্ছে, পরিণত বয়সে অমন আবেগের পুনরাবৃত্তি না হচ্ছে—ততক্ষণ ঐ বিস্মৃত স্মৃতি নানা প্রকার মানসিক রোগ লক্ষণের কারণ হয়। যুদ্ধের সময় দেখা গেল কোন একটি সৈন্য ট্রেঞ্চে থাকতে হলে ভয়ে ত্রাসে সে উন্মাদ প্রায় হত। সৈনিকটির আধোঘুমে আধোজাগরণে কথা থেকে তার শৈশবের এক বিস্মৃত ঘটনা উদ্ধার করা গেল।** অন্ধগলিতে একটি বাড়ীতে একদিন সে যাচ্ছিল। বাড়ীর সামনেই দাঁড়িয়েছিল এক বিশালাকায় কুকুর। ছেলেটিকে দেখা মাত্র সে হাউ হাউ করে গর্জন করে উঠলো। ছেলেটি ত্রাসে গলির মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। সংজ্ঞা ফিরে আসবার পর দেখা গেল ঐ ঘটনাটি সে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছে। পরবর্ত্তী কালে যুদ্ধে যখন ট্রেঞ্চে তাকে আশ্রয় নিতে হল ঐ বিস্মৃত স্মৃতি তার মনে দুর্বোধ্য ভয় রূপে ফিরে এল। সেই ভয় ভীষণ যার উপরে মনের কোন কর্ত্তৃত্ব নেই।

মানসিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক রোগ অধ্যায়ে প্রসঙ্গত মানসিক রোগের কারণ সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু উল্লেখ করেছি।

---

* ইংরাজীতে একে বলে Trauma (ট্রমা)

** W. H. Rivers

সর্বশেষে উল্লেখ্য মানসিক রোগের প্রধান কারণটি শৈশবে তাদের প্রতি পিতামাতার আচরণ, পিতামাতা নিজেদের পারস্পরিক সম্বন্ধ, পিতামাতার নিজস্ব মানসিক স্থৈর্য ও স্বাস্থ্য। স্নেহবঞ্চিত, উৎপীড়িত শিশু, যে গৃহ ভেঙ্গে গেছে, পিতামাতার মধ্যে যে গৃহে নিয়ত কলহ, অস্থিরচিত্ত, অসুস্থ পিতামাতা—সে সব শিশুদের মানসিক সুখ ও স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হবে—তাতে আর আশ্চর্য কি আছে। শিশুর মানসিক রোগ ও অসমঞ্জস আচরণ অধ্যায়ে এর দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে।

মানসিক রোগ নিরাময়

এবার আমরা মানসিক রোগ নিরাময় নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করব। মানসিক রোগ লক্ষণের মূল কারণটি যেখানে দৈহিক, দেহযন্ত্রে কোন ত্রুটি, স্নায়ুতন্ত্রে জীবানুর আক্রমণ সেখানে চিকিৎসার পদ্ধতিটি মুখ্যতঃ জৈব-রাসায়নিক। ওষুধপত্র দিয়েই রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করতে হয়। কিছুকাল যাবৎ শক-থেরাপিরও কিছু প্রচলন হয়েছে—ইলেকট্রিক শক ও ইন্সুলিন শক। মৃগী রোগের জন্য গার্ডিনাল জাতীয় ওষুধই সাধারণতঃ চলে।

উন্মাদ রোগকে বর্ত্তমানে কার্মিক বা মনোভিত্তিকই বলা হয়। ঐ সব রোগেও জৈব রাসয়নিক চিকিৎসা আবশ্যক—ক্ষেত্র বিশেষে শকও। তবে ঐ সব রোগে, বিশেষতঃ কোন একটি স্তরে মানসিক চিকিৎসাও বিশেষ সহায়তা করে। সিজোফ্রেনিয়া রোগের কথাই ধরা যাক। সিজোফ্রেনিয়া রোগের দুটি দিক আছে—একটি রোগলক্ষণ ও অপরটি রোগীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। রোগলক্ষণ দূর করবার জন্য ব্যবহৃত হয় প্রধানতঃ প্রচলিত চিকিৎসা—ওষুধপত্র দেওয়া, দরকার মত শকও। রোগলক্ষণ নিরাময়ে মনসমীক্ষার কিছু ভূমিকা আছে। সিজোফ্রেনিক চরিত্র সংশোধনের জন্য, কোন কোন ক্ষেত্রে রোগলক্ষণের উপশমের জন্যও মনঃসমীক্ষার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

উন্মাদরোগ চিকিৎসায় প্রধানতঃ ওষুধপত্রের ব্যবহার করা হয়। পূর্বে ঐ রোগ চিকিৎসায় মনঃসমীক্ষা বা সাইকোথেরাপির কথা কেউ ভাবতেন না। আধুনাকালে মানসিক চিকিৎসার দরকার ভাবা হয়। মানসিক চিকিৎসার দ্বারা রোগী উপকৃত হয়।

মানসিক চিকিৎসার জন্য যে সব পদ্ধতি চলছে—তার মধ্যে মনঃসমীক্ষার স্থান সর্বোচ্চ। মনঃসমীক্ষার প্রবর্ত্তক ভিয়েনার ডাক্তার সিগমুণ্ড ফ্রয়েড। মানসিক রোগ নিরাময়ে প্রথম থেকেই ওঁর ঝোঁক ছিল। প্রথমে কিছুদিন তিনি সম্মোহনের সাহায্যে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করেন। ওর দ্বারা রোগলক্ষণ সাময়িকভাবে দূর হলেও, ঐ রোগ কিম্বা ঐ জাতীয় কোন রোগের পুনরাবির্ভাব হয়। একজন রোগিনী চিকিৎসার জন্য এল। তার অসুবিধা হচ্ছে—তার কানযন্ত্রে কোন গোলমাল নেই তবুও সে কানে শুনতে পাচ্ছে না। ফ্রয়েডের প্রশ্ন কেন এমন হয়, কেন মহিলাটি কানে শুনতে পারছেন না! উদ্ধার করা হল—রোগিণী নিজেই চাইছেন না কথা শুনতে। তার এই না চাওয়ার ইচ্ছা, তার নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়, ক্ষেত্রবিশেষে নির্জ্ঞান। অমন নির্জ্ঞান ইচ্ছাকে উদ্ধার করে সচেতন মনের দরবারে হাজির করলেই রোগের উপশম হবে—ফ্রয়েডের প্রথমদিকে এরকম ধারণা ছিল। পরে তিনি নিজেই দেখতে পেলেন যে, ধারণাটি সম্পূর্ণ ঠিক নয়। কোন বিরুদ্ধ ইচ্ছার সক্রিয়তার জন্যই অমন অবদমন ঘটে। অবদমনকারক ইচ্ছাটিকে পঙ্গু ও অক্ষম করতে পারলেই রোগ নিরাময় সুষ্ঠু হবে, স্থায়ী হবে আশা করা যায়। ঐ অবদমনকারক ইচ্ছাটির স্বরূপ কি এটা জানাই চিকিৎসার জন্য সর্বাগ্রে দরকার। এরই জন্য ফ্রয়েড "মুক্ত-অনুসঙ্গ" পদ্ধতিটি আবিষ্কার করলেন। রোগী বা রোগিনী একা কৌচে শুয়ে আর তার কাছাকাছি ডাক্তার বসে থাকেন। ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ, কিছুটা অন্ধকারও। রোগী বা রোগিনীকে বলা হল "চোখ বন্ধ কর। তারপর তোমার যা মুখে আসে বলে যাও। যতক্ষণ আমি তোমায় থামতে না বলছি, ততক্ষণ থামবে না।" ডাক্তার একথাও ওকে বলে দেন যে, "তুমি যা বলবে, সেকথা আমি কাউকে বলবনা। আর তুমিও কোন কথা গোপন করবার চেষ্টা না করে বলে যাবে।" মুক্ত অনুসঙ্গের এই শর্তটি রোগী বা রোগিণী মানতে রাজী হলেই মনঃসমীক্ষার দ্বারা মানসিক চিকিৎসা সম্ভব। রোগী বা রোগিণীর

হয়ত অনেকরকম গর্হিত কথা মনে আসবে—তা আসুক! সব তারা বলবে। এটা ঠিকই—ঐ শর্তে রাজী হয়ে চিকিৎসায় এলেও গোড়াতে রোগী বা রোগিণী সব কথা বলতে পারেনা, বলতে তাদের অসুবিধা হয়।

ধীরে ধীরে ডাক্তারের উপর তাদের আস্থা বাড়ে, ওর কাছে সব কথা বলে রোগী বা রোগিণী স্বস্তি পায়। নিজের সব কথা বলা—সচেতন মনের কথা, নির্জ্ঞানের কথা মন দিয়ে কেউ শুনবে, সমালোচনার দৃষ্টিতে আমাকে বিচার করবে না—এ জগতে এমন লোকের জন্য মানুষ মাথা খুঁড়ে মরে। যে জগতে আমাদের বাস সেখানে বলতে চায় সবাই, শোনবার প্রায় কেউ নেই। মনটা একেবারে চাপা পড়ে গেছে—এমন লোক ছাড়া অধিকাংশ লোকই কথা বলে মনকে ভারমুক্ত করবার সুযোগ পেলে বর্তে যায়।

গোড়ার দিকে ফ্রয়েড রোগীদের রোগলক্ষণের* উপর মনোনিবেশ করতে বলতেন। বলা হত—"ঐ রোগ বা তার কোন অংশবিশেষ সম্বন্ধে তোমার কি মনে আসে বলো"। পরে উনি দেখলেন ঐ ধরণটা ডাক্তার ও রোগী উভয়েয় পক্ষেই কষ্টসাধ্য। সব সময়ে ঐ সম্বন্ধে বলতে গেলে খুব বেশী কথা মনে আসে না। এর চেয়ে রোগীর মনকে একেবারে ছেড়ে দেওয়াই ভালো—যা তার মনে, মুখে আসুক সে বলুক। সব কথাই কোন না কোনভাবে রোগের সঙ্গে জড়িত এমন পাওয়া গেছে।

রোগী যখন দেখে ডাক্তার তার সব কথাই শুনছেন—কোন সমালোচনা করছেন না—কেন অমন রোগী বলছে দরকারে তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিচ্ছেন—তখন ডাক্তারের উপর তার বিশ্বাস বাড়ে, নির্ভরতা বাড়ে। রোগী মনে মনে কিছুটা শিশু হয়ে যায়—ডাক্তারের মধ্যে দেখতে পায় নিজের পিতামাতাকে। পিতামাতার প্রতি স্বীয় বিশ্বাস, ভালোবাসা ও ভক্তি সে ন্যস্ত করে ডাক্তারের উপর। ডাক্তারের প্রতি

* এতদ্বারা রোগী ও রোগিণী উভয়কেই বোঝাবে।

তার যে এ ভালোবাসা ও আস্থা—তা হল পাত্রান্তরিত ভালোবাসা ও আস্থা।

বিশ্বাস ও ভালোবাসার প্রেরণায় রোগী ডাক্তারের কাছে ক্রমশই সম্পূর্ণ নিজেকে মেলে ধরে। তার নিরুদ্ধ কামনাবাসনা, তার অবদমিত ইচ্ছা সচেতন মনের দুয়ারে এসে হাজির হয়। এমন সব কথা মনে আসে যে একটি রোগী আপনা থেকেই বলে উঠল—"এমন কথাত জীবনে কখনও মনে আসেনি"। ঠিকই, ঐসব চিন্তাভাবনা ছিল সচেতন মনের বিস্মৃতির আড়ালে, মনের নির্জ্ঞানে। নির্জ্ঞান ইচ্ছাই প্রধানতঃ রোগের মূল কারণ। ঐসব ইচ্ছা—যা অবদমিত এবং যা অবদমনকারক, তাদের সচেতন মনে নিয়ে এসে পরিণত বাস্তববোধের সাহায্যে তাদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিলে— মানসিক রোগ নিরাময় হয়।

নির্জ্ঞান মনে এমন ঘটনার স্মৃতি আছে—যা সব প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কথা বলতে শেখার আগেওত শিশুজীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে—তার ছবি শিশুর মনে থাকে, ঐ ঘটনার প্রতি শিশুর আচরণ, তার আচরনেই সঞ্জীবিত থাকেযে সব ঘটনার স্মৃতি মনঃসমীক্ষার দ্বারা উদ্ধারের জন্য—মনঃসমীক্ষক রোগীর অচরণের দিকে দৃষ্টি দেন। ডাক্তারের ব্যাখায় রোগী অবদমিত আচরণের অর্থ সম্বন্ধে সচেতন হয়—রোগীর রোগনিরাময়ে তা সহায়তা করে।

পিতামাতার প্রতি কারুর মনোভাব কেবলমাত্র বিশ্বাস ও ভালো-বাসার দ্বারাই গঠিত নয়। পিতামাতার প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা তার মধ্যে আছে—কম বা বেশী। তবে এসব মনোভাব অনেকটাই অবদমিত। মনসমীক্ষক যখন রোগীর চক্ষে পিতামাতার প্রতিভূ হয়ে দাঁড়ান—মনঃসমীক্ষার একটি স্তরে মনঃসমীক্ষকের প্রতি নেতিমূলক মনোভাব ও আচরণ লক্ষ্য করা যায়।

মনঃসমীক্ষায় মনঃসমীক্ষক রোগীর কাছে পাথরের শিলার মত বসে থাকেন। রোগী কখনও তাকে মাথায় তুলছে, কখনও তাকে ছুঁড়ে

ফেলে দেবার চেষ্টা করছে। মনঃসমীক্ষক প্রত্যুত্তরে কোন মনোভাবই প্রকাশ করেন না। শুধু বারম্বার রোগীকে বুঝিয়ে বলেন—রোগীর অমন মনোভাব তার প্রতি নয়, মূলতঃ তার পিতামাতার প্রতি, মনঃসমীক্ষক প্রতিভূমাত্র। অমন মনোভাব কেন, তার অর্থ কি তাও ব্যাখ্যা করেন।

মনঃসমীক্ষকের প্রতি অস্তিমূলক মনোভাব চিকিৎসার সহায়তা করে। নেতিমূলক ব্যবহারকে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে তাতেও উপকার পাওয়া যায়।

সংক্ষেপে মনঃসমীক্ষার দুটি অংশ। মুক্তঅনুসঙ্গ ও ঠিক সময়ে মনঃসমীক্ষকের দ্বারা ঐ অনুসঙ্গের ব্যাখ্যা। কেবলমাত্র ঐ ব্যাখ্যাতেই রোগ লক্ষণের উপশম হয় না। রোগী যখন তা নিজে বুঝতে পারল, আবেগ সহকারে গ্রহণ করতে পারল--তখনই সুফল ফলে। মুক্ত অনুসঙ্গ থেকে মনঃসমীক্ষক দুটি জিনিষ উদ্ধার করেন—(ক) অবরুদ্ধ কামনা বাসনা, পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও রোষ (খ) তৎসঙ্গে যে মানসিক শক্তির দ্বারা ঐ সব ক্রোধ ও কামনা অবদমিত হয়েছে—তার স্বরূপ। অবদমনকারকের অনেকখানি হচ্ছে অধিঅহম—যেটার বেশীর ভাগই নির্জ্ঞান।

মনঃসমীক্ষকের ব্যাখ্যায় তিনি দেখান শৈশবে গঠিত অধিঅহমের শাসন কতখানি বর্ত্তমান বাস্তবজীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। পরিণত জীবন ও মনোভাবের প্রয়োজনে রোগীকে পুরাতনকে নতুন করে বুঝতে হবে, ভাবতে হবে। রোগী এ সত্যকে যখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারে তখনই ঐ অধিঅহমের অতি প্রাচীন, বহুলাংশে অর্থহীন মনোভাব অনেকাংশে অক্ষম হয়। ফলে তার জাগ্রত বাস্তববোধ ও জ্ঞানের দ্বারা তার অবদমিত ইচ্ছা ও আবেগকে এবং অবদমনকারক শক্তির বর্ত্তমান জীবনের প্রয়োজনে সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়। শৈশবের মন সময় বিশেষে নিজের প্রবৃত্তি ও প্রেরণাকে ভয় করে, ভয় করে তাকে 'ভোলে'। কাম আচরণ দূষনীয়, কাম ইচ্ছা পর্যন্ত। সত্যই কি তাই? কোন

ক্ষেত্রে কেউ কাম আচরণে প্রবৃত্ত হবে কিনা সেটা আলাদা কথা। কিন্তু কাম ইচ্ছা মনে উদয় হলে তাকে স্বীকার করতে বাধা কেন হবে, আপত্তি কোথায় ? রাগত মানুষের হবেই, দুরন্ত রাগে মানুষ কত কি ভাবে—তা মনে এলে আসুক না। কিন্তু ক্রুদ্ধ আচরণ বশতঃ কারুর অনিষ্ট না করলেই হল। মোট কথা নিজের কাছে নিজেকে স্বচ্ছ ও সহজ হতে হবে মনঃসমীক্ষার এটাই বড় শিক্ষা।

মনঃসমীক্ষায় রোগীর প্রতি মনঃসমীক্ষকের কী আচরণ হবে—এটা কিছু পরিমানে বিতর্কিত বিষয়। ফ্রয়েড বলেছেন মনোভাব হবে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ। কিন্তু রোগীর কথা শুনবে, সময়মত তার ব্যাখ্যা দেবে—কিন্তু রোগীর প্রতি তার কোন আবেগ থাকবেনা, সদর্থক বা নেতিমূলক। মনঃসমীক্ষকের পছন্দ অপছন্দ কোনটাই প্রকাশিত হবেনা। এটা কতখানি বাঞ্ছনীয় কেউ কেউ এমন প্রশ্ন করেছেন। রোগীর প্রতি একটা গভীর শুভেচ্ছা মনঃসমীক্ষকের দরকার যাকে বলা যায় পিতৃমাতৃজনোচিত মনোভাব। রেইকের অন্ততঃ এই ধারণা। রোগীর মনঃসমীক্ষক ভালো চাইবেন, কেমন করে তাকে ভালো করে তোলা যায় তিনি ভাববেন।

বেশীরভাগ মানসিকরোগী চিকিৎসায় আসে দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হয়ে। তাদের রোগ কষ্ট দূর হবে কিনা কিছুটা বুঝলে, জানলে তারা খানিকটা আশ্বস্ত হয়। রোগীর উৎকণ্ঠা, অনিশ্চয়তা বোধের প্রাবল্য বুঝে রোগীকে কিছুটা "আশ্বস্ত" করবার দরকার আছে। বহু মনঃসমীক্ষকের এমন ধারণা* রোগকষ্ট নিবারণের জন্য চিকিৎসায় রোগীর দিক থেকে পূর্ণ সহযোগিতা ও প্রচেষ্টা দরকার এ কথাও মনঃসমীক্ষককে বলতে হবে।

মনঃসমীক্ষার দ্বারা রোগলক্ষণ দূর হয়, অন্ততঃ বহুলাংশে রোগ প্রাবল্য মন্দীভূত হয়। আরও বড় কথা মনঃসমীক্ষা সমস্ত মনকে নাড়া দেয়, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা অনেক কমে, বাস্তবজ্ঞান বাড়ে, অধিঅহমের মূঢ়

* Glover

শাসন থেকে মন অনেকখানি মুক্ত হয়, মানুষ অনেকখানি সুখী হয়।

মনঃসমীক্ষার জন্য সময় দরকার দুবছর এমনকি চার বছর বা তারও বেশী। মনঃসমীক্ষককে কি ফি দিতে হবে এটা স্থির করে প্রতিদিন মনঃসমীক্ষার শেষে তাকে ফি দিতে হয়। মনঃসমীক্ষা যদিও সময় সাপেক্ষ, এটি মানসিক চিকিৎসার সর্বোত্তম পন্থা*।

শিশু সমীক্ষা

ছোটরা মানসিক রোগাক্রান্ত হলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষার দ্বারা তারা উপকৃত হয়। তবে শিশু সমীক্ষার ধরণটির কিছু পরিবর্তন আবশ্যক। পাঁচ বছরের ছেলেদের মুক্ত অনুসঙ্গ দিতে বলার কোন অর্থই হয় না। বড়রা কথা বলতে ভালবাসে। বেশীরভাগ অবসরের সময় তারা কথা বলে। চিত্তবিনোদনে কথা বলার সুযোগ বড় সুযোগ—উপযুক্ত শ্রোতা পেলেত কথাই নেই। ছোটরা ভালবাসে খেলতে। সুযোগ পেলেই তারা খেলে—খেলার মধ্য দিয়েই নিজের মনোভাব, চিন্তা ও আবেগ প্রকাশ করে। বড়দের বেলায় কথা বলা যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, ছোটদের বেলায় খেলা। শিশু সমীক্ষা খেলার মাধ্যমেই করাটা রেওয়াজ।

শিশু সমীক্ষায় শিশুসমীক্ষক একটি ঘর সাজিয়ে রাখেন চিত্তাকর্ষক খেলার নানান সাজসরঞ্জাম দিয়ে। শিশু এসে সেখানে বসে খেলা করে একা একা নিজের মনে।

সমীক্ষক চুপ করে বসে থাকেন একটু দূরে। শিশুর খেলা দেখেন। শিশুর সঙ্গে শিশু সমীক্ষককে প্রথমে কিছুটা ভাব করতে হয়। সমীক্ষকের প্রতি শিশুর কিছুটা আস্থা ও অনুরাগ জন্মায়। শিশুদের বেলাতে সেটা সাধারণতঃ সহজেই হয়। খেলা চলছে—শিশু একটা

* সম্পূর্ণ রোগলক্ষণ দূর হবার আগেও চিকিৎসার সুফল রোগী নিজের দেহমনে অনুভব করে।

পুতুল দুম করে মারলো। সমীক্ষক জিজ্ঞাসা করলেন—"ও কি করছিল"? শিশুর উত্তর—"পড়াশুনা করছেনা"। শিশু সমীক্ষক জিজ্ঞাসা করলেন—"আর কোন দুষ্টুমি"? শিশু একঝুড়ি দুষ্টুমির কথা বললে—ভাল করে খায় না, মা'র কথা একদম শোনে না—ইত্যাদি। সমীক্ষক—"ওকে মারছে কে"? শিশু—"কে আবার, মা"। সমীক্ষক—"মায়েরা বুঝি মারে," শিশু—"মারবেনা, নিশ্চয়ই মারবে"। এইভাবে অল্প অল্প কথাবার্তার মধ্য দিয়ে শিশুর মনোভাব, শিশুর অভিজ্ঞতার পরিচয় সমীক্ষক পান। সমীক্ষকের প্রশ্ন আরও গভীরতর হয়। শিশু সমীক্ষায় বহু ধৈর্য দরকার। ধৈর্য থাকলে শিশুর কাছ থেকে তার অভিজ্ঞতা, তার মনোভাব, তার ইচ্ছা ও আবেগের সন্ধান তিনি পান। সময়মত সতর্কভাবে তার সংশোধনের চেষ্টা তিনি করেন। শিশুর কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি যাতে হয় তার জন্যও তিনি সচেষ্ট হন।

অস্বাভাবিক শিশুর সমস্যা তার নিজের ভাবনা জগতের। প্রথমে ঐ-ভাবনা, ইচ্ছাও আবেগের প্রবাহ যাতে স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হতে পারে তা দেখতে হবে। ভয় যদি সে পায়—পাক না! কত ভয়, কিসের ভয়। রাগ হলে রাগ সে করুক না। তার কাম ইচ্ছা—বলুক না তার ও সব কথা, খেলার মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ হোক না। প্রথমে হয়ত অন্য কারুর নাম করে ঐ ইচ্ছা ও আচরণের কথা বলে। তারপর ঐ সব ইচ্ছা ও আবেগ তার নিজেরই এমন বলে। মেলাইনি ক্লীন শিশুর মনের স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বচ্ছন্দ গতিকে বাধামুক্ত করবার উপরই জোর দিয়েছেন। শিশুসমীক্ষা গভীর থেকে গভীরস্তরে প্রবেশ করে। মাতৃগর্ভে তার কি অভিজ্ঞতা হয়েছে তার খেলার মধ্য দিয়ে তাও প্রকাশ পায়। শিশুর চোখের সামনে কতগুলি দৃশ্য ফুটে উঠে। 'একটা গভীর টানেল—চারিদিকে অন্ধকার। কেমন গরম, ভালো লাগছে ভয়ও করছে'। ব্যাখ্যা—মাতৃগর্ভে শিশুর অভিজ্ঞতা ও মানসিক অবস্থা।

* Melanie Clein –

শিশু সমীক্ষায় আনা ফ্রয়েড* কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করেন। শিশু মনকে কেবলমাত্র স্বাধীনতা দেওয়াই সমীক্ষকের কর্তব্য নয়। শিশু ছোট, তার শৃঙ্খলাবোধ কম। প্রয়োজনবোধে তাকে কিছুটা সংযতও করতে হবে। এটা শিক্ষারই কাজ। সমীক্ষা ও শিক্ষার এমন যোগকে তিনি নাম দিয়েছেন—'শিক্ষামূলক সমীক্ষা'।

একটু বড় হলেই শিশুরা ছবি আঁকে। ইচ্ছামত ছবি এঁকে, আঁকিবুকি করে তার মনের ভাবের পরিচয় দিতে ভালোবাসে। কোন কোন ক্ষেত্রে ছবি আঁকাকে মাধ্যম করে শিশুসমীক্ষা করা হয়। একটি ছেলে একটা মানুষের ছবি আঁকল। তারপর কি ভেবে তার মাথায় টুপি পরিয়ে দিল। টুপি পরালে কেন? প্রশ্নের উত্তরে সে বললে—"না হলে, লোকেরা ওকে চোর ভাববে"। নিজের মধ্যে তার অপরাধ-বোধ, নিজেকে সে চোর মনে করে। সে সত্যটা সে আড়াল করে রাখতে চায় তার ছবি আঁকা থেকে সমীক্ষক এটি উদ্ধার করলেন।

বড়দের মনঃসমীক্ষায় আবশ্যক—অতীতকে, বিশেষ করে মনের অবদমিত অতীতকে রোগীদের মুক্ত অনুসঙ্গের সাহায্যে উদ্ধার করা। ছোটদের সমীক্ষায় অতীত ও বর্ত্তমান সমভাবে শিশুমনের কাছে হাজির হয়। কোন সমীক্ষাতেই ভবিষ্যতকে একেবারে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়—বিশেষতঃ ছোটদের মনঃসমীক্ষায়।

ফ্রয়েডের ধারণা নির্জ্জান কেবলমাত্র ইদের ভাণ্ডার। ইয়ুং কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করেন। ওঁর মতে নির্জ্জান কেবলমাত্র ইদ নয়, সংস্কৃতি ও সৃজনাত্মক উন্নত চিন্তারও এটি ভাণ্ডার। মনের পীড়ার কারণ কেবলমাত্র অতীতেই নিহিত নয়—এমন ইয়ুংয়ের ধারণা। রোগীর বর্ত্তমান জীবনের সঙ্গে অভিযোজনের অক্ষমতার ফলে রোগী ক্ষেত্রবিশেষে রোগে আশ্রয় খোঁজে।

মানসিক চিকিৎসার কাজ হবে অন্তর ও বাইরের যে সব বাধার

---

* Anna Freud—

জন্য অভিযোজন সম্ভব হচ্ছে না তার সতর্ক অনুসন্ধান। অভীষ্ট ও লক্ষ্য কতখানি বাস্তবানুগ তার হিসাব নেওয়া, সমস্ত বাধার মুখোমুখি হওয়া, তার জন্য উপযুক্ত শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করা—এসবই মানসিক চিকিৎসার অন্তর্ভূক্ত।

আলফ্রেড আডলারের প্রবর্তিত মানসিক চিকিৎসার ধারাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন। আডলার প্রথম দিকে ফ্রয়েডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে ভিন্ন পথের কথা বলেন। আডলারের ধারণা—শিশু জন্মায়-একান্ত অসহায়, ক্ষীণ ক্ষুদ্র ও তুর্বল রূপে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পূর্ণ-বিকাশ তার হয়নি, দৈর্ঘ্যে ছোট, হাত পা তার ছোট ছোট। সীমাবদ্ধ তার চলচ্ছক্তি। বড়দের সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে সে ছোট মনে করে। কিন্তু এটা তার পক্ষে সুখকর অনুভূতি নয়। তার মধ্যে জাগ্রত হয় "পুরুষোচিত প্রতিবাদ"। সে ছোট হয়ে, হীন হয়ে থাকবে না, সে বড় হবে, বাবা-মায়ের মত বড় হবে, এমন কি তাদের চেয়েও বড় হবে। এটাকে আডলার অভিহিত করেছেন—"বড়ত্ব বা শ্রেষ্টত্ব লাভের প্রচেষ্টা"। প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের মধ্যে হীনতাবোধ আরও প্রবল। মানসিক ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতাকে আশ্রয় করে—হীনতাবোধ রূপ নেয়। আশ্চর্য এই—হীনতার কারণটি সব সময়ে প্রকৃত নয়, কাল্পনিক হীনত্ব-বোধেও মানুষ ভোগে। অমন অসুস্থ হীনত্ববোধের পীড়ন কিছুমাত্র কম নয়, বরঞ্চ বেশী। প্রকৃত হীনতার সঙ্গে মানুষ কিছুটা আপোষ করে। অনেকক্ষেত্রে তাকে মেনে নেয়। কিন্তু তুঃখের ভিত্তি যেখানে কাল্পনিক —তার সঙ্গে আপোষ করা, তাকে মেনে নেওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। প্রকৃত তুঃখে সান্ত্বনা আছে, কাল্পনিক তুঃখে কোন সান্ত্বনা নেই।

'দেবতারা যা পারেন আমি তা পারি না'— এই নিয়ে মানুষের হীনতা বোধ নয়। 'মানুষ যা পারে—আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবেরা যা পারছে, আমি তা পারিনা'—এই নিয়েই মানুষের হীনতা বোধ। ঐ

হীনতা থেকে মুক্তি পাবার জন্য মানুষ বড় হবার পথে, শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পথে ব্রতী হয়। এর মধ্যে মনে অন্তর্নিহিত থাকে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতার ভাব—'আমি বড় হব, অন্যদের ছাড়িয়ে যাব'। ঐ মনোভাব সময় সময় নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। অন্যদের প্রতি তার বিবেচনা থাকে কম। সে নিজেই নিজের কাছে সত্য, অন্যদের তাকে হারাতে হবে।

কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষের প্রীতির ভাব, বন্ধুভাব এটাওত সত্য। এমন ভাব কারুর মধ্যে বেশী আবার কারুর মধ্যে কম। আডলারের ভাষায় এটি 'সামাজিক অনুভূতি'। যাদের মধ্যে এটি বেশী, বড় হবার পথ তারা বেছে নেয়—কিন্তু সমাজের কল্যাণের দিকটা তারা ভোলেনা। মানুষের কল্যাণ করেই তারা বড় হতে চায়। দুজন বিজ্ঞানী—একজন মানুষকে ও মানবসভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্য এ্যাটম বোমা তৈরী করার সহায়তা করে নাম কিনলেন, অপরজন পেনিসিলিন উদ্ভাবন করে মানুষের অশেষ কল্যাণসাধন করলেন।

কিন্তু বড় হতে হলে প্রতিভা দরকার। সেটা সবসময়ে মানুষের থাকেনা। ব্যাধিগ্রস্ত কল্পনায় মানুষ বড় হয়েছে বলে মনে করে। অসুস্থ হয়ে, রুগ্ন হয়ে পরিবারের মধ্যমনি হয় — অন্যদের মন আকর্ষণ করে দুষ্ক্রিয়ার দ্বারাও আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনীও বিরল নয়।

আডলারের ধারণা পুরুষ নিজের পুরুষত্ব জারি করে বড় হয়। আত্মনিবেদন ও আত্মমোচনের পথে পুরুষের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করে নারী বড় হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন — 'কোথায়ও জোর, কোথায়ও মোহিনী মায়া' —আত্মপ্রতিষ্ঠা ও প্রভূত্ব অর্জনের দুটি বিভিন্ন ভঙ্গী। নারী-পুরুষ উভয়েই বড় হতে চায়। বৈষ্ণবোচিত বিনয়ে অনেকে বলেন — "আমি দীনহীন, আমি সেবকমাত্র।' ঐ দীনহীন মনোভাব দিয়েই লোকচক্ষে তারা বড় হবার চেষ্টা করেন। মানুষের জীবনে মূল লক্ষ্য 'বড় হওয়া'।

এমন বিবেচনারহিত, স্বার্থসর্বস্ব বড় হবার উগ্রবাসনা থেকে মুক্তি পাবার পথ মানুষের প্রতি প্রীতিভাবের পূর্ণতর উন্মেষ। মানুষকে ভালবাসতে পারলে, মানুষকে হটিয়ে, হারিয়ে পর্যুদস্ত করে বড় হবার বাসনা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। বড় ছোট কেউ নয়, বড় ছোট ভাবটা কিছু নয় এমন ভাবটা মনে আসে। সবাই মানুষ এটাই চরম ও পরম সত্য। এই মনোভাবে মনস্থির হলে মানুষের মনে সাম্য আসে, মানুষ আর অস্থির বোধ করে না, মনের শান্তি ও স্বাস্থ্য ফিরে পায়।

আচরণবাদ ঃ

রুশ বিজ্ঞানী পাভলভ ও বেক্টারেভ আচরণ-বাদের প্রবর্ত্তক। ওয়াটসন প্রভৃতিরা মনোবিদ্যায় আচরণবাদের প্রয়োগ করেছেন। মানুষের আচরণের দুটি দিক—এক উদ্দীপক; দুই ঐ উদ্দীপকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বা প্রতিবেদন। উচ্চশব্দে শিশু ভীত ও সচকিত হয়।

উদ্দীপক—উচ্চশব্দ

সংবেদন—শঙ্কিত আচরণ

এই দুটির মধ্যে যে বন্ধন তা সহজাত। অভিজ্ঞতার দ্বারা এই স্বাভাবিক বন্ধন কে বিস্তৃত করা যায়। ছোট শিশু খরগোস দেখলে খুশী হয়, খরগোসকে ধরতে, নাড়াচাড়া করতে, তাকে নিয়ে খেলা করতে সে উদ্যোগী হয়। আলবার্ট আঠারো মাসের শিশু। তার সামনে অমন একটি খরগোসকে রাখা হল। আলবার্ট যেই ঐ খরগোসকে ধরতে যাচ্ছে—দুম্ করে সজোরে একটা ঘণ্টা বাজানো হল। চমকে ভয়ে শিশু হাত গুটিয়ে নিল। পরপর কয়েকদিন ঐ ঘটনার পুনরাবৃত্তির পর খরগোসের ভয় শিশুর মনে গেঁথে গেল। খরগোস দেখামাত্র শিশু ভয় পায়, সঙ্কুচিত হয়ে সরে যায়, কেঁদে উঠে। উদ্দীপক 'ঘণ্টার শব্দের' স্বাভাবিক সংবেদন 'ভীত আচরণ' খরগোসে সঞ্চারিত হয়েছে।

খরগোসের প্রতি ঐ সৃষ্ট ভয় কি করে দূর করা যায় এটাই মনোচিকিৎসার বড় প্রশ্ন। ভয়ে শিশু তথা মানুষ সর্বদা পীড়িত। এই সমস্ত ভয় না থাকলে মানুষ কত বেশী সুখী হত! নির্ভীক, উদ্বেগরহিত মন মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

আচরণবাদীদের মতে বেশীর ভাগ ভয়ই অর্জিত — অভিজ্ঞতার দ্বারা সহজাত ভয়ের সঙ্গে সংযোজনা। খরগোসের প্রতি ভয় দূর করবার পথ ওঁরা দেখিয়েছেন। ঐ পদ্ধতিকে বলা হয় বিয়োজন। ঘন্টার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে খরগোসের ভয়। এর পর কয়েক দিন ধরে খরগোসকে শিশুর কাছে হাজির করা হল। প্রথমে শিশুর কাছ থেকে বেশ কিছু দূরে। শিশু খরগোস দেখে ভয় পেল কিন্তু ভয়ে একেবারে কাবু হলনা। কিছুটা সয়ে যাবার পর খরগোসকে আরও কাছে এনে রাখা হল। এই ভাবে সইয়ে সইয়ে শেষে খরগোস একেবারে শিশুর কাছে। দেখা গেল ভয় দূর হয়ে গেছে শিশু আগের মত খরগোস নিয়ে খেলছে। বিয়োজন পদ্ধতিটি আরও ত্বরান্বিত করবার জন্য কেউ কেউ ঐ সময়ে শিশুর প্রিয় খাদ্য চকলেট শিশুকে দেওয়ার পক্ষপাতী। যে অভিজ্ঞতা শিশুর কাছে অপ্রীতিকর, ভয়াবহ ছিল—তা হয়ে ওঠে প্রীতিকর মনোরম অভিজ্ঞতা।

উদ্দীপক ও আচরণ বিয়োজনকে একটু বিশ্লেষণ করলে বলা চলে দূরে অবস্থিত খরগোসের ভয়ের চেয়ে চকলেট খাওয়ার আনন্দ বেশী বলে, আনন্দটা খরগোসে সঞ্চারিত হল, খরগোসের ভয় অপসারিত হল। অতএব বলা অসঙ্গত হবেনা দুটি উদ্দীপকের মধ্যে যেটির প্রাবল্য বেশী সেটাই সঞ্চারিত হয় সংযোজিত আচরণে। ঘন্টার প্রতি স্বাভাবিক ভয় একেবারে লুপ্ত না হলেও হ্রাস পায় একথা মনে করলে ভুল হবেনা।

রোগীর মনে যে সব ভয় দেখা যায়—সে সবের চিকিৎসা দরকার। ঐ চিকিৎসায় আচরণবিদরা বিয়োজন পদ্ধতি গ্রহণের পক্ষপাতী। সময় সময় রোগীকে বিশেষ প্রকার একটা সুখকর আবেষ্টনে রেখে ঐ সব

ভয় ভীতিকে দূর করবার চেষ্টা করা হয়। অমন চিকিৎসায় কিছু কিছু সুফলও হয়।

শিশু তথা মানুষের মনে কিছুকিছু প্রতীক ভয় দেখা যায়। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ঘোড়ার প্রতি একটি শিশুর নিদারুণ ভয়। দেখা গেল এর মূলে কোন অভিজ্ঞতার ভূমিকা গৌণ। ঘোড়া তার চক্ষে অবদমিত "দুষ্ট বাবার" প্রতীক। শিশু তার গভীর মনে বাবাকে দুই ভাগ করেছে। যে বাবা তাকে শাসন করেন, তার উপর রাগ করেন—তিনি "দুষ্ট বাবা"। শিশুর নির্জ্ঞানে তার স্থান। আবার, যিনি ভালোবাসেন, আদর করেন—তিনি "ভালোবাবা"। সেই বাবা শিশুর সচেতন মনে।

বিয়োজন পদ্ধতিতে সরাসরি এমন প্রতীক ভয় দূর করা সম্ভব নয়। নির্জ্ঞান মন থেকে দুষ্ট বাবাকে উদ্ধার করতে হবে—সচেতন মনে বাস্তবজ্ঞানের দ্বারা বাবার সঠিক চিত্র শিশুর সামনে মেলে ধরতে হবে। সচেতন ভাবে গোটা বাবাকেই সে জানবে—ভালোবাসবে আবার কিছুটা ভয় ও করবে (বাড়াবাড়ি ভয় নয়)। ঘোড়াকে তৎপর আর তার বাড়াবাড়ি ভয় করতে হবে না।

কোন একটি স্তরে বঞ্চিত হবার জন্য বিশেষ ক্ষোভ থাকলে মন সেখানেই পড়ে থাকতে চায়। যাকে বলা হয় সংবন্ধন। ঐ স্তর থেকে মুক্তি পাবার জন্য – কাম বিকাশের অগ্রগতি সুগম করবার জন্য বাস্তবে অমন সদৃশ অনুকূল আরামদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা। চিকিৎসকের উপস্থিতিতে রোগীর মনোকষ্ট দূর করে তাকে সুস্থ করে তোলা যায়। এটিকে চিকিৎসা পদ্ধতির অঙ্গজ হিসাবে কেউ কেউ গ্রহণের পক্ষপাতী। দৃষ্টান্ত একটি ঘর, চারিদিকের দরজা জানালা বন্ধ। আরামপ্রদ বিছানা, রোগী চোখবুজে শুয়ে মনে মনে স্বতঃকামের রঙে রঞ্জিত সুখভোগ করছে —নিজের আঙ্গুল চুষছে প্রভৃতি। কিছুদিনের মধ্যে সুখভোগ শেষ ও চূড়ান্ত হলে রোগী মনে মনে বড় হয়ে ওঠে। ক্রমে তার আবেগ

জীবনে পরিণতি লক্ষ্য করা যায়—সে সুস্থ হয়ে উঠছে। এটা ক্ষেত্র বিশেষে কিছু কার্যকরী হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের গৃহ পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দেওয়া হয়। বিদেশে শিশুরা অপেক্ষাকৃত সহজে অন্য কোন পিতামাতার গৃহে গৃহীত হন। পালক পিতামাতার কাছে তারা বড় হয়। দরকার মত কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের পিতামাতার কাছে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এদেশে অমন ব্যবস্থা প্রচলিত নেই। অন্য কোন নিকট আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে তাকে পাঠান যেতে পারে। গৃহে যখন অশান্তি প্রবল, শিশু যখন পিতামাতার স্নেহ ভালোবাসা কম পায়, অত্যধিক নিপীড়িত হয় তখন 'মন্দের ভালো' হিসাবে এই পন্থা নেওয়ার প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ ছোটবেলা থেকে (৫—৬ বছর বয়স) শিশুদের হষ্টেলে বাস করতে হলে কতগুলি কুফল ফলে। বাড়ীর প্রতি তাদের টানটা কমে যায়, পিতামাতা, ভাইবোনদের প্রতি ভালোবাসাও কিছুটা হ্রাস পায়। মানসিক স্বাস্থ্যও তাদের কিছুটা ক্ষুন্ন হয়। তাদের মনে সুখ কম থাকে। অবশ্য এও দেখা গেছে—তাদের মধ্যে উচ্চাশা হয় বেশী, কিছুটা সৃজনাত্নক শিল্প প্রতিভাও।*

ব্যাতিক্রম দেখা গেছে কয়েকটি ক্ষেত্রে। পিতামাতার কাছ থেকে যারা তেমন ভালোবাসা পায়নি, পিতামাতা যেসব ছেলেদের চোখে অত্যাচারী—হষ্টেলে থাকবার সুযোগ তাদের কাছে অপেক্ষাকৃত কল্যাণ কর বলে মনে হয়েছে। গৃহ পরিবেশের পরিবর্ত্তন তাদের কাছে কাম্য বলে বোধ হয়েছে। একথা সত্য পিতামাতার সান্নিধ্যে স্নেহমায়ার ছোটরা বড় হবে এটাত সৌভাগ্য। কিন্তু মনে রাখা ব্যাতিক্রম ও আছে। এটাও দুঃখের কথা, তবুও সত্য।

যেমন শিশু পরামর্শ ক্লিনিক আছে, তেমনি কিছু কিছু শিক্ষা পরামর্শ ক্লিনিকও রয়েছে। শিক্ষায় যারা অনগ্রসর তাদের সাহায্যের

* গীতা ভারমা।

জন্য ঐসব ক্লিনিক। অনগ্রসর ছেলেমেয়েদের আবেগ জীবনে ত্রুটী ঘটে মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন হয়—তৎপ্রতিও ঐসব ক্লিনিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। 'তারা যেটা পারে—তারা যেন সেটা করে, তারা যেটা পারেনা, যেটা তাদের সাধ্যাতীত—তাতে তারা যেন ব্যর্থ চেষ্টা করে নিজেকে আরও ছোট না করে, আরও ক্ষোভ না বাড়ায়"। শিক্ষার লক্ষ্য যেমন জ্ঞান ও নৈপুন্য অর্জন, তেমন মোহঅপনয়ন—অসম্ভবের সাধনায় মাথা খুঁড়ে মরার থেকে যেন ছেলেমেয়েদের বিরত করে।

আমি যা আমি তাই। আমি কেন অন্য কেউ নই, কেন আমি অন্য কেউ হলাম না, কেনই বা আমি অন্য কেউ হব না এমন কষ্টকর মানসিক দৈন্যে যারা ভোগেন, তারা মানসিক ভাবে অসুস্থ।

সবশেষে একটি কথা যোগ করা আবশ্যক। রোগ, দুষ্ক্রিয়া বা শিক্ষায় অনগ্রসরতার কারণ নির্ণয় করাই যথেষ্ট নয়—নিরাময় করা, সংশোধন করা, দূরীভূত করাই মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্‌দের প্রধান লক্ষ্য।

ড্রাগ আসক্তি

আজকাল ড্রাগ-আসক্তি সমাজে মারাত্মক রোগের মত দেখা দিয়েছে—কি এদেশে কি বিদেশে। তরুণ সম্প্রদায়কে কি করে এর হাত থেকে বাঁচানো যায়—দেশের লোকেরা অনেকেই ভাবছেন। কিছুকিছু ক্ষেত্রে কাজও হচ্ছে।

হিরোইন, ব্রাউন সুগার, ঘাস, কোকেন, এল. এস. ডি, প্রভৃতি মাদক দ্রব্য ছেলেমেয়েরা গ্রহণ করে। খায়, ওসবের ধূমপান করে, কেউকেউ নিজেদের ইনজেক্‌শন দেয়। এসবের ফলে তারা সাময়িক ভাবে কিছুক্ষণ বিভোর হয়ে থাকে। বাস্তবজীবনের রূঢ়তা থেকে মুক্তি ও কল্পলোকের আনন্দে তারা মশগুল হয়।

ড্রাগের আক্রমণে বর্ত্তমানের তরুণেরা বহুলভাবে বিপর্যস্ত। তাদের ক্ষুধামান্দ্য ঘটে, শরীর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়, এমনকি মৃত্যুও ঘটে।

পড়াশুনা, কাজকর্ম ক্রমশই অচল হয়ে পড়ে।

কিছুকিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসার প্রয়োজনে অল্পবিস্তর ড্রাগ ব্যবহার করা হয়। কিছুতেই ঘুম আসছেনা—ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়ানো হয়; অত্যাধিক যন্ত্রণা হচ্ছে ড্রাগের দ্বারা সাময়িক ভাবে তার উপশম ঘটানো হয়।

তবে দুঃখ বেদনা ভোলা—সত্য না হউক, কোন কাল্পনিক সুখ-লাভের পথ প্রশস্ত করা এই কি ড্রাগ আসক্তির মূলে? এমন মনে করবার নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

সাধারণতঃ দলে পরে ছেলেমেয়েরা ড্রাগ আসক্ত হয় এমন একটা প্রচলিত ধারণা আছে। ড্রাগ আসক্ত তার বন্ধুকে ড্রাগের পথে নিয়েআসে এমনও বহু ঘটনা আছে। একে ড্রাগের আকর্ষণের দিক বলা হয়। কিন্তু ড্রাগ আসক্ত বন্ধুত অনেকেরই আছে, সবাইকেত ড্রাগ-আসক্তেরা আকর্ষণ করতে পারেনা। যারা ঐ আকর্ষণে সাড়া দেয়, তাদের মনোভাবে এমন কিছু আছে যে ড্রাগের মধ্য দিয়ে তারা আত্মবিস্মৃতি খোঁজে। এদের মনের এক কোণে, মনে করা চলে, একখণ্ড বিষন্নতার কালো মেঘ জমে থাকে, জীবন এদের কাছে বহুলাংশে অর্থহীন ও মূল্যহীন—নিজেদের মূল্যও এরা খুজে পায় না। শৈশবে অভিজ্ঞার দ্বারাই প্রধানতঃ তাদের মধ্যে অমন মনোভাব গড়ে উঠেছে।

পিতামাতার স্নেহ যেখানে কম, উদাসীন্য—এমনকি উৎপীড়নও যেখানে বেশী সেখানে নিজেদের সহজভাবে গ্রহণ করার ক্ষমতাও ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কম হয়। সিজোফ্রেনিয়া রোগীদের ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে—তাদের মা সাধারণতঃ বিশেষ কর্তৃত্বপরায়ণ হন, ছেলেমেয়েদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা মায়ের কাছে বড় নয়, তিনিই সব বোঝেন, তিনি যেটা স্থির করবেন, সেটাই হবে।* স্মিতা কোঠারি ড্রাগ-আসক্তদের নিয়ে একটি অনুসন্ধান করেছেন। তাতেও মোটামুটি অনুরূপ ফল পাওয়া গেছে।

* তড়িৎ চ্যাটার্জী—পি এইচ ডি

কিছুকিছু ড্রাগ-আসক্তেরা স্বভাবে মৃদু হয়, কিছুটা বিষণ্ণও হয়। ড্রাগের পাল্লায় এরাই পড়ে। এই মনোভাব এদের ড্রাগের পথে ঠেলে দেয়। তবে ড্রাগ আসক্তি ব্যাপারে ড্রাগসেবী বন্ধুদের কিছু ভূমিকা আছে, ড্রাগের নিজস্ব একটি আকর্ষণী শক্তিরও। ইংরাজীতে বলতে গেলে বলতে হয়—কিছুটা pull, ও কিছুটা push'র জন্য ছেলেমেয়েরা ড্রাগের পথে পা বাড়ায়।

ড্রাগ কেনবার জন্যে এদের বহু পয়সা ব্যয় হয়। টাকা পায় কোথা থেকে? নিজের পকেটের খরচ, বাবামা'কে ফাঁকি দিয়ে, এমন কি বাবা-মায়ের কাছ থেকে চুরি করে এরা অর্থ সংগ্রহ করে।

যেভাবে ড্রাগ আসক্তি বাড়ছে তাতে পিতামাতার স্নেহের দৈন্য শাসনের আধিক্য দিয়ে কি এর এক একটি যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা সম্ভব? পিতামাতাদের কাজত ভালবাসা। পিতামাতারা সবাইত ছেলেমেয়েদের ভালই বাসেন—এমন উক্তি পুরাপুরি সত্য নয়। যতখানি ভাল বাসা শিশুদের দরকার—ছেলেমেয়েরা অনেক পিতামাতার কাছ থেকেই তা পায়না। তদুপরি অমন ভালোবাসার দুটি রূপ আছে। একটি প্রকৃত ভালোবাসা—যা নিঃস্বার্থ শিশুকেন্দ্রিক ভালোবাসা, অপরটি 'শিশু আমার সন্তান—আমার অংশ। মা যদি বলে—'তুমি আমার'। শিশুও সহজ চিত্তে অনুভব করবে, 'মা আমি তোমার'। এটা নব শিশু, সব সন্তানেরই দরকার। কিন্তু এটাই যদি প্রধান হয়, শিশুর নিজস্ব প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের দিকটা, শিশুর কল্যাণ ও অকল্যানের দিকটা যদি মায়ের কাছে সবচেয়ে বড় না হয়—তবে শিশুর মন ভরবে না।

এ জাতীয় মায়েদের সংখ্যা বহু। এমন শিশুরা বড় হয়ে ড্রাগ আসক্তির মধ্যে আত্মবিস্মৃতি ও মুক্তি খুঁজবে, তাতে আর আশ্চর্য কি আছে?

ড্রাগ আসক্তদের চিকিৎসা ঃ

কাউকে ভয় দেখিয়ে শাসন করে ড্রাগ থেকে বিরত করা যায়না।

এরজন্য দরকার চিকিৎসা। এই চিকিৎসা আরম্ভের জন্য ড্রাগ আসক্তদের মধ্যে একটি দৃঢ় সংকল্প থাকবে "আমি ড্রাগ ছাড়ব, আমি একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হব"। ছাত্রছাত্রী বলবে—"আমি পড়াশোনা করব"। যারা কাজ করেন, তারা বলবে—"আমি আমার কাজ করব"। কেবলমাত্র বাবামায়ের সদিচ্ছা, চিকিৎসকের চেষ্টা দ্বারা বিশেষ কোন ফললাভ করা সম্ভব নয়।* যে সব ড্রাগ আসক্তেরা, ড্রাগ যে কতখানি মারাত্মক, সেটা যদি হৃদয়ঙ্গম না করে, সুস্থ মনে মুক্ত পরিবেশের আলো-আকাশ দেখবার জন্য উদগ্রীব না হয় সেখানে চিকিৎসায় উপকৃত হওয়া কঠিন। "আমি সুস্থ হব, সুখী হব—নির্বোধের মত নেশায় বুদ হয়ে থাকবনা"—ড্রাগ আসক্তদের মধ্যে এমন একজন বলেছিলেন। তিনি নিজেই ডাক্তারের সাহায্য চেয়েছেন, রোগ নিরাময়ে ডাক্তারদের সঙ্গে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করেছেন—ড্রাগ আসক্তির হাত থেকে অবশেষে মুক্তি পেয়েছেন।

চিকিৎসার সময় সাধারণতঃ ড্রাগ আসক্তদের গৃহের পরিবেশ থেকে সরিয়ে এনে হাসপাতালে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ড্রাগ ত্যাগের প্রথম দিকটায় এদের অসহনীয় কষ্ট হয়। এরা পাগলের মত করতে থাকে। ড্রাগ খেয়ে কষ্টের প্রশমন এরা চায়। সে সময় যাতে ড্রাগ কোনপ্রকারেই তাদের হাতে না পড়ে তাদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। ক্রমে কষ্ট কমে আসে। ড্রাগ ত্যাগটি সহজ হয়ে ওঠে। অবশেষে ড্রাগ থেকে এরা মুক্তি পায়, এরা নবজীবন লাভ করে।

মানসিক ব্যাধির যেমন পুনরাবির্ভাব ঘটে, তেমন ড্রাগমুক্তরা পুনর্বার ড্রাগ আসক্ত হয়েছে এমন বহু ঘটনা আছে। বিশেষতঃ এরা গৃহের পুরাতন পরিবেশে থাকলে এমনটা হয়। অস্বাস্থ্যকর গৃহপরিবেশ যদি ড্রাগ-আসক্তির একটি প্রধান কারণ হয় তবে কেউ ভালো হয়ে

* মনঃসমীক্ষার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে রোগীদের নিজেদের ইচ্ছা দরকার। অন্যের ইচ্ছায় কারুর মনঃসমীক্ষা সম্ভব নয়।

আবার ঐ পরিবেশে অসুস্থ হবে তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে! মুখে বললেইত গৃহপরিবেশ বদলানো যায়না। পূর্বে উল্লেখ করেছি—বাবা-মায়ের আচরণ—তাদের নিজেদের অতীতের সঙ্গে অমোঘ শৃঙ্খলে বাঁধা। কিছুটা পরিবর্ত্তন হয়তো হয়, তবে কখনই বেশী নয়।

সর্বশেষে স্মরণ করতে হবে ড্রাগ একটি লাভজনক ব্যবসা হয়েছে। ছেলেমেয়েদের কাছে ড্রাগ বিক্রি করে কিছু ব্যবসায়ী লাখ লাখ, কোটি কোটি, টাকা উপার্জন করে। এই ব্যবসা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্ধ করতে হবে। সিঙ্গাপুরে, ইরাণে ড্রাগ মজুত ও ড্রাগ বিক্রির অপরাধের শাস্তি প্রাণদণ্ড। ড্রাগ মৃত্যুর চেয়েও বেশী ভয়ঙ্কর। মানুষকে হত্যা করার অপরাধে যদি প্রাণদণ্ড হয় - তবে ড্রাগমজুত ও বিক্রির অপরাধে যদি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তবে তাতে অন্যায় কী আছে।

ড্রাগ আসক্তি আত্মহত্যার চেয়েও ভয়ঙ্কর। এমন জীবন বেঁচে মরে থাকার অভিশাপে অভিশপ্ত। ড্রাগ আসক্তরা নিজের চরম ক্ষতিত করেই —অন্যদেরও ড্রাগের পথে টেনে আনার দুক্রিয়ার অপরাধে অপরাধী এমনও প্রায়ই দেখা যায়। নিশ্চয়ই মনে হতে পারে এদেরওত শাস্তি-বিধান প্রয়োজন।

প্রশ্ন এই—ড্রাগ আসক্তি পথে পা বাড়াবারত এদের কারণ আছে। অমন ইচ্ছাত ওদের ইচ্ছাধীন নয়। জীবনে এরা পরাজিত সৈনিক। যে সব ঘটনা, সৃষ্ট যে সব মনোভাব এদের এ.পথে ঠেলে দিয়েছে, তাদের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এদের ছিলনা।

এদের বাঁচাতে হবে। বাঁচাবার জন্য প্রথম আবশ্যক—ড্রাগ আসক্ত দের খুঁজে বার করা, তাদের আটকানো—তৎপর সংশোধনাগারে তাদের পাঠিয়ে দিতে হবে, চিকিৎসার প্রয়োজনের দিকে এদের মুখ ঘোরাতে হবে —এদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। এটা ড্রাগ আসক্তদের পিতা-মাতার দায়িত্ব, সমাজের দায়িত্ব। ড্রাগ আসক্তদের পিতামাতা অনেক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ অপারক—প্রধানতঃ তাদের জন্যই তাদের ছেলেমেয়েদের

ড্রাগ আসক্তি। সুতরাং ঐ দায়িত্ব বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্রেরই গ্রহণ করতে হবে। ড্রাগ আসক্তদের আটকাতে হবে—তাদের নিজেদের জন্য, অন্যদের বিপথগামী করবার সুযোগ যাতে তারা না পায় তারি জন্য। চিকিৎসা করে ড্রাগ আসক্তরা যাতে আবার সুস্থ স্বাভাবিক নাগরিক জীবন যাপন করতে পারে—তারি চেষ্টা করতে হবে। আজকের যুবসমাজের এক বৃহদাংশের বাঁচাবার এ ছাড়া পথ নেই। কেবলমাত্র ড্রাগ আসক্তি যুব সমাজের সর্বনাশ করছে এই বলে কর্ত্তব্য শেষ করলে সেটা আমাদের হতাশার পরিচয়, অনেক সময় ভণ্ডামিও।

মানসিক স্বাস্থ্য ও যোগ

মানসিক স্বাস্থ্যে মনঃসমীক্ষার স্থান আমরা আলোচনা করেছি। মনঃসমীক্ষার দ্বারা কি লভ্য একথা এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একটি ছোট বন্ধ ঘরে থাকতে হলেই এক ব্যক্তির ত্রাসের সঞ্চার হয়; বাইরের দরজা বন্ধ করা হয়েছে কিনা, বারবার একজনকে উঠে দেখতে হয়। এসব রোগ মনঃসমীক্ষার দ্বারা নিরাময়ের চেষ্টা করা হয়। অমন চিকিৎসার দ্বারা বহু ক্ষেত্রে রোগ উপশম হয়। ঐসব রোগ লক্ষণমুক্ত হলে সাধারণতঃ চিকিৎসক চিকিৎসার শেষ করেন। এমন একটি রোগিনী ফ্রয়েডের কাছে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন। চিকিৎসা চলাকালীন রোগিনী জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা ডাক্তার, আপনি কি মনে করেন, রোগ নিরাময় যখন হবে তখন আমি সুখী হব"। সত্যনিষ্ঠ ফ্রায়ড উত্তর দিলেন, "মহাশয়া, আমার কাজ আপনার রোগ নিরাময় করা। রোগলক্ষণ মুক্ত হলেই আমি চিকিৎসার সমাপ্তি ঘটাবো। অতঃপর সাধারণ মানুষেরা যেমন দুঃখ কষ্ট ভোগ করে—আপনিও তাই ভোগ করবেন।" মনঃসমীক্ষার দ্বারা মানুষকে সুখী করবার দায়িত্ব মনঃসমীক্ষা গ্রহণ করে না। রোগকষ্ট, কিছুটা অশান্তি, কিছুটা উদ্বেগ থেকে রোগীরা নিশ্চয়ই মুক্তি পায়, তাতে কিছুটা সুখীও তারা হয়। তবে 'সুখী করা' এতবড় অঙ্গীকার করা মনঃসমীক্ষার কিম্বা কোন প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধিতি পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু সত্য কথা, দুঃখেইত মানুষ অহর্নিশ দগ্ধ হচ্ছে। 'সর্ব্বম দুঃখম' এই নিয়েইত সিদ্ধার্থের সাধনা আরম্ভ। বুদ্ধত্ব লাভের পর ভগবান বুদ্ধ বললেন—"আমি জেনেছি কেমন করে শান্তিলাভ করা যায়। এসো, সে পথ কি আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি।" সারনাথ স্তূপে

বসে কতিপয় শিষ্যের কাছে ভগবান বুদ্ধের এই প্রথম বাণী।

দুঃখই মানুষের সবচেয়ে বড় রোগ। শান্তিলাভ করা, সুখী হওয়া যদি জীবনের চরম এবং পরম কাম্য হয়—সাধনার পথে যদি তা লভ্য হয় তবে চিকিৎসা শাস্ত্রের পাতা থেকে তাকে বাদ দিই কেমন করে। ঐ সাধনা কঠিন? হ্যাঁ, কঠিনত বটেই, তবে অসাধ্য নয়। একেবারে রোগপীড়িতদের পক্ষে এপথ গ্রহণ করা আরও কঠিন। তবে এমনও দেখা গেছে কোন কোন রোগগ্রস্ত এপথ গ্রহণে কিছুটা সক্ষম হয়েছে। কিছুটা সুফলও পেয়েছে। সংক্ষেপে ও সহজে এ পথের সম্বন্ধে কিছু বলা এখানে আবশ্যক।

মানসিক স্বাস্থ্যের যোগের স্থান কি এই নিয়ে এই অধ্যায়টি মনে রাখা দরকার—এই যোগ হটযোগ নয়, রাজযোগ। পাতঞ্জলি প্রণীত সাংখ্যযোগে যার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আছে।

ছোট একটি মনস্তাত্বিক অনুসন্ধান উল্লেখ করেই বিষয়টির আমরা অবতারণা করি। সুখিত্বলাভে, মানসিক স্বাস্থ্য উদ্ধারে জপধ্যানের স্থান এই নিয়ে অনুসন্ধনটি হয়েছিল। অনুসন্ধানটি হয়েছিল—১৯৮৬ সালে। সাঁইভক্ত স্নাতোকোত্তর পাঠরতা একটি মেয়ে 'নুতন' যার নাম, অনু-সন্ধাটি করেছিলেন। লেখকও তারিপূর্বে বিদেশে অমন একটি অনুসন্ধান করেছিলেন। যা পাওয়া গেছে নীচে তা সন্নিবদ্ধ করা হল। পিতা-মাতার অত্যধিক শাসনে পীড়িত ছেলেমেয়েদের মনে ক্রোধ পুঞ্জীভূত হয়। এদের ক্রোধ দুইদিকে প্রবাহিত হয়—নিজের অভিমুখে, বহি-জগতের দিকে। নিজেদের এরা ঘৃণা করে, অন্যদেরও এরা ঘৃণা করে। এরা হয় একাধারে আত্মক্রোধী এবং অপর দিকে মানুষের প্রতি ক্রোধ পরায়ণ। ক্রোধের সুখিত্বের ও মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে একটি নেতিবাচক সম্বন্ধ আছে। দুইয়ের পারম্পর্য—·৫০রও বেশী। সংক্ষেপে যারা শৈশবে পিতামাতার দ্বারা উৎপীড়িত হয়, তাদের একটি মোটা অংশ অসুখী ও মানসিক স্বাস্থ্যবর্জিত। এমন কিছু ব্যাক্তিদের দুই দলে ভাগ করে

নেওয়া হল। একদল আধ্যাত্মিকতার ধার ধারে না, এদের মধ্যে অনেকে সাধারণ ভাবে ভগবান বিশ্বাস হয়ত করে, পুজাঅর্চনাতেও যোগ দেয়। মন্দির, মসজিদ, গির্জায়ও যায়—কিন্তু যাকে বলা যায় অধ্যাত্মবাদ, তার সঙ্গে এদের কোন সম্বন্ধ নেই। আরেকদল অধ্যাত্মজীবনে পদক্ষেপ করেছে। প্রতিদিন কিছুসময় ধ্যানজপ করে সময় কাটায়, জীবনের খরস্রোত থেকে কিছুক্ষণের জন্য মনটাকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করে।

অনুসন্ধানের ফলে পাওয়া গেল অধ্যাত্মজীবনে যারা প্রবেশ করেছে তাদের মধ্যে একটি মোটা অংশ অনেক পরিমানে মানুষকে ক্ষমা করতে শিখেছে, নিজেদেরও সহজচিত্তে গ্রহণ করতে পেরেছে। এরা অনেকেই বেশ সুখী, মানসিক স্বাস্থ্য ও মোটামুটি ভালো। যে দলটির জীবনে আধ্যাত্মিক প্রবেশ ও বিকাশ ঘটেনি তারা মুখ্যতঃ অসুখী ও মানসিক স্বাস্থ্যও তাদের ভালো নয়। মানুষের প্রতি তাদের ক্ষমা কম, নিজেদেরকেও এরা ক্ষমা করে না।

বিবেকানন্দ তার রাজযোগ বইটিতে রাজযোগের একটি সুন্দর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। মনকে এক বিন্দুতে বা একটি বিষয়ে নিবদ্ধ করতে হবে। ঐ চেষ্টার আগে মনকে কিছুটা সময় ছেড়ে দিতে হবে। মানুষের চিন্তাভাবনার কি শেষ আছে? বেশ কিছুক্ষণ ছেড়ে দেবার পর মনের রাশ টেনে ধরতে হবে, কেন্দ্র বিন্দুতে মনকে নিবদ্ধ করতে হবে। তবু ছুটে ছুটে মন বেড়িয়ে যাবে। একটুক্ষণ অপেক্ষা করে মনকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। দীর্ঘ অভ্যাসে মন শান্ত হবে, একাগ্র হবে, স্থিরভাবে একটি বিন্দুতে অবিচলিত থাকবে। একজন বলেছিলেন "ভাবি যীশাসের পায়ের কাছে আমি চুপ করে বসে আছি অনেকক্ষণ। মন শান্ত হয়, মন আর ছুটোছুটি করেনা। সিষ্টার নিবেদিতা তার এক বান্ধবীকে লিখেছিলেন—"অনেক ধ্যানধারণাত করলাম তবে জানো সবচেয়ে আমার ভালো লাগে শ্রীশ্রী মায়ের পায়ের কাছে ছোট খুকীর মত বসে আছি তাই ভাবতে। এর চেয়ে আর বড়

ধ্যান কি আছে।" এটা বোধ হয় ভক্তিমিশ্রিত ধ্যান। ভক্তি যাদের বিশেষ আকর্ষণ করেনা তাদের পথ জ্ঞানের পথ। কর্মযোগীরা বেছে নেয় নিরাসক্ত কর্মের পথ। মনকে ধরে বেঁধে টেনে আনার কথাও কেউ কেউ ভাবেন। কিন্তু স্বাধীনমত স্বেচ্ছায় ভক্তির পথ গ্রহণ করবে এমনত অনেকে চায়। ভগবানকে ভালবাসার মত বড় কিছু আছে কী!

রাজযোগের কয়েকটি ধাপের কথা স্বামী বিবেকানন্দ উল্লেখ করেছেন।* প্রথম অঙ্গ—যম। এটিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলা হয়েছে। এর কয়েকটি ভাগ:

(ক) কাউকে হিংসা না করা,
(খ) পবিত্রতা রক্ষা করা,
(গ) সত্যনিষ্ঠ হওয়া
(ঘ) অপ্রতিগ্রহ—বৃথাদান গ্রহণ না করা

দ্বিতীয় অঙ্গটি হচ্ছে—নিয়ম—শরীরের যত্ন নেওয়া, স্নান করা, পরিমিত আহার করা।
তৃতীয় অঙ্গটি হচ্ছে—আসন,
চতুর্থ—প্রাণায়াম—পূরক বা শ্বাসগ্রহণ, কুম্ভক—শ্বাস ধরে রাখা, রেচক—শ্বাস ত্যাগ করা।
পঞ্চম—প্রত্যাহার
ষষ্ঠ—ধারণা
সপ্তম—ধ্যান
অষ্টম—সমাধি

মন উন্মত্ত বাঁদরের মত। অদূপরি মদ খেয়েছে এবং বোলতা দ্বারা দংশিত হয়েছে। কেবলি ইন্দ্রিয়সুখের আশায় ছটফট করছে। সে আশা পূরণ হবে কিনা, যা আছে তা থাকবে কিনা এই নিয়ে চিন্তাভাবনার আর শেষ নেই। এই অবিশ্রান্ত চিন্তাভাবনা থেকে মনকে সরিয়ে আনতে হবে। এক বিন্দুতে মনকে স্থির করতে হবে। মন

---

* **Swami Vivekananda—Raj Yoga**

ছুটে বেরিয়ে যাবে, বারবার তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এটিকেই রাজযোগে বলা হয়েছে প্রত্যাহার। প্রত্যাহার প্রতি+আহার অর্থ বারবার মনকে ফিরিয়ে আনা। একাগ্রতা ও ধ্যানের প্রথম সোপান হচ্ছে প্রত্যাহার।* মন যখন এক বিন্দুতে স্থির হয় তখন তাকে বলে ধারণা। ধারণা ঘনীভূত হলে ধ্যানের রূপ নেয়। একমাত্র চোখ বুঝলেই ধ্যান হয়না—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু থেকে মনকে সরিয়ে এনে মন এক বিষয় বা এক বিন্দুতে সন্নিবিষ্ট হলে, পরে, অবিচলিত থাকবেই তাকেই বলা হয় ধ্যান। পরিশেষে মন সম্পূর্ণ শান্ত হয়, নিজের প্রকৃত 'সত্বাকে' সে উপলব্ধি করে, মনে পরম শান্তির উদয় হয়।

মনকে স্থির করা কঠিন ব্যাপার। এজন্য সর্বাগ্রে দরকার কিছুটা সময় চুপ করে একাএকা বসে থাকা। মন যথেচ্ছ চলুক, মনের গতিবিধি লক্ষ্য করা। 'আপনি দ্রষ্টা, আপনি সাক্ষী। ঐ ভাবনা চিন্তার স্রোত থেকে আপনি সরে দাঁড়ান'। উপনিষদে ঐ দুটি ভাগকে এমন ভাবে বর্ণনা করেছে। একটি অংশ সংসারে নিমজ্জিত, অপরটি নিরপেক্ষ সাক্ষী। যেমন দুটি পাখী—একটি গাছের ডালে বসে আছে। একটি সুস্বাদু পিপ্পল ফল আহার করছে, অপরটি অনশনে থেকে তাকে নিরীক্ষণ করছে। প্রথমটি জীবাত্মা-যে সংসারের সবকিছুতেই মগ্ন, জর্জরিত। অপরটি আত্মার-স্বরূপ—'আমি কিছুর মধ্যেই নেই, জীবন নাট্যে আমি নিরপেক্ষ, নির্বিকার দ্রষ্টা।'

বাসনার মূলটি শিথিল হলে প্রত্যাহার সহজ হয়, ধ্যান ধারণার পথটি সুগম হয়।

কোন্ বিষয়ে মন একাগ্র হবে সেটি তার উপরে ছেড়ে দেওয়াই সঙ্গত। একটি উজ্জ্বল পদ্মফুল অন্তরে, হৃদয় জুড়ে মহাকাশ—এসবেতেই

---

* **Swami Abhedananda—In his Complete works.**

মন নিবদ্ধ করা চলে।*

সমাধিতে বিষয়হীন ধ্যানে মানুষ নিবিষ্ট হয়। মানুষের অহংবোধ লুপ্ত হয়। এটি অতি-চেতন স্তর। শিশুমনে অহমবোধ জন্মায়নি, তার নির্জ্ঞানে বা অস্পষ্ট চেতনায় ইদমই সব। নিজের চেতন কোন অস্তিত্ব আছে বোঝবার এমন কোন ক্ষমতাও তার হয়নি। অতিচেতন স্তর চেতনস্তরের সর্ব্বোচ্চ ও পরম পরিণতি। অতিচেতন অহমবোধ বিরহিত, জ্ঞানাতীত সর্বব্যাপী একটি চেতনার অখণ্ডরূপ। শ্রী রামকৃষ্ণ দুটি 'আমির' কথা বলেছেন, এক—কাঁচা আমি, আরেকটি পাকা আমি। কাঁচা আমি যতক্ষণ, ততক্ষণ আমি আছি, আর বহু আছেন। সুখ-দুঃখের 'কাঁচা আমি' অবিরত জর্জরিত হচ্ছে। পাকা আমি এক, তার স্বরূপ বিরাট চৈতন্যময় সত্বা। সে অদ্বিতীয়, তার দ্বিতীয় নেই। অতিচেতনের উপলব্ধির স্তরে 'কাঁচা আমি' মিথ্যা এটা প্রতিভাত হয়।

সাধনার সর্ব্বোচ্চ স্তরে সকলে উঠতে পারেনা। ঐ পথে কিছুটা অগ্রসর হলেও বহু দুর্ভাবনা দূর হয়, মন অনেকটা শান্ত হয়, শান্তিলাভ অনেকখানি সম্ভব হয়। তারও মানুষের দরকার আছে।

শ্রী অরবিন্দ যোগ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য** অস্থির মনে সাধনা সম্ভব নয়। সর্বাগ্রে দরকার—শান্তমন।

যে মনে শান্তি প্রতিষ্টিত হয়েছে, নীরবতা ও নিস্তব্ধতা মনকে আশ্রয় করেছে সেখানেই প্রকৃত চৈতন্যের উদয় হয়। মায়ের কাছে চাইতে হবে শান্ত মনের জন্য।

নীরবতা ভালো—কিন্তু শান্তমন কেবলমাত্র নীরবতা নয়। বিক্ষুব্ধ

---

* পাতঞ্জলিতে বলা হয়েছে—মোক্ষলাভের চারটি পথ:
"ঈশ্বরের ধ্যান, ঈশ্বরবাচক শব্দের জপ, মহাপুরুষের চিন্তা, যা ভালো লাগে তারই টান। পাতঞ্জলিতে পথগুলির তারতম্য করা হয়নি।

** **Shri Aurobindo—Basis of yoga**

নয়, নিয়ত বাধাবিঘ্নের দ্বারা জর্জরিত নয়, সেই স্থির মনেই শুভ পরিবর্ত্তন সম্ভব।

শান্ত চিন্তাশূন্য মনে উপর থেকে উদার শান্তি অবতরণ করে। শান্ত হতে হবে, ধীরস্থির হতে হবে, শান্তিকে আহ্বান করতে হবে। অমন মনেই প্রকৃতির কবল থেকে পুরুষ মুক্ত হয়। যে মন চিন্তার ঘূর্ণাবর্ত্তে বাস করে, কামনা বাসনায় জর্জরিত হয় সে মনের পক্ষে শান্ত হওয়া সম্ভব নয়।

চারটি জিনিষের দরকার—(১) শান্তি, (২) স্থৈর্য, (৩) অচঞ্চলতা, (৪) নীরবতা।

অচঞ্চলতার অর্থ মন অস্থির নয়, মন বিক্ষুব্ধ নয়। স্থির মন আরও অধিক অচঞ্চল। এটি ঠিক নেতিবাচক মনোভাব নয়। শান্তি আরও বেশী সদর্থক। এই মনে স্থির শান্তভাব বজায় থাকে সুষম বিরাম ও মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যায়। নীরবতা গতিচঞ্চল প্রাণ ও মন শক্তির দ্বারা পীড়িত নয়। অমন অবস্থায় অখণ্ড নীরবতা মনকে ঘিরে থাকে।

সাধনার এরাই হচ্ছে ভিত্তি। স্থৈর্য, শান্তি ও আত্মনিবেদন দিয়ে তার আরম্ভ। জ্ঞানের আলো, আনন্দের এটিই ঠিক পরিমণ্ডল। ঐ পাথেয় সত্যকে লাভ করা সম্ভব।

যে শান্তির ভাব মনে প্রবেশ করেছে তা ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হয়। নিজের অভ্যন্তরে শান্তি বাইরের সবকিছুতে অনুভব করা যায়।

শান্ত থাকা অবশ্যক। নিজেকে দৈবশক্তির কাছে মেলে ধরতে হবে। ঐখান থেকেই আসবে আলো ও শক্তির প্রস্রবণ।

অধৈর্য হবার দরকার নেই। অভীষ্টলাভে আগ্রহ আতিশয্যে মনের শান্তি ও ভারসাম্য নষ্ট করলে ভুল হবে। ক্রমে সবই আসবে। মহাশক্তিকে তার নিজের কাজ করতে দেওয়া দরকার। সময়ে সবই হবে।

বুদ্ধি, বিশেষ সামর্থ্য ঃ উনমানসিকতা

বুদ্ধি কি?

জগত সম্বন্ধে মানুষ যে জ্ঞান আহরণ করে তার প্রাথমিক তথ্য হল 'সংবেদন ও প্রত্যক্ষ'। চোখ, কান, নাক, ত্বক ও জিহ্বা এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জ্ঞান আমাদের গোচর হয়, তাদের মধ্যে নানা-ধরণের পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে। সাদাকালো উল্টোরকমের, ভিঁজে সেঁতসেঁতে একরকমের, হাতী ঘোড়া—দুই-ই-জন্তু, হাতী-ঘোড়া কুকুর পাখী পাখী অন্য তিনটি থেকে আলাদা, এমন হাজারো রকমের সম্বন্ধ তাদের মধ্যে আছে। এসব সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা বুঝিনা। এইসব সম্বন্ধকে বোঝাবার জন্য দরকার হয় বুদ্ধির। চার্লস স্পীয়ারম্যান তথ্যদের **সম্বন্ধ বোঝবার** ক্ষমতাকে 'সাধারণ সামর্থ্য' বলে অভিহিত করেছেন। অন্যান্য মনোবিদের চোখে সাধারণ সামর্থ্য বুদ্ধিরই নামান্তর।

বুদ্ধির একটি সার্বজনীন রূপ আছে। প্রত্যেক কাজের জন্য বুদ্ধি দরকার হয়—কম বা বেশী। ঘর ঝাঁট দেবার জন্য কিছু বুদ্ধির দরকার হয়, কাঠ কাটতেও। পদার্থ বিদ্যা পাঠ ও গবেষণার জন্য দরকার হয় উচ্চবুদ্ধির।

দ্বিতীয়তঃ মানুষ মাত্রেই বুদ্ধি আছে, এমনকি মানুষের মত জীবদেরও —কম বা বেশী বুদ্ধি আছে। জড়বুদ্ধি সম্পন্ন একটি ছেলের বুদ্ধি খুবই কম,—ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কবি বা সাহিত্যিক এরা উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন।

বুদ্ধি সহজাত। লেখাপড়া অর্জিত জ্ঞান। বুদ্ধি কিন্তু লেখাপড়ার

সম্ভাবনা। বুদ্ধি কম থাকলে লেখাপড়ায় ভালো হওয়া সম্ভব নয়। জড়বুদ্ধিরা লেখাপড়া একেবারেই শিখতে পারেনা। বুদ্ধিকে এ কারণে কেউ কেউ 'জ্ঞানার্জনের বিশেষতঃ লেখাপড়া শেখবার সামর্থ্য' বলে অভিহিত করেছেন।

বুদ্ধি কার কতখানি তার সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে। এমন সাফল্যের জন্য সর্বাগ্রে নাম করতে হয় ফরাসী মনোবিদ আলফ্রেড বিনে এবং সিঁমোকে। ফরাসী সরকার কর্তৃক অনিরুদ্ধ হয়ে এরা বিভিন্ন বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য বুদ্ধি অভীক্ষার প্রশ্নাবলী রচনা করেন। তিন বছর থেকে ষোল বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের উপযোগী প্রশ্নসমূহ। প্রত্যেক বয়সের জন্য সন্নিবিষ্ট করেন তিনটি থেকে ছটি প্রশ্ন। প্রস্তুত করবার পর ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত নমুনার উপর প্রশ্নাবলী প্রয়োগ করা হয়। মোটামুটি ৫০%-৭৫% পর্যন্ত সঠিক প্রশ্নোত্তর যদি কোন বয়সের ছেলেমেয়েরা দিতে পারে তবে ঐ বয়সের জন্য প্রশ্নটি উপযোগী বলে বিবেচিত হয়। শতকরা তার চেয়ে বেশী পারলে প্রশ্নটি ঐ বয়সের পক্ষে বড় সহজ, কম পারলে বেশী কঠিন। কয়েকটি বয়সে উপযোগী প্রশ্ন নীচে উল্লেখ করা হল।

বয়স ঃ

এখন সকাল না বিকেল ?
তুমি ছেলে না মেয়ে ?
আমি কয়েকটি সংখ্যা বলছি।
শোন— তারপর তুমি বলবে।

(ক) ৩ ১ ৫
(খ) ৭ ২ ৪ ৩
(গ) ৮ ৫ ৯ ১ ৬

আম ও আপেল—কোন দিক দিয়ে একরকমের ?
কাঠ ও কাঁচ—ওদের মধ্যে পার্থক্য কি ?

আমি কয়েকটি সংখ্যা বলছি। শোন, বলা হলে পর—উল্টোদিক থেকে তুমি বলবে।

(ক) ৬ ২ ৭

(খ) ৮ ৫ ১ ৯

এই সব প্রশ্ন বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের উপর প্রয়োগ করে তাদের 'বুদ্ধির বয়স' নিরূপণ করা হয়। বিনে একে 'মনোবয়স' বলে অভিহিত করেছেন। কেমন করে একটি ছেলের মনোবয়স নির্ণয়, নির্দ্ধারণ করা হয় তার একটি দৃষ্টান্ত দিই। ছেলেটির বয়স ছয়। ছেলেটি যদি সাধারণ ধরণের হয় চার বছরের ছেলেমেয়েদের উপযোগী প্রশ্ন তাকে প্রথম জিজ্ঞাসা করতে হবে। মন ও বুদ্ধির বিকাশ সবদিক দিয়ে সমভাবে হয়না। কোন একটি অংশ আগে বিকাশলাভ করে, কোন একটি অংশ পরে। বিভিন্ন অংশে সাফল্যের গড় মানটি হচ্ছে—বুদ্ধি বা সঠিক বলতে গেলে ছেলেটির মনোবয়স। ব্যাপারটি আরও একটু পরিস্কার করে বলি।

পূর্বেই বলেছি ছেলেটির জন্ম বা কাল-নির্দ্ধারিত বয়স হচ্ছে ছয় (অর্থাৎ ছয় বছর আগে সে জন্মেছে)। যেভাবে একে বুদ্ধির প্রশ্ন করা হল এবং সে ধারায় সে উত্তর দিল নীচে তা দেখানো হল ঃ

প্রশ্নাবলীর উপযোগীতা ঃ	সংখ্যা	সঠিক উত্তর	মনোবয়স
		প্রাথমিক মনোবয়স	৩
৪ বছর	৬	৫	১০ মাস
৫ ,,	৬	৫	১০ ,,
৬ ,,	৬	৪	৮ ,,
৭ ,,	৬	৩	৬ ,,
৮ ,,	৬	২	৪ ,,
৯ ,, *	৬	০	— ,,
			৬ বছর ২ মাস

* ৯ বছরের প্রশ্নের একটিও সে পারেনি। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে এর পরবর্ত্তী বয়সের কোন প্রশ্নই সে পারবেনা। আর জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই।

যেহেতু ৬ বছরের ছেলেটি সাধারণ ধরণের ৪ বছরের উপযোগী প্রশ্ন দিয়েই তার আরম্ভ হয়েছে। ধরে নেওয়া হয়েছে ৩ বছর পর্য্যন্ত সব প্রশ্নেরই উত্তর সে দিতে পারত। তার মনোবয়সে প্রাথমিক মানটা লেখা হয়েছে ৩ বছর। তৎপর ৬ বছরের ৬টি প্রশ্ন তাকে করা হয়েছে। যেহেতু প্রশ্নসংখ্যা ৬টি, প্রত্যেকটির সঠিক উত্তরের মান ২ মাস মনোবয়স। এমনভাবে বিচার করে ছেলেটির মনোবয়স দাঁড়ালো ৬ বছর ২ মাস।

বুদ্ধি বিচারে ছেলেটির বুদ্ধি সাধারণ মানের। জন্ম-বয়সের একদশমাংশ বেশী মনোবয়স হলে তাকে বলা যায় বেশী বুদ্ধিমান। আবার, একদশমাংশের কম হলে তার বুদ্ধি কম। জন্মবয়সের ± একদশমাংশ হচ্ছে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্নদের।

এবারে আরেকটি জিনিষ আলোচনা করি। ছেলেটির বয়স—ছয়, ও তার মনোবয়স নয়। স্বভাবতই সে বিশেষ বুদ্ধিমান ছেলে। প্রশ্ন করা যেতে পারে, ছেলেটির যখন দশ বছর বয়স হবে তখন তার মনোবয়স কত হবে? এই নিয়ে কি কোন ভবিষ্যৎবানী সম্ভব? তার মনোবয়স তার প্রকৃত বয়স থেকে তিন বছরের বেশী, চার বছর পরেও কি ঐ ব্যবধানই থাকবে অর্থাৎ—৯+৪=১৩ বছর হবে? না। বহুঅভিজ্ঞতার পর দেখা গেছে ব্যবধানটি অমন থাকেনা। এক থাকে মনোবয়স ও জন্ম-বয়সের অনুপাতটি। ৯ বছর ৬ বছরের দেড়গুন। এই দেড়গুণটিই এক থাকবে। ১০ জন্ম বছরের দেড়গুন হল—১৫। ছেলেটির মনোবয়স ১০ বছরে তার মনোবয়স হবে ১৫। অনুপাতটিই এক থাকে এটি আবিষ্কার করেছেন ষ্টার্ণ। সুবিধার্থে মনোবয়স/জন্মবয়স অনুপাতটিকে একটি নিত্য ১০০ দিয়ে গুন করে প্রকাশ করা হয়। তার নাম বুদ্ধ্যঙ্ক। অর্থাৎ ছেলেটির বুদ্ধ্যঙ্ক হচ্ছে—১৫০।

মনোবয়স হচ্ছে বুদ্ধি বা মানসিক বিকাশের মান, বুদ্ধ্যঙ্ক হচ্ছে ছেলেটির বুদ্ধিদীপ্তির মান, অন্যছেলেমেয়েদের তুলনায় কতখানি কম বা বেশী তার বুদ্ধি। বুদ্ধ্যঙ্ক অনুযায়ী কার কতখানি বুদ্ধদীপ্তি টারম্যান, বার্ট

প্রভৃতিরা অভিমত প্রকাশ করেছেন।

বিভাগ	বুদ্ধ্যঙ্ক	কয়েকটি অনুসন্ধানে শতকরা কত জন পাওয়া গেছে।
প্রতিভাযুক্ত	১৪০'/১৫০'র উপরে	০.৫%
উচ্চ বুদ্ধি সম্পন্ন	১২০—১৩১	৬%
বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমতী	১১১—১১৯	১৪%
সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন	৯০—১১০	৬০%
অল্প বুদ্ধি	৮০—৮৯	১৪%
প্রান্তিক উনমানসিক	৭০—৭৯	৫%
উনমানস	৫০—৬৯	নির্বোধ—১%
হীন বুদ্ধি	২০—৫৯	
জড় বুদ্ধি	২০'র নীচে	

জড় বুদ্ধিদের চেহারায় অনেক সময় মোঙ্গলদের মত, দেহাঙ্গের পারস্পরিক অসামঞ্জস্যও চোখে পড়ে।

হীন বুদ্ধিরা (২০—৪৯) লেখাপড়া শেখার অযোগ্য। তবে ঝাঁট দেওয়া, ঝারপোছ করা প্রভৃতি রুটিন মাফিক কাজের ট্রেনিং এদের দেওয়া যেতে পারে। সারাজীবন এদের অভিভাবকত্ব দরকার।

জড় বুদ্ধিদের অর্থাৎ বুদ্ধ্যঙ্ক যাদের ২০/২৫'র নীচে সারাজীবন একান্তভাবে অন্যদের উপর নির্ভর করতে হয়। ঠিকমত এরা খেতে পারেনা, জামাকাপড় পরতে পারেনা। বিপদ থেকে নিজেদের এরা রক্ষা করতে পারেনা।

এদের কারুর কারুর মধ্যে সিজোফ্রেনিয়া রোগের লক্ষণও দেখা যায়। ৬০ থেকে ৮০ বুদ্ধ্যঙ্ক ছেলেমেয়েদের কারুর কারুর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় অপরাধ প্রবণতা।

বুদ্ধ্যঙ্কর ভিত্তিতে অমন শ্রেণীবিচার চূড়ান্ত নয় এমন অনেকে মনে

করেন। গোটা মানুষকে—তার আবেগজীবন, সামাজিক আচরণ সব-কিছু একত্রে বিচার করেই সিদ্ধান্তে আসতে হবে তার ক্ষমতা অক্ষমতা কতখানি। একটি মেয়ে—বুদ্ধ্যঙ্ক তার ৫০'র কিছু বেশী—তার বিবাহ হল, শ্বশুর বাড়ীতে সে সমাদর পেল, সকলের সঙ্গে মিলেমিশে একটি সুখী পরিবারের মূল্যবান অংশীদার হিসাবে পরিণত হল। আত্মনতিতে ঐ মেয়েটির কোন অসুবিধা ছিল না। আরেকটি মেয়ে বুদ্ধ্যঙ্ক তার ৭০'র মতন। আত্মনতির ক্ষমতা তার ছিল সামান্য। একটুতেই নিজেকে সে অপমানিত বোধ করত। সে জীবনে অসুখী হল।*

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বুদ্ধিঅভীক্ষার একজনের বুদ্ধির পরিমাপ যা পাওয়া গেল সেটাই কি চূড়ান্ত? উত্তর, না। যা পাওয়া গেল তা মোটামুটি ঠিক হলেও যা পাওয়া গেলনা তা চূড়ান্ত বলে মেনে নেবার আগে আরও সতর্কতা আবশ্যক। একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাক। একটি ছেলে জন্মবয়স তার চৌদ্দ। ষষ্ঠ শ্রেণীতে সে পড়ে। দুবার পরীক্ষায় ফেল করেছে। চোখমুখ বসা, কোন কথা বলেনা। জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয় ধীরে ধীরে, কষ্ট করে, কিম্বা উত্তর দেয়ই না। হাঁটার গতি শ্লথ। পরীক্ষা করে দেখা গেল ছেলেটির মন সর্বদাই বিষণ্ণ, অবসাদগ্রস্থ। প্রশ্ন হল—এমন ছেলের সত্যিকারের যা বুদ্ধি, বুদ্ধি-অভীক্ষায় তা কি ধরা পড়েছে? খুব সম্ভবতঃ না। মনোবিদদের প্রথম কাজ ছেলেটিকে বিষাদমুক্ত করা, অন্তত বিষাদের কালো মেঘকে লঘু করা। যদি তার বিষাদ বহুলাংশে অপসারিত হয় তবে আশা করার কারণ আছে বুদ্ধি অভীক্ষায় ছেলেটির ফলাফল ভালো হবে। এমন বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। একটি ৫ বছরের ছেলে সবেতেই তার ভয়। সে সময় তার বুদ্ধ্যঙ্ক পাওয়া গেল ১১৪। তারপর ছয় মাস ধরে তার মনঃসমীক্ষা হল। দেখা গেল তার ভয় বেশ কিছুটা কমলো। বুদ্ধিঅভীক্ষায় তার বুদ্ধ্যঙ্ক

* J C Dasgupta : Social Intelligence of Mentally Deficeint Children. Journal of Social Works, Bombay.

পাওয়া গেল ১৩৪। এজন্যই কানাডিয়ান মনোবিদরা বুদ্ধিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

(১) প্রকৃত সামর্থ—বুদ্ধি-A
(২) ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবনে, কাজকর্মে লেখাপড়ায় যে বুদ্ধির সে পরিচয় দিচ্ছে তাকে বলা হয়েছে বুদ্ধি-B
(৩) বুদ্ধিঅভীক্ষা দ্বারা যে বুদ্ধির নির্ণয় করা হচ্ছে তা হচ্ছে বুদ্ধি-C।

বুদ্ধি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। তবে একটি বয়স পর্যন্ত তারপর আর বাড়েনা। সাধারণের বেলাতে বুদ্ধি ১৬ পর্যন্তই বাড়ে। প্রতিভা-যুক্ত ব্যক্তিদের বুদ্ধি বোধ হয় ১৮/২০ পর্যন্তও বাড়ে। অল্পবুদ্ধিদের বুদ্ধি বিকাশ সম্ভবতঃ ১২/১৩ তেই শেষ হয়। বুদ্ধির পূর্ণবিকাশ হবার পর সাধারণতঃ ৩৫ পর্যন্ত বুদ্ধি একই থাকে। তারপর সামর্থ্য ক্রমশঃ হ্রাস পায়। যারা চিন্তাশীল, লেখাপড়া করেন, মাথাখাটান—তাদেরও বুদ্ধি কমে, তবে তাদের বেলায় বুদ্ধি হ্রাসের গতিটি অপেক্ষাকৃত কম।

বুদ্ধি কমে একটা বয়সের পর। তবে মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এমন কি প্রজ্ঞা বাড়ে।* তদুপরি আবেগের আধিক্যের দ্বারা আগেকার মত পীড়িত না হবার জন্য বুদ্ধির অধিকতর সুষ্ঠু ব্যবহার তাদের পক্ষে সম্ভব হয়।

পূর্বে বলেছি বুদ্ধিকে স্পীয়্যারমান সাধারণ সামর্থ্য বলেছেন। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্য ও বিমূর্ত ধারণার পারস্পরিক সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতাই বুদ্ধি। কিন্তু তথ্যগুলি বিভিন্ন জাতীয়। মনোবিদরা

* প্রজ্ঞার একটি দৃষ্টান্ত দিই। বসওয়েল ডক্টর জনসনকে বাড়ীতে খাবার নেমতন্ন করেছেন। বাড়ীর কর্ত্রীর হটাৎ মেজাজ বিগড়ে যাওয়ায় বসওয়েল তড়ি ঘড়ি একটা হোটেলে ওদের নিয়ে গেলেন। তারপর বিষন্ন মুখে আজকের 'এই নিদারুণ' ঘটনার জন্য তিনি ডক্টর জনসনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। প্রশান্ত মুখে ডক্টর জনসন বললেন—"ভাবুনত যাকে আপনি নিদারুণ বলছেন—একবছর পর তাকে আপনার কত অকিঞ্চিৎ বলে মনে হবে।"

তাদের নিম্নোক্তভাবে তাদের নামকরণ করেছেন।

	দৃষ্টান্ত ঃ
(১) বাচনিক সামর্থ্য	অন্ধকার আলো—উল্টোরকমের
(২) আঙ্কিক সামর্থ্য	১, ২, ৪ তারপর ?
(৩) স্থানিক সামর্থ্য	ডান হাত দেখাও, বাঁ কান দেখাও।
(৪) শব্দ স্ফূর্তি	অনর্গল কথা বলবার ক্ষমতা
(৫) স্মৃতি	
(৬) যান্ত্রিক ক্ষমতা	
(৭) যুক্তি বিচার ঃ	
(ক) আরোহ বিচার—	রাম মরে, শ্যাম মরে ইত্যাদি, রাম শ্যাম এরা সবাই মানুষ। অতএব মানুষ মরণশীল।
(খ) অবরোহ বিচার—	মানুষের রাগ আছে। কৃষকেরা মানুষ অতএব কৃষকদের রাগ আছে।

যে বুদ্ধি অভীক্ষার দ্বারা বুদ্ধি সঠিক পরিমাপ করা হয় তা সাধারণত বাচনিক ও আঙ্কিক তথ্যদ্বারা সাধারণ সামর্থ্যের পরিমাপ। এটা সহজেই বোধগম্য কারুর বাচনিক বা আঙ্কিক সামর্থ্য যদি কম হয় তবে সেটি বুদ্ধির পরিমাপেও প্রতিফলিত হবে। বাচনিক ও অঙ্কিক সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার ফলে বুদ্ধির পরিমানও কম পাওয়া যাবে। অমন ক্ষেত্রে কর্ম অভীক্ষার দ্বারা বুদ্ধি পরিমাপ করার প্রয়োজন আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন।

তবে বাচনিক বুদ্ধি অভীক্ষা যতখানি নির্ভরযোগ্য কর্মঅভীক্ষা ততখানি নির্ভর য়োগ্য নয়। বিশেষত্য লেখাপড়ার সঙ্গে কর্ম অভীক্ষার পারস্পর্যের পরিমান কম। একটি অনুসন্ধানের ফল উল্লেখ করি। পাসএ্যালং কর্মঅভীক্ষার ৬০টি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের লেখাপড়ার সাফল্যের পারস্পর্যের পরিমান পাওয়া গেল +৩, একটি বাচনিক বুদ্ধি-অভীক্ষার সঙ্গে + ৬৫।

বুদ্ধির সঙ্গে মানুষের আবেগ জীবনের একটি সম্পর্ক আছে। মানসিক রোগীদের দৈনন্দিন কাজকর্মে যে বুদ্ধির প্রকাশ, বুদ্ধিঅভীক্ষার দ্বারা যা সত্য তা যথার্থ কিনা নিশ্চয়ই প্রশ্ন করা চলে।

অল্পবুদ্ধি এবং উনমানসদের আবেগ জীবনে ক্রটী ও সহায়তার পথ

জড় বুদ্ধি ও হীনবুদ্ধি যার তারা যে অপরের মত পারেনা, এটা বোঝার ক্ষমতা তাদের কম। উনমানস যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৫০ থেকে ৬৯'র মধ্যে তাদের বেলাতে কিন্তু একথা সত্য নয়। তারা পারছেনা, লোকে তাদের ছোট ভাবছে এমনকি মন্দ মনে করছে নিজেদের মধ্যেও তাদের অমন ধারণাটি সংক্রমিত হয়। অনেকসময় দেখা যায় এদের রাগ এবং জেদ বেশী হয়, কিছুটা আমরা যা খুশী করব এমন একটা মনোভাব। এদের কারুর কারুর জীবনে বিবেকের অনুশাসন দুর্বল, এরা সুখী নয়। এদের বড়দের বিশেষ সাহায্য দরকার। অনেকখানি সহানুভূতি ও অপরিসীম ধৈর্যের দ্বারাই এদের দুর্ভাগ্য ও দুঃখকে কিছুটা নিরসন করা সম্ভব। এদের যদি অসমঞ্জস আচরণ করেও তার কারণ বুঝতে হবে, সে সবকেও সহজচিত্তে মেনে নিতে হবে, এদের ভালোবাসতে হবে। ভালবাসাই এরা বাঁচিয়ে রাখছে। এদের পক্ষে সহজ ও সরল কাজের কিছুটা ট্রেনিং গ্রহণ করা সম্ভব। জীবিকা অর্জনের কিছু পথ যদি এরা পায় তবে এদের দেহ ও মন দুইই ভালো থাকবে।

ঠিকমত ট্রেনিংয়ের ফলে এদের বুদ্ধি ও কিছুটা বাড়ে ডানকান* তার গবেষণার ভিত্তিতে অমন দাবী করেছেন। তাদের উপযুক্ত কাজের দ্বারা যেটুকু সুস্থ আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাবে তা নিশ্চয়ই মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার কিছুটা সহায়তা করবে। তাদের জীবনে সুপথের দরজা খুলে দেবে।

* **Duncan—Educations of the ordinary Child.**

শিক্ষায় অনগ্রসরতা

ডক্টর লিভিংষ্টোন বহুদিন আফ্রিকার জঙ্গলে আদিমবাসীদের সঙ্গে বসবাস করেছিলেন। তার ঘরে বসে একদিন তিনি একখানি বই পড়েছেন—জানালা দিয়ে ওদেশের কয়েকজন লোক তাই দেখে লিভিং-ষ্টোনকে জিজ্ঞাসা করলেন—ওটা কি দাওয়াই ? ওর উপকারিতা কি—ওটা তারা পেতে পারে কিনা ! ঐ অঞ্চলের লোকেরা লেখাপড়াটা কি তা জানত না—বই বস্তুটি কি সেটা তাদের অজ্ঞাত। ভারতবর্ষে বিশেষতঃ কোন কোন পাহাড়ি অঞ্চলে এমন অবস্থা বিদ্যমান, আমেরিকাতেও।

কিন্তু যে সভ্যতায় আমরা বাস করি তার একটা সংস্কৃতি আছে। বহুকাল ধরে মানুষ বংশপরম্পরায় যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে—প্রথমে পাথরের গায়ে উৎকীর্ণ করে, তারপর তালপাতায় লিপিবদ্ধ করে, অবশেষে বইতে লিখে, ছাপিয়ে মানুষ তার জ্ঞানের ভাণ্ডার সঞ্চিত করেছে। একটি শিশু জন্মালে পর তার পিতামাতা তাকে এ সমাজের উপযুক্ত নাগরিক করে গড়ে তোলবার জন্য সচেষ্ট হন। একটু বড় হলে তাকে লেখাপড়া শিখতে হয়। মানুষের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারের দরজা তার কাছে উন্মুক্ত হয়, তার দৃষ্টি অতীত থেকে ভবিষ্যৎ, পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়। দর্শন বিজ্ঞানের জ্ঞান সে আয়ত্ত করে, টেকনিক্যাল নৈপুণ্যেরও সে অধিকারী হয়। লেখাপড়া তাকে শিখতেই হবে।

বড়দের স্বপ্ন ও সাধনা ছোটদের তারা বড় করবেন, মানুষ করবেন, শিক্ষিত করবেন। এর জন্য সর্বাগ্রে আবশ্যক শিশুদের নিজেদের

লেখাপড়া শেখবার ইচ্ছা। এ ব্যাপারে বড়দের কিছু ভূমিকা আছে। শিশুদের মনে তারা প্রেরণা যোগাতে পারেন। সৌভাগ্যক্রমে অধিকাংশ শিশুই বড়দের ইচ্ছায় কমবেশী সাড়া দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিশুর ইচ্ছাটাই আসল। নিজের ইচ্ছা ছাড়া কেউই লেখাপড়া শিখতে পারেনা।

শিশুর ইচ্ছা আছে তবুও শিশু পারছেনা এমনও দেখা যায়। কিছু কিছু ছেলেমেয়ে আছে সব বিষয়েই যারা কাঁচা। জন্মবয়স অনুযায়ী যে শ্রেণীতে তাদের পড়া উচিত তার থেকে দুবছরের নীচের শ্রেণীর পাঠও এরা আয়ত্ত করতে পারেনা। পরীক্ষায় ফেল করে। এদের বলা হয় "শিক্ষায় অনগ্রসর-শিশু"। বুদ্ধি পরিমাপের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। 'মনোবয়স' ও 'বুদ্ধ্যঙ্ক' কথা দুটির সঙ্গে পাঠকপাঠিকাবর্গ পরিচিত। এখানে শিক্ষাপরিমাপের কথা বলা দরকার। আট বছরের শিশুদের পড়বার কথা তৃতীয় শ্রেণীতে। ঐ শ্রেণীর পাঠ তারা মোটামুটি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারবে, অঙ্ক, মাতৃভাষা, সমাজ, ইংরাজী পড়ানো হলে ইংরাজী তারা ভালোভাবে শিখেছে। মোটামুটি ভালো নম্বরও পাচ্ছে। ভালো, মন্দ, মাঝামাঝি—এমন বেশ কিছু সংখ্যক স্কুলের ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষার জন্য একটি করে প্রশ্নাবলী রচনা করে বিভিন্ন স্কুলের ছেলেমেয়েদের উপর প্রয়োগ করে তাদের প্রাপ্ত নম্বরের গড় নম্বর যা হল ঐ বয়সের ছেলেমেয়েদের তাই গড় মান। সমস্ত বিষয়ের গড় মান যোগ করে—বিষয় সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে আমরা পেলাম—ঐ বয়সী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার গড় মান। অর্থাৎ আট বছরের ছেলেমেয়েরা যদি অমন নম্বর পায় তাদের শিক্ষাবয়স হবে আট। শিক্ষাঙ্ক নির্ণয়ের পদ্ধতিটি বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয়ের অনুরূপ।

সূত্রটি হল :

$$\text{শিক্ষাঙ্ক} = \frac{\text{শিক্ষাবয়স}}{\text{জন্মবয়স}} \times ১০০$$

বয়স যদি আট হয়, শিক্ষাবয়সও যদি আট হয় তবে তার শিক্ষাঙ্ক

৮/৮×১০০=১০০ হবে। অমন ছেলেটিকে ধরা হবে সাধারণ—পড়াশোনায় ভালোও নয় আবার মন্দও নয়।

শিক্ষার পুরোদস্তুর অনগ্রসর না হলেও অনেক ছেলেমেয়েরা পড়াশোনায় অসুবিধায় ভোগে। ক্লাশে ফেল করছে, কিংবা বারবার ফেল করছে তাদের নিয়েও আমাদের দুশ্চিন্তা আছে। 'শিক্ষায় অনগ্রসরতা' বাস্তবিকই একটি বিশেষ দুর্ভাগ্য। মনোবিদদের প্রশ্ন—ছেলেটি অনগ্রসর কিম্বা টেকনিক্যাল ভাষায় অনগ্রসর না হলেও পড়াশোনায় যথোচিত পারছেনা—এসবের কারণ কি, প্রকৃতই কিসের তার অভাব? মনোবয়স যদি তার জন্মবয়স থেকে উল্লেখযোগ্য ভাবে কম হয় তবে মনোবিদ ও শিক্ষাবিদরা কিছুটা নিরুপায়। অমন ছেলেমেয়েদের শিক্ষার মান বাড়ানো যাবেনা। তবে ঐসব ছেলেমেয়েদেরও করেকর্মে খেতে হবে। লেখাপড়া শিখে তারা জীবিকা অর্জন করবে এমন আশা না করাই সমীচীন। অন্য কি ধরণের কাজ তাকে শিখতে হবে, সে করতে পারবে তাই নিয়ে ভাবতে হবে।

এমনও দেখা গেছেও বুদ্ধির দৈন্য নেই, তবুও লেখাপড়ায় সে কাঁচা। তার কারণ নিয়ে সর্তক অনুসন্ধান করতে হবে। কিছুকিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে শিক্ষা দেবার দায়িত্ব যাদের, তারা হৃদয়হীন। ছেলেমেয়েরা পারল না এটাকেই তারা বড় করে দেখেন, ছেলেমেয়েদের পারাটাকে তারা আমলে আনেন না। দোষ ধরা, খুঁত ধরা যাদের মজ্জাগত তেমন শিক্ষকশিক্ষিকারা ছোটদের অনিষ্টই করেন। শিক্ষক-শিক্ষিকা হতে হলে সর্বাপেক্ষা দরকার হল ছোটদের ভালোবাসা, ছোটদের গুণগ্রাহী হওয়া, তাদের প্রশংসা করা। স্বামী-বিবেকানন্দ আমেরিকার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে মন্তব্য করেছিলেন গুণগ্রহিতা, অজস্র প্রশংসায় মানুষের অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগরিত হয়। শিক্ষক শিক্ষিকাদের পিতামাতার মত সংবেদনশীল হতে হবে, লেখাপড়ায় ছেলেমেয়েদের অফুরন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগাতে হবে, ছেলেমেয়েদের ভুলের চেয়ে বড় করে দেখতে হবে তাদের পারদর্শিতাকে।

ছোটদের বইয়ের অভাব, বসে পড়ার উপযুক্ত জায়গা না থাকলে, গৃহে শান্তির পরিবেশ না থাকলে লেখপড়ার সাফল্যে তা প্রতিফলিত হবে তাতে আর আশ্চর্য কি আছে!

সাধারণ বুদ্ধির অভাব হলে ছেলেমেয়েরা প্রায় সববিষয়েই অপটু হয়, অনগ্রসর হয়। একে বলা হয় 'সার্বিক অনগ্রসরতা'। তবে এমন দৃষ্টান্তই বেশী যেখানে একটি বা দুইটি বিষয়েই কাঁচা, অন্যান্য বিষয়ে তেমন নয়। কোন বিষয়ে শিক্ষায় অসুবিধা বাড়াবাড়ি রকমের হলে তাকে বলা হয় 'বিশেষ অনগ্রসরতা'। অঙ্কে অসুবিধা রয়েছে এমন হামেশাই পাওয়া যায়। এবিষয়ে অনুসন্ধানের পদ্ধতিটি হচ্ছে প্রথমে সাধারণ বুদ্ধির পরিমাপ করা। বুদ্ধি যথেষ্ট না থাকলে বিশেষতঃ প্রশ্নের অঙ্ক ছেলেমেয়েরা কষতে পারেনা। বুদ্ধি খুব কম না হলে, ছোটছোট দৃষ্টান্ত সহকারে ধীরে ধীরে তাকে অঙ্কের পদ্ধতিটি বোঝালে কিছুটা সুফল পাওয়া যায়। অঙ্কে চর্চা ও অভ্যাসের স্থান খুব উচ্চ। 'কারণ-নির্ণায়ক' বলে একধরণের অভীক্ষা ছেলেমেয়েদের শিক্ষার অসুবিধা ব্যাপারে মনোবিদ ও শিক্ষাবিদরা প্রয়োগ করেন। এমন অভীক্ষার বিষয়টিতে কি কি পারদর্শিতা আবশ্যক সর্বাগ্রে বিশ্লেষণ করে, প্রত্যেক অংশের জন্য উপযুক্ত অভীক্ষা যোজনা করা হয়। ইংরাজীতে বয়সোপযোগী বুৎপত্তি হল কিনা দেখতে হবে ছেলেটি পড়তে পারে কিনা, লিখতে পারে কিনা, ছোট ছোট রচনা লিখতে পারে কিনা, বানান জানে কিনা, ইংরাজীতে কথা বলতে পারে কিনা, আবার ইংরাজীতে কেউ কথা বললে তা বুঝতে পারে কিনা। পাটিগণিতের জন্য কারণ নির্ণায়ক অভীক্ষা প্রস্তুত করতে হলে অঙ্ককে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে নিতে হবে। যোগ থেকে বর্গমূল কষা, প্রত্যেক অংশের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক প্রশ্নাবলী রচনা করতে হবে। অঙ্কে সাফল্যে কয়েকটি জিনিষের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। ছেলে-মেয়েরা প্রত্যেক অংশে গণনা নির্ভুল করছে কিনা, কিম্বা তাদের ভুলের পরিমান কতটা, পদ্ধতি জানে কিনা, পদ্ধতির অন্তর্নিহিত অর্থটি তাদের

হৃদয়ঙ্গম হয়েছে কিনা। কিছু কিছু ছেলেমেয়ে দেখা গেছে—অঙ্ক বুঝতে পারে, পদ্ধতিও জানে, কিন্তু গণনায় অনবরত ভুল করে। গণনা নির্ভুলভাবে করবার জন্য আবশ্যক অভ্যাস, নিরন্তর অভ্যাস।

পড়াশেখার ব্যাপারে দু-একটি কথা বলি। এমন কেউ কেউ আছে যারা ভালো করে পড়তে পারেনা। তেমন ছেলে তার পাঠের অর্থ বুঝবে কি করে। আবার আরেকজন গড়গড় করে পড়ে গেল কিন্তু তার কোন মানে তার হৃদয়াঙ্গম হলনা। পাঠে দক্ষতার জন্য দুটি জিনিষ দরকার :

(১) সুষ্ঠু পাঠ

(২) পঠিত অংশকে হৃদয়ঙ্গম।

শব্দার্থ, বাক্যের মানে, পংক্তির মানে এবং গোটা লেখাটির অর্থ। ভালো করে পড়তে হলে দরকার (ক) নির্ভুল পাঠ (খ) দ্রুতপঠন। নীরব পঠনের ক্ষমতা অর্জন করেই দ্রুত পাঠ করা সম্ভব হয়।

ঐসব কারণ নির্ণায়ক অভীক্ষার সাহায্যে খুঁজে বার করা সম্ভব কোথায় ছেলেমেয়েটির অসুবিধা। লেখাপড়া—বিশেষতঃ অঙ্ক, ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শিতার কতগুলি ধাপ আছে। প্রথমটি সুষ্ঠু সম্পাদন না করতে পারলে দ্বিতীয়টি পারা সম্ভব নয়। যোগ বিয়োগ না জানলে তার পক্ষে গুণ ও ভাগ শেখা সম্ভব নয়। পড়তে যে পারেনা সে পড়ার মানে বুঝবে কি করে! ছেলে বা মেয়েটিকে আলাদা করে নিয়ে তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে তাকে সবিশেষ শিক্ষা দিলে পর—বুদ্ধি যদি খুব কম না হয়, আবেগজীবন যদি গভীরভাবে আচ্ছন্ন না হয়—সুফল নিশ্চয়ই ফলবে।

শিক্ষায় অনগ্রসর ছেলেমেয়েদের এবং পিতামাতার বিশেষ দুঃখের কারণ। এরই সঙ্গে অধিকাংশ জড়িত হয় ছেলেমেয়েদের প্রতি পিতা-মাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মনোভাব। বুদ্ধি কম বলে এরা পারেনা, পারবে না। কিন্তু তারা পারছেনা বলে যদি তাদের দিবারাত্র লাঞ্ছিত

হতে হয়, ধিক্কার শুনতে হয় তবে ধীরে ধীরে তাদের ধারণা হবে তারা সত্যিই হীন, সত্যিই মন্দ। অনেক অভিভাবকেরাই মনে করেন ছেলে-মেয়েরা ইচ্ছা করলেই পারত, কিন্তু তাদের ইচ্ছা নেই, তেমন চেষ্টা নেই তাই তারা পারছেনা। 'অমুকে পারে, তোরা কেন পারছিস না'—এটা বিশেষ করে বড়দের মুখে লেগেই থাকে। এটা বড়দের বোধগম্য হয়না যে সবাই সমান নয়, কেউ কেউ একান্তই অক্ষম। বড়দের কাছ থেকে ঐ সব ছেলেমেয়েরা অবজ্ঞা, এমনকি ঘৃণা লাভ করে। বড়দের কাছ থেকে ঘৃণা লাভ করার ফলে ছেলেমেয়েরা নিজেদের ঘৃণা করতে শেখে। ঐসব ছেলেমেয়েরা মানুষের শুভেচ্ছা সম্বন্ধে বহুলাংশে বিশ্বাস হারায়। তাদের ধারণা জন্মে মানুষ নিষ্ঠুর, দয়ামায়া শূন্য, তাদের কেউ ভালবাসেনা। নিজেকে যারা ঘৃণা করে, অন্যদের যারা ঘৃণা করে—তাদের মানসিক সুস্থতা কোথায়! এই ঘৃণার হাত থেকে তাদের বাঁচাতে হবে। যে কাজ তারা করতে পারে, যে কাজের জন্য তারা উপযোগী সে কাজ তারা করুক, সে কাজ করতে শিখুক। মানসিক স্বাস্থ্যবিদদের ধারণা—কাজই হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে সর্বোত্তম টনিক। এটা ঠিক—এরা কেউ কেউ তেমন ভালোভাবে কোন কাজ করতে পারবেনা। তবে তাকেও সহানুভূতির সঙ্গে মেনে নিতে হবে, তাদের অসুবিধা বুঝতে হবে।

অনগ্রসর ছেলেমেয়েদের দরকার বড়দের কাছ থেকে অপরিমিত স্নেহ ও উৎসাহলাভ। যেটুকু তারা পারে তার জন্যও এই সহানুভূতি-বিবর্জিত সংসার সে প্রশংসাটুকুও তারা পায়না। অধিকাংশ অনগ্রসর শিশু 'শিক্ষায় মন্দিত'।* অনুকূল পরিবেশ পেলে যতটুকু তাদের সামর্থ্য—তদানুযায়ী শিক্ষালাভ তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। সর্বোপরি দেখা প্রয়োজন নিজেদের তারা যেন গ্রহণ করতে পারে। অন্যেরা যা পারে—পারুক। সহজে, স্বেচ্ছায় সেটা যেন তারা মেনে নিতে পারে সে বিষয়ে বড়দের সচেষ্ট হতে হবে।

* শিক্ষায় মন্দিত মানে হচ্ছে তাদের সাফল্যাঙ্ক ১০০'র চেয়ে যথেষ্ট কম। সাফল্যাঙ্ক হচ্ছে মনোবয়স শিক্ষাবয়স × ১০০। ধরা যাক একটি ছেলের মনো-বয়স দশ কিন্তু শিক্ষাবয়স সাত। সেত নিশ্চয়ই একটি মন্দিত শিশু।

সফল বিবাহ

বিবাহে সফল হওয়া, বিবাহে সুখী হওয়া—জীবনের একটি পরম বস্তু। অসার্থক বিবাহে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অশান্তিতে পুড়ে মরে। এক হলে ঐ দুঃখ নির্বাক, অন্তরে দুঃখের তুষানল জ্বলে—না হলে গৃহে স্বামী-স্ত্রীর নিরন্তর ঝগড়াঝাটি এমন কি মারামারি পর্যন্ত হয়। যে বিবাহে দুটি মনের মিল আছে তা স্বর্গতুল্য। যে বিবাহে কোন মিল নেই তা নরকসদৃশ। বিবাহে শান্তির অভাব হলে কেউ কেউ বিবাহ বিচ্ছেদের পথ বেছে নেয়, কিংবা একজন অপরজনকে ত্যাগ করে। কিংবা দুজনেই দুজনকে ত্যাগ করে। আইনের চক্ষে প্রথমটি আইনসম্মত আলাদা থাকা, অপরটি বিবাহবিচ্ছেদ। স্বামী-স্ত্রী আলাদা থাকে না, একই গৃহে বসবাস করছে এমন বিবাহ মাত্রই সুখী একথা সত্য নয়। অনেকেই আছেন যারা নিজেদের কষ্ট ও গ্লানি মুখ বুজে সহ্য করেন। প্রশ্ন করা চলে শতকরা ক'জনের বিবাহকে সুখী ও সফল বলা চলে?

বিবাহিত জীবনে সাফল্য ও ব্যর্থতা

বর্ত্তমান সমাজে স্বামী স্ত্রী নির্বাচনের দুটি পদ্ধতি আছে। একটিতে ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে জেনেশুনে ভালবেসে বিবাহ স্থির করে। এসব ক্ষেত্রে অভিভাবকদের অনুমতিও বেশীর ভাগ নেয়; অপরটি পিতামাতাই কার সঙ্গে কার বিয়ে হবে, দেখেশুনে স্থির করেন। ঐ ব্যাপারে সাধারণতঃ পিতামাতারা ছেলেমেয়েদের বংশ পরিচয় নেন, ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য, তারা দেখতে কেমন, তাদের শিক্ষাদীক্ষা, ছেলের উপার্জনশীলতার খবর নেন। ছেলেমেয়েদের সংস্কৃতিগত মিল, অর্থসঙ্গতির মিল ও কিছুটা দেখা হয়। বড়লোকের মেয়ে গরীবের ঘরে গিয়ে কষ্ট পাবে, প্রগতিপন্থীদের ঘরে

স্বামী-স্ত্রীর নির্বাচন পদ্ধতি

প্রাচীনপন্থী ঘরের ছেলেমেয়েরা তেমন খাপখাওয়াতে পারবেনা এসব কথাও ভাবা হয়। জাতের কথাও অনেকে ভাবেন, ধর্ম ও প্রাদেশিকতার কথাত আছেই। পিতামাতারা কেউ কেউ কোষ্ঠিবিচারে বিশ্বাস করেন। মেয়ের সপ্তমে রবি ও মঙ্গল আছে কিনা, উভয়ের রাশিতে রাজযোটক হয়েছে কিনা এসব বিবাহ পাকা করার আগে তারা ভেবে দেখেন। এসব ফলাফল নিয়ে কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। তবে এসব প্রচলিত বিশ্বাসের কিছু মূল্য আছে এমন মনে করা অসঙ্গত হবেনা।

বিবাহের কারণ : কাম পরিতৃপ্তি

কেন লোকে বিবাহ করে, বিবাহের জন্য কি কি গুণাবলী আবশ্যক, কোনটির অভাব সুখী বিবাহের অন্তরায়—এসব বিবেচনা করে বিষয়টির অবতারণা করব।

আইনসম্মত, সমাজস্বীকৃত যৌন সম্পর্কের জন্যই মানুষ বিবাহ করে একথা বললে বিশেষ অত্যুক্তি হবেনা। এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করতে তিনি সোজাসুজি বললেন "যৌন প্রয়োজনেই আমি বিবাহ করেছি।" দু-বছর বিবাহিতা একটি মেয়ে বললেন—"দেখছি বিবাহ অবাধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের লাইসেন্স।"

বহুপূর্বে এককালে যৌন কাজের উপর সমাজের কোন বিধিনিষেধ ছিল না। তারপর একদিন যৌনজীবনের উপর সামাজিক বিধিনিষেধ আরোপ করা হল, বিবাহের প্রবর্ত্তন হল। যুগেযুগে বিবাহের রূপ বদলে গেলেও তদানীন্তন কালের বিবাহের দ্বারা যৌনস্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হত।

কাম পরিতৃপ্তির স্থান বিবাহজীবনে যদি এত বড় হয় তবে পুরুষ ও নারীর যৌন অক্ষমতা কাম জীবনকে পর্যুদস্ত করবে, বিবাহকে বিপন্ন করবে—একথা বলা চলে। বিবাহ বিচ্ছেদের ধারায়—যৌন অক্ষমতাকে একটি যথেষ্ট কারণ বলে বলা হয়েছে।

যৌন সংসর্গ ঘটে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ইচ্ছায়, বিশেষতঃ স্বামীর ইচ্ছায়। স্বামীই উদ্যোগী হয় স্ত্রী সম্মতিজ্ঞাপন করে। পুরুষত্বহীন স্বামী

অমন কাজে ব্রতী হতে পারেনা। যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা তার মধ্যে অভাব। কিছু কিছু স্ত্রী আছেন কামশৈত্যে তারা ভোগেন। তাদের মধ্যে কামইচ্ছা, কাম উত্তেজনা নেই, কিম্বা প্রায় নেই বললেই চলে। তবে স্ত্রী'র কাজটি যেহেতু গ্রহণ, স্ত্রী'র ইচ্ছা অনিচ্ছাকে গ্রাহ্য না করে পুরুষ সংসর্গ করছে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে। স্বামীর অনিচ্ছায় ও অক্ষমতায় যৌন সংসর্গ একান্তই অসম্ভব। একারণে বিবাহ-বিচ্ছেদের আইনে পুরুষের ধ্বজভঙ্গ বা পুরুষত্বহীনতাকেই বড় করে দেখা হয়েছে।

পুরুষ ও নারীর কাম ইচ্ছা সবসময়েই সমান হয় না। পুরুষ বেশী চায় নারী কম চায়, কিম্বা নারীর আকাঙ্খা বেশী, পুরুষের কম। পার্থক্যটি খুব বেশী না হলে বিবাহিত জীবনে তা অশুভ রেখাপাত করে এমন পাওয়া যায়নি। স্মরণ রাখতে হবে দুটি যৌন অঙ্গের মিলনই বিবাহিত জীবনের শেষ কথা নয়। বিবাহ দুটির নরনারীর মিলন। দুটি অসমান কামনাবাসনা সত্বেও স্বামী স্ত্রী উভয়েই বিবাহিত জীবনে সুখী এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে। অসমতা খুব বেশী হওয়াটা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়। তবে অমন অসাম্য কমিয়ে আনা অনেকটা স্বামী স্ত্রী'র নিজেদের হাতে।

স্ত্রীকে যে স্বামী ভালোবাসে স্বার্থপরের মত কেবলমাত্র নিজের যৌনসুখে সে পূর্ণতৃপ্তি লাভ করে না। সে নিজের সুখ চায় তেমনি চায় তার স্ত্রী'র সুখ। এ সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবির দুটি লাইন উল্লেখযোগ্য—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলে কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

এ সম্বন্ধে একটি গভীর বিচারও করা যেতে পারে। পুরুষের মধ্যে (নারীর মধ্যেও)—দুটি সত্বা আছে। একটি পুরুষসত্বা ও অপরটি স্ত্রীসত্বা। পুরুষ বিবাহের পর তার নিগূঢ় স্ত্রীসত্বাকে তার স্ত্রী'র উপর আরোপ করে। তার স্ত্রীর সুখে তার স্ত্রী সত্বা সুখী হয়। যৌন সংসর্গে

সে যেমন চায় তার পুরুষত্বের সুখ, তেমনি চায় তার স্ত্রী'র মধ্য দিয়ে তার নিজের স্ত্রী সত্ত্বের সুখ। সে অনুভব করে—

'আমার সুখ আমার সুখ
তোমার সুখও আমার সুখ।'

কাম ও প্রেমের সমন্বয়ে আধুনিক মানুষের যৌনজীবনের পূর্ণতা সাধিত হয়েছে।

যারা একান্তরূপে স্বার্থপর, কিছুটা নিষ্ঠুরও—এ সত্যের মর্ম তারা বুঝবেন না। অমন পুরুষের নারীত্ব বোধ হয় গভীর ভাবে অবদমিত।

বিবাহিত জীবনের সুখ ও যৌনসুখ

বিবাহিত জীবনের সুখ ও যৌনসুখ দুটি এক নয়। দুটি মানুষের মধ্যে অনেকরকম সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। তারা দুজন একই ভাগ্যের অধিকারী, একই সন্তানের পিতা-মাতা, একই রকমের তাদের আশা আকাঙ্খা, আগ্রহ ও অনুরাগ তাদের অনেকাংশে এক। বিবাহিত সুখ বলতে সামগ্রিক সুখকেই বোঝায়। এই সামগ্রিক সুখই বিবাহিত জীবনে বড় কথা। আমেরিকান দম্পতিদের নিয়ে বিবাহের সুখিত্ব সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান টারম্যান* করেছিলেন। বিবাহ বিচ্ছেদ ভবিষ্যতে ঘটবে কিনা এ প্রশ্নের উত্তর তিনি তাঁর অনুসন্ধানে খুঁজেছিলেন। এটুকু তিনি পেলেন—দুটি জিনিষ আছে—একটি বিবাহিত জীবনের সুখিত্ব, অপরটি নরনারীর যৌনসুখ। বিবাহ স্থায়ী হবে কিনা এ ব্যাপারে যৌনসুখের উপর ভিত্তি করে কোন ভবিষ্যৎ-বাণী করার চেয়ে বিবাহিত জীবনের সুখিত্বর উপরে ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ-বাণী বেশী সত্য হয়। বিবাহিত সুখ ও যৌনসুখের পারস্পর্যের সহজাঙ্ক উনি পেয়েছেন পুরুষের বেলাতে .৪০, আর নারীদের বেলাতে .৪৩। যৌন অক্ষমতা যৌনতৃপ্তি লাভের সম্ভাবনা এবং বিবাহিত সুখকে বহুলাংশে

* Terman L

বিপর্যস্ত করে। কিন্তু মোটামুটি যৌনক্ষমতা যেখানে বর্তমান—সেসব জীবনে যৌনসুখের সঙ্গে বিবাহিত সুখের সম্পর্কটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। ঐ দুটি .৪০/.৪৩'র দ্বারা এই উক্তিই সমর্থিত হচ্ছে।

বিবাহিত জীবনের সুখ কি?

প্রশ্ন করা যেতে পারে—বিবাহিত জীবনের সুখ কি? বিবাহিত সুখ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রাচ্য বিশেষতঃ ভারতবর্ষের স্বামীস্ত্রীর মধ্যে যে বোধটা গড়ে ওঠে সেটাই আমাদের আলোচনার প্রধান বিষয় হবে। একথার মানে এই নয়—অন্যদেশে বিবাহিত জীবনের সুখ সর্বাংশে অন্যরকমের। সব বিবাহের একটি মূল ঐক্য আছে—কিছুটা পার্থক্য সত্বেও।

বিবাহ দুটি নরনারীর ভাগ্যকে এক করে। সংসারে, সন্তানসন্ততি, আত্মীয়স্বজন এমনকি বন্ধুবান্ধব পর্যন্ত। 'ভাগ্যের ঐক্য' বিবাহিত নরনারীর মধ্যে ঘটে, দ্বিতীয়তঃ মনের গভীরে অধিকাংশই মনে করে—তারা দুইয়ে মিলে এক। বাংলায় স্ত্রীকে বলা হয়—অর্দ্ধাঙ্গিনী, ইংরেজিতে বলে Better half! দুইয়ে মিলে তারা পূর্ণ, একজনের অভাব আরেকজন ভগ্নাংশ। গভীরমনে বেশীর ভাগ মানুষই নিঃসঙ্গ, একা। এই একাকিত্ব বিবাহ বহুলাংশে ঘোচায়। স্বামীর কাছে স্ত্রী, স্ত্রী'র কাছে স্বামী অনন্য। নারীর প্রতি পুরুষের উক্তিকে এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'সহস্রজনের আমি একজন ছিলাম অপরিচয়ের মূল্যহীনতায়। তোমার প্রেমে নিজেকে আজ আমি সম্রাট বলে অনুভব করছি।' প্রেমে, বিবাহে মানুষ নিজের মূল্য নিজে ফিরে পায়। সংসারে সত্যকারের মূল্য কেউ কি দিতে জানে! ভালোবাসাই মানুষকে মূল্য দেয়, মর্যাদা দেয়, তার আত্মোপলব্ধির সহায়তা করে।

মৌলিক সুখিত্ব ও বিবাহিত সুখ

আরেকটি অনুসন্ধানে যা পাওয়া গেছে—তা উল্লেখ করি। বিবাহ দুটি মানুষের মধ্যে বন্ধন। দুটি বিভিন্ন মন, দুটি বিভিন্ন মানসপ্রকৃতি নিয়ে তারা বিবাহে আবদ্ধ হয়। বিবাহ-পূর্ব জীবনে ওরা যদি সুখী থেকে থাকে দেখা গেছে

বিবাহের পরও তারা সুখী হয়। বিবাহ-পূর্ব জীবনে যারা অসুখী ছিল—দেখা গেছে বিবাহিত জীবনেও তারা প্রায়ই অসুখী। বিবাহের দ্বারা অসুখী মন সুখী হল, কিম্বা সুখী মন অসুখী হল এমন দৃষ্টান্ত কম।*

মানসিক রোগগ্রস্থ যারা, তাদের বিবাহিত জীবনে সুখী হওয়া কঠিন। উপরোক্ত অনুসন্ধানে এটিই পাওয়া গেছে।*

কোন মেয়ে বিবাহিত জীবনে অসুখী হলে সাধারণ মানুষেরা তার স্বামীকে, শ্বশুর শাশুড়ীকে দায়ী করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এটা সত্য। পণের জন্য বধূটিকে পুড়িয়ে মেরেছে, আত্মহত্যায় বাধ্য করেছে—এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে। স্বামী মদ্যপ, লম্পট, স্ত্রী'র প্রতি তার নিষ্ঠুর আচরণ এমন কাহিনীও আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের আতিশয্য যেখানে ততখানি নয় সেখানে সর্বাগ্রে দেখা দরকার মেয়েটির মানস প্রকৃতিটি কি! অসুখী বিবাহের দ্বারা মেয়েটির মানসিক রোগ হয়েছে বলার চেয়ে বেশী সত্য মেয়েটি প্রথম থেকেই মনোরোগী ছিল। ঐজন্যই তার বিবাহ অসন অসার্থক ও অসুখী হয়েছে। এই উক্তিটি আপাতঃ দৃষ্টিতে গ্রাহ্য না হলেও সত্য।

কিছুটা সহজাত, কিছুটা শৈশবের অভিজ্ঞতার দ্বারা মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। যে সুখী সে প্রায় সব ব্যাপারেই সুখী থাকে, অসুখীকে সুখী করতে হলে দরকার দীর্ঘ মানসিক চিকিৎসা ক্ষেত্রবিশেষে সম্ভবতঃ তদপেক্ষা ভালো আধ্যাত্মিকতা।**

বিবাহে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের কাছে কি চায়?

বিবাহে নরনারীর আকাঙ্খার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। আবার সব পুরুষের আকাঙ্খাই এক নয়, তেমন সব নারীর আকাঙ্খা ও সমান নয়। সন্তানদের রক্ষার প্রয়োজনেই বিবাহের উদ্ভব এমন সিদ্ধান্তে ওয়েস্টারমার্ক

* Meena Chand – Ph. D. Thesis.

** বইটির মানসিক স্বাস্থ্যে যোগ অধ্যায়টি দেখুন।

উপনীত হয়েছিলেন।* বিবাহ প্রবর্ত্তনে নারীর উদ্যোগটাই ছিল বেশী এমন কথা ওদের অনেকেই বলেছেন। বিবাহে পুরুষ নারীকে রক্ষা করবে এটা নারীর মনে চিরন্তন আকাঙ্খা। বর্ত্তমান সমাজে ভরণপোষণের প্রয়োজনটার কথাটাও বলতে হয়। নারী পুরুষের চোখে অনন্যা হবে, পুরুষ তাকে বিশেষ মূল্য দেবে এত সে চাইবেই। স্বামীর ইচ্ছা স্ত্রী তাকে সেবা করবে, তাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসবে তার সন্তানসন্ততি প্রতিপালন সে করবে। পারস্পরিক নির্ভরতায় তাদের বিবাহিত জীবন সার্থক হয়ে উঠুক এটা উভয়েরই কাম্য।

ছোটবেলায় মানুষের নির্ভরতা মা বাবা, বিশেষতঃ মায়ের উপর। মা তাদের ভালবাসতেন, আবার মা'কে তারা ভালবাসত। পরবর্ত্তীকালে তাদের সব ভালোবাসাই কিছুটা পাত্রান্তরিত ভালোবাসা। স্বামী স্ত্রী'র মধ্যে মাকে খোঁজে, তার স্ত্রী তাকে মায়ের মত ভালোবাসুক এমন সে চায়। মেয়েরা বাবার প্রতি ভালোবাসা স্বামীর উপর ন্যস্ত করে।

মায়ের উপর ভালোবাসার একটি বৃহদাংশ তুলে এনে স্ত্রীকে অর্পণ করার কাজটিতে সময় সময় বিঘ্ন ঘটে। মায়ের প্রতি স্বামীর মন বেশী আটকা থাকলে স্বামীর পক্ষে স্ত্রী'কে যথোচিত ভালোবাসা সম্ভব হয়না। যেসব ক্ষেত্রে মা'ও ছেলেকে আঁকড়ে থাকতে চান সেখানেত সোনায় সোহাগা। মায়ের প্রতি ছেলেদের ভালোবাসার সংবন্ধন ঘটলে বিবাহিত জীবন সুখী হয়না। আবার যে ছেলে একেবারেই মা'কে সহ্য করতে পারেনা, স্ত্রী'কে সে ভালবাসবে কেমন করে।

মায়ের প্রতি ছেলেদের মনোভাবই বিবাহিত জীবনে সুখী হবে কিনা তা কিছুটা নির্ধারণ করে। বাবার প্রতি মেয়েদের। তবে ছেলেমেয়ে উভয়ের জীবনেই বাবার চেয়ে মায়ের স্থান বেশী। সে জন্য মা যতখানি ভাল বা মন্দ করতে পারেন বাবা ততটা পারেন না।

সংবন্ধন কেমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে তার কয়েকটি নমুনা দিই।

---

* **Westernmark—History of Marriage**

স্ত্রী'র ইচ্ছা স্বামীর কাছে বড় নয়, বড় হচ্ছে মায়ের ইচ্ছা। স্ত্রী'র সঙ্গ থেকে মায়ের সান্নিধ্যই তার বেশী আকাঙ্খিত। রোজগারের সব টাকাকড়ি মায়ের হাতে তুলে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত। স্ত্রী'র সঙ্গে তার মায়ের মনোমালিন্য হলে সে নির্বিচারে মায়ের দিক নেয়।

মেয়েদের পিতার প্রতি সম্বন্ধনে—মেয়েরা স্বামীদের পিতার থেকে ছোট মনে করে। স্বামীদের দিবারাত্র শুনতে হয় তাদের বাবা কি ছিলেন, কতসব গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

সম্বন্ধনের দ্বারা যে সব মন আক্রান্ত, অভিভূত তারা বিবহিত জীবনে স্বামী স্ত্রী'কে আবার স্ত্রী'স্বামীকে ভালোবাসতে পারেনা, পরস্পর পরস্পরের প্রতি কর্তব্যও করতে পারে না। সুস্থ সহজচিত্তে পরস্পরকে ভালোবাসার ক্ষমতা সার্থক বিবাহে একান্ত আবশ্যক।

স্ত্রীকে ভালোবাসা মায়ের ভালোবাসার পাত্রান্তরণ একথা স্ত্রী'র প্রতি স্বামীর ভালোবাসার সম্পূর্ণ বিবরণ নয়। মায়ের প্রতি শিশুর ভালোবাসার রূপ প্রধানতঃ 'ভালোবাসা চাওয়া'। যে ব্যক্তি সারাজীবন মনে মনে শিশুই থেকে যায় চাওয়াটাই তার মুখ্যত ভালোবাসার রূপ হয়। কিন্তু অধিকাংশ ব্যাক্তিই আবেগ জীবনের শৈশব অনেকাংশে কাটিয়ে ওঠে। তাদের ভালোবাসায় চাওয়া যেমন আছে তেমন আছে দেওয়ার প্রেরণা। তেমন পুরুষ স্ত্রীকে ভালোবাসবে কেবল মা বলে নয়, বন্ধু বলে, কন্যা বলে। মাকে ভালোবাসলেই স্ত্রীর ভাগে কম পড়বে এমন কথা না ভাবলেও চলে। স্বামী স্ত্রী'র ভালোবাসা চিরকাল বাঁচিয়ে রাখে ভালোবাসা দেওয়া, নিজেদের মধ্যে এক অখণ্ড ঐক্যবোধ।* এদেশে বিবাহকে অসুখী করার ব্যাপারে শ্বাশুড়ী ও ননদের ভূমিকা আছে। মা ছেলেকে বড় করেছেন, স্নেহযত্নে তাকে মানুষ করেছেন, স্বাভাবিক কারণেই শৈশব থেকে ছেলেকে তার 'নিজের' বলে ভেবেছেন।

* ফ্রয়েড লিখেছেন—স্ত্রী স্বামীকে পুত্রবৎ গ্রহণ করতে পারলেই—বিবাহ সার্থক ও স্থায়ী হয়।

সে ছেলে বড় হয়ে অপর কাউকে ভালোবাসবে, ছেলে 'পর' হয়ে যাবে এমন কথা বহু মায়েরা ভাবতে পারেন না। বউ ছেলেকে ভালোবাসুক, কিন্তু ছেলে যেন বউকে না ভালোবাসে। ছেলে মা'কে ভালোবাসবে, কেবলমাত্র মা'কেই। এটা 'ইডিপাস কমপ্লেক্সের' বিপরীত প্রকাশ।* ছেলে মায়েরই সম্পত্তি এটা আত্মপ্রেমের অভিব্যক্তি, এর মধ্যে ভালোবাসা কোথায়! 'ভালোবাসা দেওয়ায় মানুষ' ভালোবাসার পাত্রের মঙ্গল কামনা করে, পাত্রের পক্ষে যা ভালো তারই জন্য সর্বোতভাবে চেষ্টা করে। ঐ ভালোবাসায় নিঃস্বার্থ পরার্থপরতাই মূলকথা। মানুষ নিজেকে অতিক্রম করে পাত্রের সঙ্গে তার পরানুভূতি ঘটে। এটা সম্ভব তেমন মায়ের পক্ষেই যার জীবনে মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে, ভালোবাসা দেবার শক্তি পূর্ণতালাভ করেছে। সম্পত্তিজ্ঞানে ভালোবাসা শিশুসুলভ আত্মকামেরই রূপান্তর, নিজের মোহটাই সেখানে বড়, ভালো-বাসা নয়। যে ভালোবাসায় স্বতঃস্ফূর্ত ত্যাগ আছে সে ভালোবাসায় 'আমি' টা বড় নয়—স্বামী স্ত্রী'কে ভালোবাসুক, স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসুক তারা দুজনে সুখী হউক'। জীবনের পথচলা সহজ নয়। কিছুটা দুর্গম পথচলায় ওরা যেন পরস্পরের উপর নির্ভর করতে পারে, ভালোবাসা যেন ওদের বিপদে আপদে শক্তি যোগায়, ঐ পথ চলার নিরন্তর প্রেরণা যোগায়। নিজেদের মন থেকে যে বাবা মা আবেগ জীবনে পরিণত—তারা তাই চাইবেন।

মায়ের বিরূপতা ও বিরুদ্ধতা বিবাহিত সুখের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে এমন দৃষ্টান্ত আছে। তবে স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পরকে ভালবাসে মায়ের প্রতিবন্ধকতা অসুবিধা সৃষ্টি করবে নিশ্চয়ই তবে শেষ পর্যন্ত স্বামী স্ত্রীকে অসুখী করতে পারবে না। এ ব্যাপারে মূল দায়িত্ব কিন্তু স্বামী স্ত্রীরই।

---

* মায়ের প্রতি ছেলেদের অত্যাধিক ভালোবাসা 'ইডিপাস কমপ্লেক্স'।

আরেকটি জিনিষ স্বামী স্ত্রী'র সম্বন্ধকে তিক্ত করে সেটা হচ্ছে ক্রোধ। ক্রোধের কাজ—ধ্বংস করা, বস্তুকে ধ্বংস করা, মানুষে মানুষের সম্বন্ধকে নষ্ট করা। বেশী রাগ ভালো নয়। অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে—স্বামীর রাগ যতখানি অসুবিধা সৃষ্টি করে, তার চেয়ে বেশী অনিষ্ট করে স্ত্রী'র রাগ। পুরুষকাম সক্রিয়, ঐ কামের ভঙ্গি কিছুটা আক্রমণাত্মক, স্ত্রীকাম নিষ্ক্রিয়, গ্রহণেচ্ছু, কিছুটা আঘাতে সে আনন্দ পায়। নারী ও পুরুষের মধ্যে এই মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে।

ক্রোধ বিবাহিত জীবনের সুখকে নষ্ট করে

মেয়েরা বিয়ের পর স্বামীর ঘর করতে যায়, অনেকে শ্বশুরবাড়ী যায়। বিবাহিত ভালোবাসায় স্বামীর কাছে (স্ত্রী'র কাছে স্বামীর) একটি বিশেষ মূল্য আছে। এই মূল্যলাভের দ্বারা তাদের আত্মকামের পরিতৃপ্তি ঘটে। জীবনে এর দরকার আছে, খুবই দরকার। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের বেলায় বোধ হয় দরকার আরো বেশী। মেয়েরা চায় স্বামী তাদের ভালোবাসুক, শ্বশুর-শাশুড়ী তাদের ভালোবাসুক, তাদের ভালো বলুক, তাদের কথা ভাবুক। পাওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের অন্তর্নিহিত ভালোবাসা চাওয়ার যেন সম্যক পরিতৃপ্তি ঘটে এমন তাদের ব্যাকুল বাসনা। কিন্তু মূখ্যতঃ এমন চাওয়া নিয়ে যদি তারা তাদের শ্বশুরবাড়ী যায় দুঃখ তাদের অনিবার্য। তাদের যেমন চাওয়া আছে, তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ীর লোকেদেরও তেমনি চাওয়া আছে। ভালোবাসা দেবার শক্তি যাদের পূর্ণতালাভ করেছে তাদের পক্ষে ভালোবাসা দেওয়াটা সম্ভব হয়। কর্ত্তব্য বোধ আর স্বচ্ছন্দে সানন্দে দেওয়ার মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। সেটাও কারুরই চোখ এড়ায় না। যেসব মেয়ে তেমন ভাবে মানসিক শৈশব কাটিয়ে উঠতে পারে নি—চাওয়াটাই তারা জানে, দেওয়াটা নয়। জীবনে কতটা মানুষ পেতে পারে। তাই অতৃপ্তির ক্ষোভ নিয়ে অমন মেয়েরা বাপের বাড়ীতে ফিরে আসে।

বিবাহের সাফল্যে 'ভালোবাসা দেওয়ার' শক্তির পূর্ণতালাভের প্রয়োজনীয়তা

ছোটবেলায় বাবা-মায়ের কাছ থেকে তারা চাইত, বাবা মা দিতেন। বাবা মা আজও তাদের দেবেন, শ্বশুরবাড়ী ভালো নয়, বাপের বাড়ী ভালো। বিবাহের সাফল্যের জন্য ভালোবাসা দেবার ক্ষমতা ও প্রেরণার উপযুক্ত বিকাশ আবশ্যক। যে মন দেবার জন্য প্রস্তুত, যে মন দেবার জন্য উন্মুখ তার স্বামীও শ্বশুরবাড়ী গিয়ে বিশেষ প্রতিকূলতা না থাকলে সার্থক হবে এমন আশা নিশ্চয়ই করা চলে।

স্বামী স্ত্রী দুজনেই যদি মনের দিক থেকে অপরিণত থাকে স্বামী স্ত্রী'র মধ্যে সামঞ্জস্যের সমস্যাটা সেখানে বড় হয়ে উঠে। দুজনের মনেই ক্ষোভ জমে ওঠে, দুজনের মনে বিতৃষ্ণা এমন কি রোষ সৃষ্টি হয়।

বিবাহে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের পরিপূরক, প্রতিদ্বন্দী নয়

অধুনাকালে স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রী'র উপার্জনশীলতার দ্বারা মেয়েরা এক নতুন মর্যাদা লাভ করেছে। পুরুষ যেমন মানুষ, মেয়েরা তেমনি মানুষ। বিবাহে তারা একই মূল্যবোধের উপর জোর দেন। শিক্ষা সংস্কৃতি, চিন্তাধারার মধ্যে মিলে বিবাহের যুগ্মজীবন প্রশস্ত হবে, সুন্দর হবে এমন অনেকের ধারণা। কিছু সংখ্যক মেয়ে পুরুষের সমস্ত অধিকার ভোগ করতে চান। নারীপুরুষ পরস্পরের পরিপূরক একথা তারা বিস্মৃত হন। মনে মনে তারা পুরুষ হতে চান, তারা চান পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে*। যেভাবে মেয়েরা এতদিন নির্যাতিত হয়েছে প্রতিক্রিয়া হিসাবে এমন করাটা কিছুটা স্বাভাবিক। সুস্থমনের নরনারীরা বোঝে অধিকার কারুর কম নয়, ভালোবেসে, একে অপরের অক্ষমতা ও অপূর্ণতাকে পূর্ণ করেই সুখী বিবাহিত জীবনে ভিত্তি স্থাপন করা যায়। নরনারীর সম্বন্ধ যুদ্ধের নয়, ভালোবাসার, ভালোবাসা দেবার এবং ভালোবাসা নেবার।

---

* শৈশবে পিতার ভালোবাসা না পেলে ঐ জাতীয় মনোভাব মেয়েদের কারুর কারুর মধ্যেই গড়ে ওঠে। বাবার ভালোবাসা আমি চাই না—চাইনা স্বামীর ভালোবাসা, আমি বাবা হব, আমি স্বামীর স্থান অধিকার করব'—এই হয় তাদের অন্তর্নিহিত কামনা। (স্বপ্না কর—পি এইচ ডি থিসিস)

সমাজে আজকাল একটি অসহিষ্ণুতা লক্ষ্য করা যায়। বিবাহ বিচ্ছেদ তারই একটি প্রকাশ। সমাজে নরনারীর কি ভূমিকা সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয় হতে পারিনি। পুরুষদের অনেকেই পুরনো সংস্কার আঁকরে ধরে থাকে, নারীদের কাছ থেকে অসঙ্গত দাবী করে। সেটা যে অসঙ্গত এমনও তাদের বোধগম্য হয় না। 'বাবা মায়ের কাছে এমন পেতাম তুমি তা আমাকে দেবে না কেন'! পুরুষদের অনেকেরই এমন মনোভাব। স্ত্রী স্বামীর কথা শুনবে, তার অনুমতি নিয়ে সে কাজ করবে। স্বামীর বেলাতে কিন্তু ঐ নিয়ম নয়। স্বামীদের ধারণা তারা বোঝে বেশী, স্ত্রী বোঝে কম।

কে কাকে আদেশ করবে, কে সেই আদেশ মান্য করবে, বিবাহ জীবনে কে প্রধান এ নিয়ে বিবাহে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে বিবাদ বিসম্বাদের শেষ নেই। গণতন্ত্রের মূলকথা প্রত্যেকেরই স্বাতন্ত্র্য আছে, স্বীয় স্বীয় ইচ্ছা ও অভিরুচি আছে—সকলকে সমন্বিত করেই সুস্থ সামাজিক জীবন। কিন্তু একথা আমাদের মনে থাকে কি! এর জন্য যে উপলব্ধি দরকার, যে ত্যাগ দরকার সেটা যতক্ষণ পুরুষের না হচ্ছে, স্ত্রী'র না হচ্ছে ততক্ষণ পারিবারিক জীবনে সুখ ও শান্তি বারম্বার বিঘ্নিত হবে।

বিবাহে স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে ভালোবাসে। তারই সঙ্গে যুক্ত হয়—

বিবাহ ও আধিপত্যবোধ

অধিকার বোধ, আধিপত্যবোধ। স্বামী ভাবে স্ত্রী আমার, স্ত্রী ভাবে স্বামী আমার। পরস্পর পরস্পরের সম্পত্তি। বোধ হয় বিবাহ জীবনের পূর্ণতার জন্য এটা কিছুটা দরকারও আছে। স্ত্রীও ভাবে স্বামী আমাকে নিজের বলে ভাবুক, স্বামীও তদনুরূপ মনোভাব। দুইয়ে মিলে যে ঐক্যবোধ তাতে উপরোক্ত মনোভাবের স্থান আছে।

তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঐ অধিকার ও আধিপত্য বোধটা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তখন এদের মন হয়ে ওঠে সতর্ক, সন্ত্রস্ত এমনকি সন্দিগ্ধ। সন্দেহবায়ু বলে একটা রোগ আছে। পরপুরুষের প্রতি তার স্ত্রী'র মন,

পরস্ত্রীতে স্বামীর মন এমন একটা ঘনীভূত সন্দেহ এদের মধ্যে দেখা যায়। এমন সন্দেহের অনেক সময় কোন বাস্তব ভিত্তি থাকেনা। এক ভদ্রলোক অফিসে যাবার সময় তার স্ত্রীকে ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে যেতেন। স্ত্রী অন্য কারুর সঙ্গে কথা বললে, স্বামী অন্যকোন মেয়ের দিকে তাকালে স্বামী স্ত্রী সাব্যস্ত করেন তার স্বামী/স্ত্রী অন্য নারীতে/পুরুষে আসক্ত। ভালোবাসায় কিছুটা হিংসা স্বাভাবিক—পরস্পর পরস্পরকে আগলে থাকতে চায়*। কিন্তু মাত্রাধিক্য হিংসায় স্বামী স্ত্রী যদি জর্জরিত হয়, অপরপক্ষেরও প্রাণান্ত হয়—তবে তা রোগ বৈকি! এরোগের নাম প্যারা-নোইয়া। বাড়াবাড়ি আধিপত্যের আকাঙ্খা, জোনস্‌এর** ভাষায় ভালো-বাসার দুর্বলতারই পরিচয়। যেখানে প্রকৃত, পরিণত ভালোবাসা আছে সেখানে সত্যকারের ঐ জাতীয় ত্রুটীও পরস্পর ক্ষমার চক্ষে দেখবে। মনে হবে—'হয়ত ওর ওটা কিছুটা দরকারও ছিল'। একজনকে ভালোবাসলে —অন্যের প্রতি কিছুটা মনযোগ দিতে পারবেনা, অন্যকে কিছু পরিমাণে ভালোবাসবেনা এ কেমন কথা! মানুষের জীবনত শুষ্ক ব্যাকরণ নয়। আগে পুরুষ বহু বিবাহ করত, অনেক নারীরও বহু স্বামী থাকতো, তারই সঙ্গে তারা সুষ্ঠু সামঞ্জস্য করে চলতো। এক স্বামীর এক স্ত্রী— এটা এখনকার প্রচলিত রীতি। কিন্তু সব মানুষের প্রয়োজন এক নয়। মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে। এটা আমরা শিক্ষাদীক্ষা, বৃত্তিনির্বাচন সবেতেই ভাবি। বিবাহ ও যৌন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ভাবব না কেন! মানুষের প্রকৃতির প্রতি কিছুটা নজর দিতে হবে বৈকি!

---

* মা'কে একান্তরূপে চায় শিশু। মা কেবলমাত্র তার, কিন্তু সেটাত আর অন্য ভাইবোনদের উপস্থিতির জন্য, বাবার জন্য তখন হয়ে ওঠেনি। স্ত্রী'র বেলায়— স্বামী সেই একাধিপত্যের অতৃপ্ত বাসনাকে সজোরে ও সদর্পে পরিতৃপ্ত করার জন্য সচেষ্ট হয়।

** Ernest Jones –Papers on Applied Psychoanalysis.

স্বপ্ন

স্বপ্ন সবাই দেখে; স্বপ্নে শোনা, স্পর্শ করা কমই ঘটে। কথাও কিছু কিছু বলে। স্বপ্নের প্রতীয়মান রূপটি প্রায়ই কেমন গোলমেলে, তার মধ্যে সঙ্গতি পাওয়া কঠিন।

স্বপ্নের এই মুখ্যতঃ অসংলগ্ন প্রতীয়মান দিকটির অর্থ খুঁজতে হলে এর অন্তর্নিহিত দিকটির দিকে নজর দিতে হবে। অমন অনুসন্ধান খুব সহজ নয়। কিছুটা মুক্ত অনুসঙ্গ পদ্ধতিতেই অর্থটি উদ্ধার করা যায়।

এ ব্যাপারে মনোবিদ ও স্বপ্নতত্ত্ববিদরা কিছু কিছু অনুসন্ধান করেছেন। যে সব সিদ্ধান্তে তারা উপনীত হয়েছেন নীচে কিছু কিছু তা লিপিবদ্ধ করা হল। হালে যে অভিজ্ঞতা ব্যাক্তির হয়েছে তার কিছুটা পরিচয় স্বপ্নে পাওয়া যায়। একে বলা হয় 'দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অবশিষ্ট'। স্বপ্নের দুটি দিক আছে। যা দেখা যায়, শোনা যায় তাকে বলা হয় 'স্বপ্নের প্রকাশমান দিক'। এই অসঙ্গতিপূর্ণ প্রকাশমান দিকটির মূলে আছে একটি 'অন্তর্নিহিত অর্থ'—কোন ইচ্ছা, আবেগ ও স্মৃতি। একজন স্বপ্ন দেখল তার বন্ধুটি মারা গেছে আর ব্যাক্তিটি ঐ মৃত্যুতে খুব কাঁদছে। স্বপ্নের অন্তর্নিহিত অর্থ পাওয়া গেল—বন্ধুর মৃত্যু ব্যক্তিটি কামনা করে। বন্ধুর প্রতি তার প্রীতি, মনের অধিঅহমের তাড়না ঐ ইচ্ছাকে অবদমিত করে রেখেছে। ঘুমের মধ্যে অধিঅহমের শাসন দুর্বল হয়ে যায়। স্বপ্নে দেখল বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। তাও সে ইচ্ছা পূর্ণ হল ছদ্মবেশে—ব্যক্তিটিকে বন্ধু মারেনি, সে মারা গেছে। ছদ্মবেশের আরেক-দিক সে বন্ধুর মৃত্যুইবা চাইবে কেন। সে বন্ধুর মৃত্যুতে শোকাভিভূত হয়েছে—তার কান্না তারই প্রমাণ। একে বলা হয় মনের নিগূঢ় ইচ্ছা ও অধিঅহমের অনুশাসনের একটি 'আপোষের ফল'।

অবদমিত ইচ্ছা এবং অবদমনকারক শক্তি এমন ছুটির আপোষের দ্বারা নিউরসিস বা উদ্বায়ুরোগের লক্ষণ সৃষ্ট হয় একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়—এক শিশুর প্রতি মায়ের বৈর ইচ্ছা—অংশতঃ সচেতন, অংশতঃ নির্জ্জান এবং ছুই শিশুর প্রতি মায়ের স্বাভাবিক মমতা এবং অধিঅহমের অনুশাসন। এর ফলে দুর্ঘটনায় বিপদ আপদে শিশুর ঘোরতর অনিষ্ট হতে পারে, এমনকি মৃত্যু হতে পারে এমন ভাবনায় মায়ের সচেতন মনে নিদারুন উৎকণ্ঠা। অমন মনোভাব রোগের পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছে। এ কারণেই ফ্রয়েড বলেছেন—স্বপ্ন স্বাভাবিক মনোভাবসম্পন্ন লোকদের নিউরসিস।

কেমন করে অন্তর্নিহিত চিন্তা প্রকাশমান স্বপ্নের জন্ম দেয় এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। স্বপ্নে দিনের অতৃপ্ত ইচ্ছা রাত্রিতে রূপ নেয়। ছোটদের স্বপ্নে, যাদের জীবনে অবদমন খুব বড় হয়ে ওঠেনি—এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটি ছেলে মায়ের কাছে আবদার করলো, 'মা আমি চকোলেট খাবো, আমায় চকোলেট কিনে দাও'। মা বললেন—'পয়সা নেই, এখন পাবেনা'। ঘুম থেকে সকালে উঠে ছেলেটি মাকে বলল, 'মা কাল রাত্রিতে আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ছুটো চকোলেট খেয়েছি—বড়ো চকোলেট। দোকানদার অমনি আমায় দিল'। লেখকের মেয়ে বাবার কাছে আবদার করছিল—'আমাকে একটা সাইকেল কিনে দাও'। দেব, দিচ্ছি করেও দেওয়া হচ্ছিল না। কিছুদিন আগে সে স্বপ্ন দেখল ইস্কুল থেকে ফিরে এসে দেখে বাবা তার জন্য একটি সাইকেল কিনে নিয়ে এসেছে। স্বপ্নে অতৃপ্ত ইচ্ছার অমন বরাবর পরিতৃপ্তি সাধারণতঃ বড়দের জীবনে কমই ঘটে।*

স্বপ্ন ও দিবাস্বপ্নের সম্বন্ধে কিছু কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। দিনে আকাশকুসুম কল্পনায় মানুষ কতকিছু ভাবে। একথা বিশেষভাবে কিশোরকিশোরীদের বেলায় প্রযোজ্য। একটি ছেলে কল্পনা করে সে

* এমন স্বপ্নেরও একটি গভীর অর্থ খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

দিক্‌বিজয়ী পাইলট হয়েছে, ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হচ্ছে, হিমালয়ের সর্ব্বোচ চূড়ায় আরোহণ করছে। আবার একটি মেয়ে ভাবে সে রাজকন্যা, পরম রূপবতী কোন বীর রাজপুত্র এসে তাকে বিয়ে করে নিয়ে গেল। এমন দিবাস্বপ্ন তাদের ভালো লাগে। ক্ষণিকের জন্য তাকে সত্য বলে ভাবেও—কিন্তু মনের এক কোণে তারা জানে এসব বাস্তব নয়, এ কল্পনা।

ছোটরা মনে মনে ঘোড়সোয়ার হয়—গাছের ডাল তাদের ঘোড়া—পুতুলকে রাজকন্যা বানিয়ে তাকে কাপড় পরায়, গহণা পরায়, ধুমধাম করে পুতুলের বিয়ে দেয়। এসব কল্পনায় শিশুমন সুখ পায় কিন্তু মনে মনে সে জানে এটা খেলা, বাস্তব নয়। স্বপ্নে কল্পনা কিন্তু বাস্তবরূপ ধরেই আসে। সিজোফ্রেনিয়া রোগেও এমন দেখা যায়। মিথ্যাতে তারা সত্য আরোপ করে এবং মিথ্যাই সত্য এটা তারা বিশ্বাস করে। মানুষের স্বপ্নের সঙ্গে সিজোফ্রেনিক ভ্রান্তির মিল আছে। উন্মাদ রোগের অমূল প্রত্যক্ষ, ভ্রান্তবিশ্বাস এসব মানুষের স্বপ্নের মধ্যেও দেখা যায়।

যেসব অপরিতৃপ্ত ইচ্ছা স্বপ্নের প্রেরণা যোগায় তা প্রধানতঃ অবদমিত। স্বপ্ন-চেতনায় তাদের সোজাসুজি প্রকাশ সম্ভব নয়। স্বপ্নে তাদের প্রকাশ হয় অন্যরূপে। বয়স্কদের স্বপ্ন সাধারণতঃ দুই রকমের। মোটামুটি অর্থবহ একটি ঘটনাতে স্বপ্ন রূপ নেয়। আবার কোন কোন স্বপ্ন অসম্বদ্ধ ও অসংলগ্ন। কী স্বপ্নদ্রষ্টা চায়, কি ঐ স্বপ্নের অর্থ বোঝা দুরূহ ব্যাপার। সাধারণ লোকেদের পক্ষে স্বপ্নের অর্থ বোঝা প্রায় অসম্ভব। স্বপ্ন তত্ত্ববিদরা নিম্নোক্ত উপায়ে স্বপ্নের অর্থ কি উদ্ধারের চেষ্টা করেন। স্বপ্ন দ্রষ্টাকে বলা হয় "আপনি স্বপ্নের কথা ভাবুন। ঐ সম্পর্কে আপনার কি কি মনে পড়ছে—বলুন। দ্বিধাসঙ্কোচ করবেন না যা মনে আসে সবই বলুন"। এটা কিছুটা মুক্ত অনুসঙ্গের সীমাবদ্ধ বদ্ধ রূপ। কোন কিছু গোপন না

করে অকপটে স্বপ্নসম্পর্কিত সবকিছু বললে তার সাহায্যে ওদের বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করে স্বপ্নতত্ত্ববিদ স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করেন। এই ব্যাখ্যার মধ্যেও স্বপ্নবিদ তার মুন্সিয়ানা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেন।

স্বপ্নদের বিশ্লেষণ করে কি কি মানসিক প্রক্রিয়ায় স্বপ্নের নিগূঢ় ইচ্ছা তার প্রকাশমান রূপ নেয়, তার কয়েকটি নীচে উল্লেখ করা হল।
(১) এক বা একাধিক অবদমিত ইচ্ছার দ্বারা স্বপ্ন রচিত হয়।
(২) একটি স্বপ্নদৃশ্যে অনেক সময়ই একাধিক অভিজ্ঞতা বা ইচ্ছার প্রভাব বর্তমান। একটি লোককে স্বপ্নে দেখা গেল—স্বপ্নদ্রষ্টা তাকে তাকে কখনও দেখেনি। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় কয়েকটি লোকের প্রতিচ্ছায়া মিলিয়ে একটি নতুন লোকের সৃষ্টি করা হয়েছে। এই পদ্ধতির নাম—"সংক্ষেপন"।

(৩) স্বপ্নে আবেগই সত্য, স্টেকেল এমন অভিমত প্রকাশ করেছেন। তবে আবেগ অনেক সময় তার উল্টো রূপটি নিয়ে আসে। নির্জ্ঞান আবেগ সময় সময় তার বিপরীত রূপে সচেতন মনে প্রবেশ করে। নির্জ্ঞান কামনা বা ধ্বংসাত্মক ইচ্ছা আসে ভয় রূপে। গভীর অনুরক্তি প্রকাশ পাচ্ছে তীব্র বিতৃষ্ণায়। এমন দেখা যায় অন্তর্নিহিত ইচ্ছার সঙ্গে যে আবেগ জড়িত, সচেতন মনে সেই সম্পর্কিত আবেগটি আত্মপ্রকাশ করছে।

(৪) ইচ্ছা বা আবেগ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্বপ্নে স্থানান্তরিত হয়। প্রধান বস্তু বা ঘটনা থেকে বিচ্যুত হয়ে আবেগ বা ইচ্ছা যুক্ত হয় একটি অকিঞ্চিৎকর ঘটনা বা বস্তুর সঙ্গে। একটি ছেলে অপর একটি ছেলের মুখে এ্যাসিড ছুঁড়ে মেরেছিল। আশ্চর্য! এ্যাসিড ছুঁড়ে মেরে অন্য ছেলেটির মুখ পুড়িয়ে দেবার জন্য ছেলেটির কোন অপরাধবোধ হয়নি। নিজেকে সে অবশ্য দোষী বলল কারণ কিছুদিন আগে এক ভদ্রলোকের বাগানে নারকেল গাছে চড়ে নারকেল পেড়ে খেয়েছিল। সে বললে, "আমি খুব অন্যায় করেছি। চুরি করা মহাপাপ"। এটি

একটি মানসিক রোগগ্রস্ত দুষ্ক্রিয় ছেলের কাহিনী। আবেগের অমন স্থানচ্যুতি সচরাচর স্বপ্নে দেখা যায়। একটি মেয়ে একটি ছেলেকে ভালোবাসত। তারপর বহুদিন পরস্পরের মধ্যে দেখাশুনা হয় নি। মেয়েটির এক আত্মীয়ের মৃত্যুতে তার ঐ বন্ধুটি এসেছিল। মেয়েটি ছেলেটিকে দেখতে পেল। কয়েকদিন পর মেয়েটি স্বপ্ন দেখল তার আরেক আত্মীয়ের মৃত্যু হয়েছে। মনঃসমীক্ষক* মেয়েটির স্বপ্নের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে উদ্ধার করলেন—ঐ আত্মীয়টির প্রতি মেয়েটি কোন বৈরীভাব পোষণ করেনা, তার মৃত্যু হউক, এমন সে আকাঙ্খা করেনা। স্বপ্নে যে আত্মীয়টির মৃত্যু ঘটিয়েছে তাহলো তার পুরনো বন্ধু আবার আসবে, মেয়েটি আবার তাকে দেখতে পাবে। তার ভালোবাসার পাত্রকে দেখবার ইচ্ছার স্থানান্তরিত হল তার আত্মীয়ের প্রতি তার মৃত্যু ইচ্ছায় ও তার মৃত্যু ঘটানোতে।

স্বপ্ন যত জটিল সাধারণতঃ বুঝতে হবে অন্তর্দ্বন্দ তত বেশী, অধি অহমের বাধা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তত প্রবল। স্বপ্নের অর্থ সচেতন মনের কাছে যাতে স্পষ্ট না হয় নির্জ্ঞান বাধার তেমনি চেষ্টা।

স্বপ্ন সাধারণতঃ অসংলগ্ন ও অসম্বদ্ধ। জেগে ওঠবার পর স্বপ্নে কি দেখল লোকে সেটা ভুলে যায়, তার বেশীটা বা সবটাই। স্বপ্নটি বলতে গেলে সাধারণতঃ তাকে প্রকাশ করে সম্বদ্ধ ও সম্পৃক্ত রূপে। নতুন কিছু যোগ করে, কিছুটা অর্থবহরূপে তাকে সে বলে। এই পদ্ধতিটিও প্রধানতঃ নির্জ্ঞান মানসিক প্রক্রিয়ার ফল। একে বলা হয় 'স্বপ্নের প্রসারণ'।

স্বপ্ন মানুষ দেখে কেন? প্রকৃত বিশ্রামের জন্য—দেহমনের ক্লান্তির পূর্ণ অপনয়নের জন্য। বলা যেতে পারে তারই জন্য দরকারত স্বপ্ন শূন্য গভীর নিদ্রা। আসল কথা মনের অনেক ইচ্ছাইত অপরিতৃপ্ত থাকে, ভিতরের এবং বাইরের বাধার জন্য তৃপ্ত হতে পারে না।

* Freud—Collected works

মনের সংগোপনে অতৃপ্তির ক্ষোভ সঞ্চিত থাকে। কিন্তু ক্ষুন্নবৃত্তির ছাড়া ক্ষুধার্ত মনের শান্তি নেই—অমন মন ঘুমোবে কেমন করে! স্বপ্নে সে সব মন অতৃপ্ত বাসনায় তৃপ্তি খোঁজে, আবার কিছুটা পায়ও। স্বপ্ন দেখার ফলে মানুষ ঘুমোতে পারে, অতৃপ্ত বাসনার ক্ষোভ তার ঘুম ভাঙ্গায় না। এজন্য বলা হয়—"স্বপ্ন ঘুমকে রক্ষা করে"। বেশীর ভাগ স্বপ্নই মানুষের বন্ধু, শত্রু নয়। স্বপ্ন দেখবার ক্ষমতা আছে বলে মানুষ স্বচ্ছন্দে কয়েক ঘণ্টা ঘুমোতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্য বিচারে স্বপ্নের রূপটিও দেখার দরকার হয়। কারুর কারুর স্বপ্ন হয় ভয়াবহ —ঘুমের মধ্যেও তাদের সোয়াস্তি নেই। ঐসব স্বপ্ন ঘুমকে রক্ষা করতে পারে না প্রায়ই ঘুম ভেঙ্গে যায়। ফ্রয়েডের ধারণা অতীত জীবনের অস্বাচ্ছন্দ্য ও অতৃপ্তিই মানসিক রোগের মূল প্রেরণা। স্বপ্নের বেলাতেও ঐ কথা সত্য।

অতীতের উপর ভিত্তি করেই বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে উঠে। কার্ল ইয়ুং ফ্রয়েডেরই সমসাময়িক একজন খ্যাতনামা মনোবিদ। ওঁর ধারণা – বর্ত্তমান জীবনের সঙ্গে সুষ্ঠু অভিযোজনের অসুবিধা হলেই মানসিক রোগের উদ্ভব হয়। ব্যাধি ব্যাক্তির একটি নতুন অভিযোজন সাধনের প্রচেষ্টা। কিন্তু ঐ অভিযোজন ত্রুটিপূর্ণ ও সুষ্ঠু জীবন যাত্রার পক্ষে অনিষ্টকর। মোট কথা ওঁর মতে রোগ নির্ণয়ে অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের দাবীর কথাও ভাবতে হবে। স্বপ্ন প্রক্রিয়াতেও ঐ কথা সত্য। সংক্ষেপে, ফ্রয়েড অতীতকেই বড় করে দেখেছেন, ইয়ুং'র চোখে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এর ভূমিকাও কম নয়।

কাব্য কবিতায় অনেক সময় একটা বস্তু বা ধারণা দিয়ে অন্য একটি বস্তু বা ধারণাকে বোঝান হয়। একে বলা হয় উপমা। উপমান-যাহার সঙ্গে সাদৃশ্যটি বোঝান হয়, উপমেয়—সাদৃশ একটি শব্দ, যাহার দ্বারা সাদৃশ্যটিকে বোঝান হয়। উপমেয়কে প্রতীক ও বলা চলে। একটি লোক ক্রুদ্ধ হয়ে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছেন। শ্রোতারা

শুনে বললেন সিংহ গর্জন করছে। সিংহের গর্জন মানুষের উচ্চকণ্ঠের প্রতীক। সিংহের গর্জন ও মানুষের উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা দুটির সম্বন্ধেই মানুষ সচেতন। কিন্তু এমনও আছে—উপমান বা প্রতীকের প্রধান অংশটি নির্জ্ঞান, অপরটি অর্থাৎ উপমেয়টি সচেতন। সচেতন উপমেয় নির্জ্ঞান উপমেয়কে নির্দেশ করছে। স্বপ্নে এমন বহু প্রতীকের পরিচয় পাওয়া যায়। মানুয়ের যৌন আকাঙ্খা বহুলাংশে অবদমিত। পুরুষাঙ্গ ও স্ত্রীঅঙ্গ মনের কাছে নিষিদ্ধ এলাকা। তাদের কি নাম—সঠিকভাবে অনেকেই তা জানেনা, অনেকে তা পারেনা। কিন্তু যেহেতু কাম একটি প্রবল প্রেরণা মানুষের মন বহুলাংশে ঐ জাতীয় ইচ্ছার মধ্যেই পড়ে থাকে। স্বপ্নে দেখা গেল কৌটো, কোন গোলাকৃতি জিনিষ কিম্বা গহ্বর এ শব্দের দ্বারা স্ত্রী অঙ্গকেই বোঝাচ্ছে। তেমনি পাহাড়, লাঠি, সাপ এগুলি পুরুষাঙ্গের প্রতীক। কোনটা কিসের প্রতীক এটা কিছুটা নির্ভর করে কোন ব্যাক্তির অভিজ্ঞতার উপর। দুটি জিনিস বারবার একসঙ্গে ঘটলে একটি অপরটির প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। আবার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের দ্বারা একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রতীক রচনা করে। মুক্ত অনুসঙ্গের দ্বারা অমন দুটি শব্দের সম্বন্ধের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। এমন বহু প্রতীক আছে যা সহজাত। সাপ দেখেনি যারা তারাও সাপের স্বপ্ন দেখে। এমন সহজাত সার্বজনীন প্রতীকের কথা ইয়ুং বিশেষ ভাবে দাবী করেন। বর্ত্তমানে এ সত্য মনঃসমীক্ষাতেই স্বীকৃত।

প্রতীক কোন বস্তুকে বোঝায় তেমনি সময় সময় প্রতীকের দ্বারা কোন কাজ, বিশেষ কোন মনোভাবকেও নির্দেশ করা হয়। একটি দুরুহ কাজ করতে হবে। বলা হয়—'আজ আমাদের অনেকটা চড়াই ভাঙ্গতে হবে'। একজন মানুষের খুব বড় উচ্চাশা—সফল হবে কি হবে না এখন মনে উদ্বেগ রয়েছে যে স্বপ্নে একটা উঁচু পাহাড় সে অতিক্রম করল—তার কী উল্লাস। ইয়ুং এদের কার্মিক প্রতীক বলেছেন। স্বপ্ন ব্যাখ্যায় প্রতীকের অর্থটি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

সম্মোহন

বড়রা বিশেষতঃ পিতামাতারা কিছু বললে বিনা দ্বিধায় ছোটরা তা বিশ্বাস করে। একটি ছবি ছোটদের দেখানো হল—নদী আছে, নদীর ধারে গাছপালা, অনেকে নদীতে স্নান করছে। একটু দেখিয়ে ছবিটা সরিয়ে নেওয়া হল। মনোবিদ ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন নৌকাটা—কি নদীর মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিল, না পাড়ের ধার দিয়ে যাচ্ছিল ? অধিকাংশ ছেলেমেয়ের মধ্যে কেউ পাড়ের ধার দিয়ে কিম্বা নদীর মাঝখান দিয়ে বললো, অল্পসংখ্যক ছেলেমেয়ে বললে—'কোথায় ? নৌকাতো দেখলাম না'। বাস্তবিক কোন নৌকা ঐ ছবির মধ্যে অঙ্কিত ছিলনা। কিন্তু যেহেতু বড়রা বলেছেন; তাই তাদের বিশ্বাস হল নৌকা নিশ্চয়ই ছবিতে আছে। বাবামা সাধারণতঃ অবাস্তব কিছুই বলেন না। তাদের ছেলেমেয়েরা সহজেই তা মেনে নেয়, বিশ্বাস করে। বাবা মা বলেছেন এইই অনেকের পক্ষে যথেষ্ট। মানুষের মধ্যে এমন কারণ ব্যতিরেকে বিশ্বাস স্থাপনের একটা সহজাত প্রেরণা আছে, ম্যাকডুগাল প্রমুখ মনোবিদরা এমন অভিমত প্রকাশ করেছেন।

বড়রা কিন্তু ছোটদের মতন অমন সহজে বিশ্বাস করতে পারে না। তারা প্রমাণ চায়। এ উক্তি সর্বক্ষেত্রে সত্য নয়। তেমন কোন ব্যাক্তি হলে প্রমাণ ছাড়াও বড়রা বিশ্বাস করে। গুরুবচন শিরোধার্য এমন হাজার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যে প্রমাণ ছাড়া সহজ বিশ্বাসের প্রবণতা আছে। বিশ্বাস করতে পেলে আমরা যেন বাঁচি।

সম্মোহিত ব্যাক্তি সম্মোহনে আপাতঃদৃষ্টি ঘুমিয়ে পড়ে। বাইরের সমস্ত উদ্দীপক থেকে মন সরে আসে—কেবল সম্মোহনের উপস্থিতি

সম্বন্ধে সে সচেতন ও সজাগ থাকে। তিনি যা বলেন শিশুসুলভ মনোভাবে সম্মোহিত ব্যাক্তি তাই তাই বিশ্বাস করে। মস্তিকের উচ্চতর বহিস্তর কেন্দ্রটি—যা সবকিছু দেখে, বাজিয়ে, বিচার করে গ্রহণ করে কাজ করেনা। ফলে যা বলা যায় তাতেই সম্মোহিত ব্যক্তির বিশ্বাস।

একটি মেয়েকে সম্মোহিত করা হল। তাকে বলা হল "তুমি মিশরের রানী ক্লিওপেট্রা"। সে বিশ্বাস করলো, ক্লিওপেট্রাজনিত আচরণ করতে লাগল। গভীর সম্মোহনে তাকে যদি বলা হয় 'তুমি মেয়ে, নও, তুমি ছেলে' তাও সে বিশ্বাস করবে। কোন কথাই তার আজগুবি বলে মনে হয়না।* সবই বিশ্বাসের যোগ্য।

সংক্ষেপে বিশ্বাসের অমন সহজ প্রবণতা সকলের মধ্যেই আছে। বড়দের ক্ষেত্রে জাগ্রত অবস্থায় এটি সীমাবদ্ধ। সম্মোহিত অবস্থায় মানুষ অনেকটা শিশু হয়ে যায়, সম্মোহককে তারা পিতা বা মাতার আসনে বসায় তাই তারা যা বলেন তাই তারা বিশ্বাস করে। অমন বিশ্বাসে একটা আনন্দ আছে।

গিরীন্দ্রশেখর বসু বলতেন সম্মোহন করার দুটি পদ্ধতি আছে—একটি পিতৃজনোচিত ও অপরটি মাতৃজনোচিত পদ্ধতি। পিতৃজনোচিত পদ্ধতিতে সম্মোহকে কিছুটা কঠোরভাবে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আদেশের সুরে ব্যাক্তিকে বলেন—"ঘুমোও, এখুনি ঘুমিয়ে পড়"। বারবার এমন শোনবার পর সম্মোহন ঘুমে ব্যাক্তিটি ঘুমিয়ে পড়ে।

মায়ের ধরণটি কোমল, স্নেহমাখা। স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে চলেন—"ঘুমোও, ঘুমোও, এবারে তুমি ঘুমিয়ে পড়বে—ঘুমোও, ঘুমোও"। ব্যাক্তির চোখ বুজে আসে, সে সম্মোহিত হয়, ঘুমিয়ে পড়ে

---

* এটা সীমিত সত্য। একটি তরুণীকে সম্মোহক বললেন—'তুমি শাড়ি খুলে ফেল নগ্ন হও'। অমনি সম্মোহন কেটে গেল, সে রাগতভাবে উঠে দাঁড়ালো। নৈতিক বিশ্বাস, ধর্ম বিশ্বাসকে আহত করলে সম্মোহন অনেকক্ষেত্রে কাজ করেনা।

কার পক্ষে কোন পন্থাটি উপযোগী সম্মোহক সর্বাগ্রে বুঝবেন। ব্যাক্তিটি বাবার বেশী অনুরক্ত না মায়ের, তার উপরে পদ্ধতিটি কি হবে তা অনেকখানি নির্ভর করে। পিতার প্রতি যে ব্যাক্তির মনোভাব নৈতিমূলক পিতৃজনোচিত পদ্ধতি তার পক্ষে উপযোগী হবেনা, ব্যক্তির মন বিদ্রোহ করবে।

সকলকে সম্মোহিত করা যায় না এটি আরেকটি সত্য।

সাইকো প্রভৃতি চিকিৎসকেরা মনোরোগ চিকিৎসায় সম্মোহনের সাহায্য নিতেন। রোগিনীর রোগলক্ষণ যে সে হাঁটতে পারে না। তার পক্ষাঘাত হয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গেল রোগিণীটির রোগ দেহভিত্তিক নয়, তার দেহযন্ত্রে কোন বৈকল্য ঘটেনি। যে কারণে সে হাঁটতে পারছেনা সেটি মানসিক। অমন রোগিণীকে সম্মোহিত করে বলা হল—"হাঁটো, হাঁটো, হাঁটতে তুমি পারবে—হাঁটছো? হাঁটো হাঁটো আমি তোমায় জাগিয়ে দিচ্ছি—তার পরও তুমি হাঁটবে, বুঝলেত তুমি হাঁটতে পারবে"। কিছু কিছু লোকের অসুস্থতা ঐ পদ্ধতিতে নিরাময় হয় এমনও দেখা গেছে। ফ্রয়েড গোড়ার দিকে চিকিৎসায় ঐ পদ্ধতিতে কিছু কাজ করেন। কিন্তু দেখা গেল—(১) সম্মোহনের ফল সীমিত। রোগ সেরে যায়, কিন্তু কিছুদিন পর ঐ রোগ কিম্বা ঐ জাতীয় কোন রোগে রোগী আক্রান্ত হয়। (২) সকলকে সম্মোহিত করা যায় না।

সম্মোহন কালে সম্মোহকের নির্দেশে সম্মোহিত ব্যাক্তি তার প্রাক্‌চেতন এমন কি নির্জ্জ্ান মনের কিছু খবরের সন্ধান পায় সে সম্বন্ধে চিকিৎসকে সে বলে। যেসব অবরুদ্ধ কামনাবাসনা অস্তিত্বের কথা রোগীকে তার জাগ্রত অবস্থায় জানানো হয়। তাতে রোগ উপশমে কিছুটা সাহায্য করে, তবে পুরোটা নয়। কেবলমাত্র অবরুদ্ধ ইচ্ছা ও আবেগের খবরই রোগ নিরাময়ের জন্য যথেষ্ট নয়। কেন, কি কারণে ইচ্ছা ও আবেগ দমিত হল, মনের কোন্ শক্তি অবদমনের জন্য দায়ী তাকে জানতে হবে, তার মোকাবিলা করতে হবে, তার শক্তিকে খর্ব ও অক্ষম করতে হবে।

রোগ নিরাময় অধ্যায়ে ঐ পদ্ধতিটি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সম্মোহিত অবস্থায় লোকেরা বিশ্বাস করে, সম্মোহকের নির্দেশে কাজও করে। এমনও দেখা গেছে সম্মোহিত অবস্থায় যে বিশ্বাস তার মধ্যে উৎপাদিত হয়েছে, যে কাজ তাকে করতে বলা হয়েছে তার জের জাগ্রত অবস্থাতেও বজায় থাকে। সম্মোহক সম্মিহিতকে বললেন— "তোমায় আমি জাগিয়ে দিচ্ছি, জাগবার ঠিক আধঘন্টা পর তুমি গাইবে —"বাদলধারা হল সারা···যাবি অনেক দূর"। জাগবার কমবেশী আধ-ঘন্টা পরে ঐ ব্যক্তি গানের ঐ চরণটি গাইল। কেন অমন গান গাইছ? জিজ্ঞাসার উত্তরে সম্মোহন যদি খুব গাঢ় না হয়ে থাকে তবে তার উত্তর হবে—"ঐ যে আপনি গান গাইতে বলেছিলেন"। সম্মোহন খুব গাঢ় হলে পর প্রকৃত কারণটি সম্মোহকের মনে আসবেনা। কোন একটি মনগড়া কারণ সে বলবে। হয়ত সে বলবে "বড় গান গাইতে ইচ্ছা করছিল" কিম্বা "দেখলাম—ঐ গানটা আমার মনে আছে কিনা" ইত্যাদি। সম্মোহনের প্রভাবে অমন আদেশ পালনকে বলা হয়—'সম্মোনেত্তর আদেশ পালন'। একটা প্রশ্ন সহজেই মনে আসে। মোটামুটি আধঘন্টা পরে সে নির্দেশটি পালন করলো। আধঘন্টার হিসাবটা রাখল কে? এর সহজ উত্তর সম্মোহিত ব্যক্তি নিজেই তার সচেতন মনের অগোচরেই একটি অংশ ঐ হিসেবটা রাখছিল। তার প্রমাণও কিছু পাওয়া গেছে। আলগা করে একটি পেন্সিল কাগজের উপরে সম্মিহিত ব্যক্তি ধরে থাকলে ব্যাক্তির সচেতন ইচ্ছার ব্যতিরেকেও আপনা থেকে পেন্সিলটি চলে, লেখা হয়। সকলের ক্ষেত্রে এমন হয়না। কারুর কারুর ক্ষেত্রে হয়। এদের "স্বতঃক্রিয় লেখা" বলা হয়। ঐ লেখাতে তার মনের একটি অংশ যে সময় গণনা করছে—তার পরিচয় পাওয়া যায়। কাজসম্পাদনটি ব্যাক্তি করে তার সচেতন মনের সাহায্যে। সময় গণনা হয় তার অবচেতন বা নির্জ্ঞান মনে। সচেতন মন কাজের আসল কারণ জানেনা।

শিক্ষা ও বৃত্তি নির্বাচন

এককালে পিতামাতা ও অভিভাবকেরা স্থির করতেন, ছেলে মেয়েদের শিক্ষাধারা কি হবে। ভবিষ্যৎ বৃত্তির দিকে নজর দিয়েই পিতামাতারা ছেলেমেয়েদের শিক্ষাধারাটি কি হবে ভাবতেন। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও আইন প্রভৃতি সম্মানী ও অর্থকরী বৃত্তির দিকে দৃষ্টি রেখেই পিতামাতারা সিদ্ধান্ত করতেন ছেলেমেয়েরা কি পড়বে। নিজেদের বৃত্তি কি ছিল ঐ নির্বাচনে সেটাও তারা ভাবতেন। ছেলে মেয়েদের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে বেশী আমল দেওয়া হত না। যা পড়লে ছেলেমেয়েদের ভালো হবে এ বিষয়ে পিতামাতার ভাবনাটাই তখন চূড়ান্ত ছিল।

দিন বদলেছে। গণতন্ত্রের হাওয়া এখন আকাশে বাতাসে। গণ-তন্ত্রের মূল কথা ছোট হউক, বড় হউক প্রত্যেকেরই একটি স্বাতন্ত্র্য আছে, নিজ নিজ অধিকার আছে। কাকে দেশের শাসক করা হবে সেই নির্বাচনে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির নিজস্ব মতামত আছে, প্রত্যেকেরই একটি ভোটাধিকার আছে। এটা রাজনীতির ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের পরিচায়ক। তেমনি সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে প্রত্যেকটি ব্যাক্তির একটি নিজস্ব মতামত আছে, তাকে যথাযোগ্য মূল্য দিতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধিকার ও মর্যাদাবোধের উপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত।

ছেলেমেয়েরা নিজেরা কিছুটা অভিভাবক ও কিছুটা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পরামর্শ শুনে কোন্ পাঠক্রম তারা গ্রহণ করবে সেটা তারা স্থির করবে। বড়দের কাজ হবে পরামর্শ দেওয়া, নির্দেশ দেওয়া

নয়। এটা অবশ্য বড় ছেলেমেয়েদের বেলাতেই প্রযোজ্য। শৈশবে ছেলেমেয়েদের ক্ষমতা, অক্ষমতা, আগ্রহের ধরণ দেখে পিতামাতা ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের স্থির করতে হয় ছোটরা কি পড়বে, কি শিখবে।

শিক্ষায় মনোবিদ্যার অনুপ্রবেশের ফলে এই পরামর্শের কাজটি সঠিক-তর ও সুচিন্তিত হয়েছে। মানসিক সামর্থ্যকে দুটি প্রধান ভাগে দেখা হয়েছে। এক সাধারণ সামর্থ্য, অপরটি বিশেষ বিশেষ কয়েকটি সামর্থ্য।

বুদ্ধি সব পাঠে সাফল্যের জন্য থাকা দরকার। কোন পাঠের জন্য বেশী, কোন পাঠের জন্য অপেক্ষাকৃত কম। সাহিত্য ও বিজ্ঞান আয়ত্ত করবার জন্য যে পরিমাণ বুদ্ধির দরকার অঙ্কন ও ড্রয়িং শেখার জন্য নিশ্চয়ই ততটা নয়। ছেলেমেয়েরা আর্টস পড়বে না বিজ্ঞানে যাবে সে ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের বুদ্ধ্যঙ্ক কতখানি তা দিয়ে কিছুটা বিচার করা দরকার। ঐ সব নির্ধারণে বিশেষ বিশেষ সামর্থ্যেরও ভূমিকা আছে। তাদেরও হিসাব নিতে হবে।

মনের আর একটা দিক আছে যেটি বিশেষ উল্লেখ্য—সেটি আগ্রহ বা প্রবণতা। প্রবণতাই মানসিক শক্তি বা এনার্জির বিভিন্নরূপ। মানুষের মধ্যে নানান সম্ভাবনা আছে। কারুর মধ্যে গণিতজ্ঞ হবার, কারুর মধ্যে আবার বৈজ্ঞানিক হবার। এসব রূপায়িত হয় চেষ্টার দ্বারা, সাধনার দ্বারা। ঐসব সম্ভাবনাকে ইংরেজিতে বলা হয় aptitude বিংহমের ভাষায় এ হচ্ছে সামর্থ্য + প্রবণতা। সংক্ষেপে সামর্থ্য-প্রবণতা। অঙ্ক যারা ভালো বুঝতে পারেনা—অঙ্কে তাদের শত আগ্রহ থাকলেও অঙ্কবিদ হবার তাদের সম্ভাবনা নেই। সামর্থ্য আছে, কিন্তু আগ্রহ, অনুরাগ নেই অঙ্কবিদ হবার পথ তাদের গ্রহণ না করাই উচিত। সৌভাগ্যে ক্রমে দেখা গেছে সামর্থ্যের সঙ্গে আগ্রহ প্রবণতার একটি সদর্থক সম্বন্ধ আছে। দুটির পারস্পর্যের গুণাঙ্ক পাওয়া গেছে +·৫র মতন।

* Bingham—

কোন্ বিষয়ের জন্য কতখানি বুদ্ধি আবশ্যক তার একটি হদিশ পাওয়া গেছে। ইংল্যাণ্ডে গ্রামার স্কুলে লেখাপড়া শেখানোর উপরেই জোর বেশী। এদের "লেখাপড়া প্রধান" বা এ্যাকাডেমিক স্কুলও বলা হয়। কিছুদিন আগেও এসব স্কুলে সাধারণতঃ যারা ভর্তি হত তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১২০'র বা তার বেশী ছিল। মর্ডান স্কুলে এর চেয়ে কম বুদ্ধি-সম্পন্ন ছেলেমেয়েরা টেকনিক্যাল স্কুলে পড়ত, টেকনিক্যাল প্রবণতা যাদের আছে। তবে এই পাঠ উচ্চতর ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য তৈয়ারী হতনা। এরা নীচু পর্যায়ে টেকনেশিয়ান হতে পারতো।

আমাদের দেশে অধিকাংশ স্কুলে লেখাপড়াটাই প্রধান। টেকনি-ক্যাল ম্যাট্রিক দেওয়া যায় এমন অল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে। স্কুল পাঠ শেষ করে কলেজে পড়বে, উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন হবে আর্টস বা বিজ্ঞানে। উচ্চমাধ্যমিক শেষ করে কোন প্রফেশনাল কলেজে যাবে, এমন ইচ্ছা অনেকেরই।

সাধারণ স্কুল পাঠের শেষে মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়। পরীক্ষার্থী-দের অর্দ্ধেক বা তার বেশী পাশ করে। যারা পাশ করে তাদের মধ্যে প্রথম বিভাগের সংখ্যার হার খুবই কম। দ্বিতীয় বিভাগের সংখ্যার ওর চেয়ে কিছু বেশী, তৃতীয় বিভাগের পাশের সংখ্যাই অধিকাংশ। কয়েক বছর আগে আরতি দাস অকৃতকার্যতার কারণ কি, কৃতকার্যতা অমন শ্রেণী বিভাগে কতখানি বুদ্ধি হলে সম্ভাবনা মোটা-মুটি বেশী, তাই একটি অনুসন্ধান করেন। যে বুদ্ধ্যঙ্ক থাকলে দুই তৃতীয়াংশ পাশ করছে—তা নীচে সন্নিবদ্ধ করা হল ঃ
দুই-তৃতীয়াংশ পাশ করছে এমন ছাত্র-ছাত্রীদের বুদ্ধ্যঙ্ক শতকরা

প্রথম বিভাগ—১২৯
দ্বিতীয় বিভাগ—১১৮
তৃতীয় বিভাগ—১১৪

ন্যূনতম যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১১৪ তারা ঐ পরীক্ষায় ১০০ ভাগের ৬৬ ভাগ

পাশ করেছে। শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নতুন কোন জায়গার টাকা বিনিয়োগ করতে প্রথমেই বুঝতে হয় কতখানি তাতে সফল হবার সম্ভাবনা। ব্যবসা বানিজ্যে একটা ঝুকি আছেই। অতীত অভিজ্ঞতা, বর্ত্তমান বাজারের অবস্থা দেখে যদি মনে হয় ঝুকি তিন ভাগের একভাগের বেশী নয় তবে টাকা বিনিয়োগের প্রশ্ন ওঠে। শতকরা পঞ্চাশ ভাগ যেখানে ঝুকি সেখানে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি টাকা বিনিয়োগ করবেনা। লেখাপড়ায় সাফল্য লাভের সম্ভাবনা কার কতখানি বুদ্ধি তার উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করে। তেমন প্রত্যেক শাখায় শিক্ষালাভের জন্য একটি ন্যুনতম বুদ্ধ্যঙ্ক আবশ্যক। একে বলা হয় প্রান্তিক বা ক্রিটিক্যাল স্কোর। উপরোক্ত অনুসন্ধানটির উপর যদি আস্থা স্থাপন করা যায় তবে বলব ১১৪ বুদ্ধ্যঙ্কের নীচে যাদের তারা মাধ্যমিক পাঠ গ্রহণ করবে, পাশ করবে এমন ভাবনা না করাই সমীচিন। তারা যে পাশ করবেই না এমন বলা যায় না। তবে পাশ করবার সম্ভাবনা কম। সম্ভাব্য অকৃতকার্যতার চেয়ে যেটা তারা পারবে, পারবার সম্ভাবনা যেখানে বেশী সেই জাতীয় শিক্ষা বা ট্রেনিংয়ে তাদের মন দেওয়া উচিত।

মাধ্যমিক পাঠ সমাপ্ত করে ভালো কলেজে পড়বে, পরীক্ষায় ভালো ফল করবে, যাদের অমন ইচ্ছা তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক তাদের আরও বেশী দরকার ১২০ বা তার চেয়েও বেশী হলেই ভালভাবে কলেজি শিক্ষা সে সমাপ্ত করতে পারবে। কোন একটি শিক্ষাধারা বা বিষয়ে পারদর্শিতালাভের জন্য আবশ্যকীয় যথোচিত বিশেষ সামর্থ্য থাকা দরকার।

এসব ছেলেমেয়েদের শিক্ষার দিকের কথা। ছেলেমেয়েরা বড় হবে নিজেদের পায়ে তারা নিজেরা দাঁড়াবে। নিজেদের জীবিকা নিজেরাই অর্জন করবে, পিতামাতার মুখাপেক্ষী হয়ে তারা থাকবেনা। কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করে তারা নিজেদের জীবিকা অর্জন করবে, তার জন্য ছেলেমেয়েদের তৈয়ারি করে নেবার জন্য কি জাতীয় শিক্ষা আবশ্যক এসব ভাবনার প্রয়োজন আছে। অমন শিক্ষাধারা নির্বাচনের সময় দেখতে

হবে, ঐসব বৃত্তিতে কাজ পাবার সম্ভাবনা কতখানি এবং তার অর্থকরী দিকটাই বা কেমন। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করলে চাকরী পাওয়া সহজ, মোটামুটি ভালো মাইনেও পাওয়া যায়। আইন ব্যবসায়ে সাফল্যলাভের জন্য একজনকে বহু দিন অপেক্ষা করতে হয়, তার পিতামাতার অর্থসঙ্গতি আছে কিনা, ঐ ব্যক্তির অতখানি ধৈর্য আছে কিনা সে সব কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করা দরকার।

শিক্ষা নির্বাচন পরামর্শে কয়েকটি জিনিষ ভাবতে হয়—

(১) ছেলেমেয়েরা ঐ শিক্ষার জন্য উপযোগী কিনা।

(২) কতদূর তাদের লেখাপড়া হবে বলে মনে করার কারণ আছে।

(৩) শিক্ষার কোন্ শাখার জন্য একটি ছেলে বা মেয়ে উপযোগী অথবা বিশেষ উপযুক্ত।

ঐ তিনটি ব্যাপারেই মনোবিদরা বিশেষ সহায়তা করতে পারেন।

শিক্ষালাভে কৃতকার্য হলে ছেলেমেয়েদের মন অনেকখানি ভরে। অন্যরা তাদের মূল্য দেয়, তারা নিজেরাও নিজেদের মূল্য দিতে শেখে। তবে একথা সত্য শিক্ষায় সাফল্যেই মনের প্রয়োজন সবখানি মেটেনা। উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন এমন কিছু ছেলেমেয়ে আছে যে শিক্ষাই তারা গ্রহণ করুক না কেন সাফল্যলাভ করবেই। একমাত্র সাফল্যলাভের দ্বারা যদি মানুষ নিজেকে পরিপূর্ণ বোধ করত তবে এরা সুখী হত। সুখী হতে হলে, সার্থকবোধ করতে হলে সাফল্য যেমন একটি কথা, ইচ্ছা ও আগ্রহ একজনের কতখানি পূর্ণ হল তাও দেখতে হবে। অমন একটি উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলের কথাই উল্লেখ করা যাক। ইঞ্জিনিয়ারিং সে পড়ছে, প্রতিবছর তার পরীক্ষার ফল ভালও হচ্ছে কিন্তু তার মনে গভীর ক্ষোভ সে ডাক্তারি পড়লনা কেন। সফল সে নিশ্চয়ই, কিন্তু সুখী সে নয়। অবশ্য এমন কেউ কেউ আছে যাদের কোন পাঠ বা কোন বৃত্তিই শেষ পর্যন্ত ভালো লাগেনা। তারা কি চায় নিজেরাও সেটা জানেনা। সব পথই তাদের প্রথম আকর্ষণ করে অথবা কোন পথই তাদের আকর্ষণ

করেনা। প্রথম দল অস্থিরমতি। এমন অস্থিরতা মানসিক অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। দ্বিতীয়োক্ত দল কর্মবিমুখ। শিক্ষা বা বৃত্তি নির্বাচনের পূর্বে এদের মানসিক চিকিৎসা দরকার। সহজ ও সুচারু আত্মপ্রকাশ মানসিক স্বাস্থ্যলাভ ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আবশ্যক। নিজের পাঠের মাধ্যমে আত্ম-প্রকাশের আত্মতৃপ্তির সুযোগ যে পেয়েছে সে ভাগ্যবান।

শিক্ষাধারা নির্বাচন পরামর্শ, কোন ধারার জন্য কে উপযোগী নির্ধারণ করা তেমন সহজ নয়। কোনটায় কে অনুপযোগী এটা বলা অনেক বেশী সহজ। বুদ্ধি উঁচুদরের নয়, আঙ্কিক সামর্থ্য কম, অঙ্কে তেমন পটু নয় ভৌতিক বিজ্ঞানের পাঠক্রম তাদের গ্রহণ করা সঙ্গত হবেনা। অনেকের পক্ষেই কেবলমাত্র পাশ করা নয়, ভালোভাবে পাশ করাই প্রধান লক্ষ্য।

বৃত্তি নির্বাচনে ব্যক্তির প্রয়োজনীয় সামর্থ্য আছে কিনা, শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে কিনা বা ঐ বৃত্তি গ্রহণে তার কতখানি আগ্রহ আছে এ বিচার অত্যাবশ্যক। ঐ বৃত্তি তার ভালো লাগবে কিনা—অন্তত খারাপ লাগবে না'ত এটা আরেকটা ভাবনার দিক। মানুষের সঙ্গ, সাহচর্য ভালো লাগে না—যতই শিক্ষিত হউন না কেন এমন লোক যদি শিক্ষকতা গ্রহণ করে, তবে তার পক্ষে কর্মজীবনে সুখী হওয়া সম্ভব নয়।

ভালো লাগার কথাটা আরেকটু বিস্তৃত আলোচনা করা যাক। উপযুক্ত সামর্থ্য ও জ্ঞান আছে—কিন্তু কোন কাজই তার ভাল লাগেনা। আবার এমন কেউ কেউ আছেন যাদের সব কাজই ভালো লাগে। এরা জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব কাজেই আনন্দ পান। এমন মনোভাব মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচায়ক। যাদের কোন কাজই ভালো লাগেনা, কোন কাজেই আগ্রহ নেই এমন মনোভাব মানসিক অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। "নিউরোটিকেরা কর্ম্মবিমুখ হয় এটা মনোচিকিৎসকেরা লক্ষ্য করেছেন। বেশীর ভাগ লোকের অবশ্য তাদের পছন্দমত কাজ করতে ভালোবাসে। এমন লোক আছেন যারা শিক্ষকতায় পরম সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন।

এ বিষয়ে উইলিয়াম জেমসের নাম উল্লেখযোগ্য। উনি হার্ভার্ড বিশ্ববিত্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। হার্ভার্ড'র কাছ থেকে পারিশ্রমিক বাবদ যে চেক্‌টি উনি পেতেন—উনি মন্তব্য করেছিলেন, "মনে হত—অমন একটি চেক আমি হার্ভার্ড বিশ্ববিত্যালয়কে দিই পড়াবার অমন সুযোগ বিশ্ববিত্যালয় আমাকে দিয়েছে বলে"। পড়াবার সুযোগকে কিছু কিছু লোক নিজেদের সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করেন।

কাজ মানসিক রোগ মুক্তির সহায়তা করে, মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষায় সহায়ক। মানসিক স্বাস্থ্যব্যাপারে সৃজনাত্মক কাজের বিশেষ মূল্য আছে। সৃজনীপ্রতিভার দ্বারা যারা বড় হয়েছেন বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে মানসিক অন্তর্দ্বন্দে তারা ভোগেন সত্য, মানসিক ব্যাধি সৃষ্টির অনেক উপাদানই তাদের মধ্যে রয়েছে, তবু সৃষ্টির সুচারু আত্মপ্রকাশে তাদের অবদমিত কামনা বাসনার অনেকখানি উদগতি বা উন্নয়নের ফলে তারা মানসিক অসুস্থতায় ভেঙ্গে পড়েন নি।* "নিজের আত্মোপলব্ধির দ্বারা নিজেকে বিকশিত করা"—মানসিক স্বাস্থ্যলাভের একটি প্রধান পথ—ম্যাসলো এমন দাবী করেছেন।

মানসপ্রকৃতি বলে একটি কথা আমরা ব্যবহার করেছি। একে আয়ানও বলা হয়। এটা মূখ্যতঃ মানুষের প্রকৃতি, এটা জন্মগত। মানুষকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—অন্তর্বৃত্ত ও বহির্বৃত্ত। অনেকসময় এদের অন্তর্মুখী ও বহির্মুখীও বলা হয়। অন্তর্বৃতরা নিজেদের মধ্যেই গুটিয়ে থাকেন। মানুষের সান্নিধ্য সাহচর্য এরা পছন্দ করেনা। বহির্বৃতরা মিশুকে, মানুষের সঙ্গ তাদের প্রিয়, একা থাকলেই এরা নিজেদের নিঃসঙ্গ বোধ করে। কোন কোন কাজে মানুষের সান্নিধ্য ও সঙ্গের প্রয়োজনটা বড়। মানুষের শিক্ষকতা এর একটি দৃষ্টান্ত। মানুষের সঙ্গ সান্নিধ্যের তেমন দরকার নেই একাউন্টেন্টদের। হিসাব নিকাশ যারা পছন্দ

* **Frank Barron.**

করে, মানুষের সঙ্গলাভে যাদের অভিরুচি কম তাদের পক্ষে ঐ বৃত্তিটা অনুপযুক্ত নয়।

ভারতবর্ষে শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা এত বেশী যে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী লেখাপড়া করা, বৃত্তি গ্রহণ করা তত বড় নয় যতবড় কোনটাতে কত বেশী চাকরি পাবার সম্ভাবনা। এমন দেশে বৃত্তি-পরামর্শের স্থান সীমিত। আজকাল কমপিউটারের যুগ। এজন্য যে শিক্ষা গ্রহণ দরকার সেদিকে ছেলেমেয়েরা ঝুঁকবে তাতে আশ্চর্য কি আছে! আগেত খেয়ে পরে বাঁচা, তারপরে ভালো লাগা, মন্দ লাগা। এই উক্তিতে যতখানি অনোন্যপায়িতা ও বাধ্যতা রয়েছে পরিবেশ ততখানি প্রতিকূল নয়। কর্মক্ষেত্রে বহু সুযোগ সুবিধা রয়েছে। ইচ্ছা ও সামর্থ্যানুযায়ী বৃত্তি অবলম্বনের পথ সীমিত হলেও রয়েছে। অর্থ সব বৃত্তিতে সমান নয়, তবে সুখ শান্তির জন্য অর্থই সব নয়।

অবসর

ছোটবেলায় মানুষ লেখাপড়া করে। বড়ো হয়ে তারা কাজ করে। লেখাপড়া, কাজ যেমন দরকারী অবসরের সুযোগ-সুস্থভাবে অবসর যাপনও তেমনি দরকারি। অধিকাংশ লোকদের কাজ তেমন ভালো লাগে না, অর্থোপার্জনের জন্য, অবসর সময়ে বিশ্রামের জন্য, খুশীমত থাকবার জন্য তারা কাজ করে। কিছু কাজপাগল লোক আছে কাজ ছাড়া একেবারে থাকতে পারেনা। এদের মধ্যে কিছু কাজ ভালোবাসে, আবার কেউ কেউ আছে যারা কাজ ছাড়া একটুক্ষণ থাকলে অসুস্থ বোধ করে। একটি মেয়েকে কিছুক্ষণ চোখবুজে ধ্যান করতে বলা হয়েছিল। সে একটুক্ষণ চোখ বুজেই চোখ খুলে বললে—চোখ খোলা অবস্থায় মনে থাকে একটি ভাবনা চোখ বন্ধ করলে হাজার চিন্তা আমাকে এসে চেপে ধরে। এমন অনেকে আছে যারা একা থাকতে পারেনা, নিজেকে নিয়ে নিজে থাকতে পারে না। কাজ পাগল লোকদের মধ্যে অনেকে আছে যারা ঠিক সুস্থ নয় তেমনি মানসিক স্বাস্থ্যের কিছুটা অভাব আছে যারা একদণ্ড অবসর ভোগ করতে পারেনা। তাদের মনের মধ্যে অনুক্ষণ একটা অস্বোয়াস্তিবোধ তাদের ঠেলে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

প্রকৃত কথা কাজ ও অবসর মানুষের জীবনে দুটি ছন্দ। সুস্থ স্বাভাবিক মনে এর দুইয়েরই দরকার।

অবকাশ যাপন ঠিক নিদ্রা নয়। নিদ্রায় দেহ ও মনের দুইয়েরই বিশ্রাম ঘটে, দেহের সব পেশী সঞ্চালন মন্থর হয়, দেহের আভ্যন্তরীন আবর্জনা নিষ্কাশিত হয়। সুনিদ্রার পর দেহমন সতেজ হয়, নবকর্ম-ক্ষমতার মানুষ অধিকারী হয়।

অবকাশ মানুষ সাধারণতঃ জাগ্রত অবস্থাতেই উপভোগ করে। কোন্ পথে কে অবকাশ উপভোগ করবে সেটা তার মনের উপর নির্ভর করে। অবকাশ যাপনে মানুষের নিজের ইচ্ছাটাই বড়ো।

শিশুরা খেলতে ভালোবাসে—তারা খেলে। স্বচ্ছন্দ, স্বতঃস্ফূর্ত্ত খেলা দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য গঠনে বিশেষ সহায়তা করে এটাই মনোবিদের অভিজ্ঞতা। যে শিশু খেলেনা তার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা চিন্তিত হন। খেলা শিশুদের আত্মপ্রকাশ ও আত্মোপলব্ধির মাধ্যম।

পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কিশোর কিশোরীরা খেলে তাদের স্বভাব অনুযায়ী, তাদের ইচ্ছানুসারে। বড়রাও খেলে, অনেকে খেলা দেখতে ভালবাসে। মনের দুটি ধারা আছে—এক, সক্রিয় কর্মচঞ্চল দিক, অপরটি যখন বসেবসে মনে মনে মানুষ উপভোগ করে, সব কিছুতে এরা নিষ্ক্রিয় অংশীদার। এরা দেখে, শোনে, যারা খেলছে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে এরা খেলার আনন্দ উপভোগ করে।

বই পড়ে গল্প, উপন্যাস, কাব্যকবিতা এবং ছায়াছবি দেখে অবসর যাপন সবাই করে। নাটকে ঘাতপ্রতিঘাত, সুখ দুঃখ, প্রেম ও বিচ্ছেদ, যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি কাটাকাটি দেখে মন আলোড়িত হয়, নায়ক-নায়িকার ব্যাথায় তারা কাঁদে, তাদের মিলনে তারা আনন্দ পায়, যুদ্ধবিগ্রহ দেখে তাদের অপরিতৃপ্ত যুদ্ধবাসনা পরিতৃপ্তি লাভ করে। নাটক জীবনের প্রতিচ্ছবি। মানুষের কত কামনা-বাসনা বাস্তবজীবনে পূর্ণ হয় নি, এমন কি দমিত অবদমিত হয়েছে নাটক নভেলে তা কিছুটা পূর্ণ হয়। মনের ভারসাম্য রক্ষার সহায়তা করে।

অবসর মানুষের দরকার। নইলে তাদের অবরুদ্ধ কামনা-বাসনা মনের ভিতরে গুমরে গুমরে মরবে, মানসিক স্বাস্থ্যকে বিপন্ন করবে, অহর্নিশ সচেতন এবং নির্জ্ঞান মানসিক দ্বন্দে মানুষ ক্লান্ত, অসুস্থও অসুখী বোধ করবে।

অবসর সময়ে কিছুটা নিজেকে নিয়ে একা থাকা দরকার। চিন্তা

ভাবনার ভীড় যেন মনকে ভারাক্রান্ত না করে। মন বড়ো অশান্ত, তাকে কিছুটা শান্ত করতে পারলে মনে খানিকটা শান্তি আসবে। ভালো গান শোনা, ভালো ছবি দেখা এসব মানসিক স্বাস্থ্যের কিছুটা সহায়ক। সঙ্গীতের দ্বারা গাছপালা সতেজ হয়, তাদের ভালো বৃদ্ধি হয় এমন শোনা গেছে। অবসর সময়ে যারা গান বাজনা করেন, ছবি আঁকেন, তারা যে মনের দিক থেকে উপকৃত হবেন এটা বলাই বাহুল্য।

যাদের মধ্যে সৃজনাত্মক প্রতিভা বেশী, তাদের সৃজনাত্মক প্রতিভা স্ফূরণের জন্য দুটি জিনিস আবশ্যক :

(১) অবকাশ,

(২) স্বাধীনতা, নিজের ইচ্ছামত থাকার ও কাজের সুযোগ সুবিধা। এটা দেখা গেছে বিশেষ প্রতিভা যাদের মধ্যে আছে তেমন ছেলে মেয়েরা স্কুল ভালোবাসে। রুটিন মাফিক বাঁধাধরা পাঠ তাদের ভালো লাগে না। তারা যে পড়াশুনা করেনা এমন নয়। তারা তাদের ইচ্ছামত পড়ে সাধারণতঃ অনেক বেশীই পড়ে। বাঁধাধরা চাকুরীতে প্রতিভাযুক্ত মানুষ হাঁফিয়ে উঠে, তাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়—নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করবার তাগিদ তাদের মনে বড় হয়ে উঠে। অফিসের কাজকর্ম তাদের অপ্রীতিকর বলে মনে হয়। যে প্রতিভা নিয়ে তারা জন্মেছে, বাধ্যতামূলক কাজে তা স্ফূরিত হবে কেমন করে! এদের দরকার স্বাধীনভাবে অবসর যাপন। এদের আত্মোপলব্ধি যেমন সমাজের পক্ষে কল্যাণকর তেমন তা ব্যক্তিরও মঙ্গলসাধন করে। অনেক কিছু দেবার জন্য এরা জন্মেছে। তার থেকে বঞ্চিত হলে ক্ষোভ ও রোষে তারা জর্জরিত হবে, মানুষেরও কল্যাণ হবে না।

যার যা দেবার তাই তারা যাতে দিতে পারে সেটা দেখতে হবে। প্রত্যেক মানুষেরই অধিকার আছে সুখী হবার। ট্রাইন লিখেছেন

সুখী হওয়াটা মানুষের কর্ত্তব্যও*। কিছুটা ত্যাগ, কিছুটা দুঃখ মানুষকে পেতেই হবে।

সকলের মধ্যেই বিশেষ সৃজনী প্রতিভা আছে একথা সত্য নয়। তবে কিছু না কিছু সকলের মধ্যেই আছে। তবু অবসর সকলেরই দরকার। কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষ আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়, বিশেষতঃ যে সব কাজ মানুষের মনঃপুত। কিন্তু একটানা কর্মে অধিকাংশ মানুষ ক্লান্ত বোধ করে। ঐ ক্লান্তি বহুক্ষেত্রেই দৈহিক ক্লান্তি নয় এটা বহুলাংশে মানসিক ক্লান্তি। অমন ক্লান্তিকে বিশ্লেষণ করে পাওয়া গেছে কর্মে মানুষের বহুমুখী ইচ্ছার অনেকটাই অপরিতৃপ্ত থাকে। ঐ ইচ্ছারা চায় পরিতৃপ্তি, বাস্তবে না হউক কল্পনাতে। অবসরের স্বাধীনতায় নিজের মনে থাকবার সুযোগে অবসরে তারা খানিকটা মুক্তি পায়, কিছুটা পরিতৃপ্তি ঘটানোও সম্ভব।

নিজের মনে থাকতে মানুষকে কিছুটা শিখতে হয়। কবি একথা মিথ্যে বলেন নি—"এ জগত বড় বেশী আমাদের মনের মধ্যে ভীড় করেছে"।** নিজের মনে থাকতে যারা শিখেছে, নিজের সঙ্গে একা থাকতে যারা ভালোবাসে অবকাশের পূর্ণ সদ্ব্যবহার তারা জানে। ঐসব মুহূর্ত্তে প্রকৃতির সান্নিধ্য ও সাহচর্য লোভনীয় হয়ে ওঠে, পাখীর ডাকও এরা শুনতে পায়। আর কানে ভেসে আসে মহাশূন্যের সুগভীর নিঃস্বন। ওকেই বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছেন মহাকালের সঙ্গীত।

---

* এরি জন্য কিছু সুযোগও বোধহয় দরকার। দুর্ভাগা যে অনেকেরই তেমন সুযোগ বহুল পরিমাণে নেই।

** The World is too much with us.

পরিশিষ্ট

প্রাসঙ্গিক পরিভাষা

অনুমান (ন্যায়শাস্ত্র)—	Inference
অন্তঃক্ষেপ—	Introjection
অন্তর্দ্বন্দ্ব—	Conflict (Endopsychic)
অধিঅহম বা অধিশাস্তা—	Super-ego
অধিচেতন, অতিচেতন—	Supra-conscious
অপ্রকট (জিন)	Recessive (gene)
অবচেতন—	Subconscious
অবদমন—	Repression
অভীক্ষা—	Test
অহম—	Ego
আচরণবাদ—	Behaviourism
আবেগ বা প্রক্ষোভ—	Emotion
আবেগের স্থানান্তরণ—	Displacement (emotion)
আবেগশূন্যতা—	Alienation
আয়ান, মানসপ্রকৃতি—	Temperament
ইডিপাস কমপ্লেক্স—	Oedipus complex
ইদম—	Id
উদ্‌গতি বা উন্নয়ন—	Sublimation
উদ্দীপক—	Stimulus
কর্মথেরাপি—	Occupational therapy
কনভারর্সন বা রূপান্তরিত হিষ্টিরিয়া—	Conversion hysteria
ক্ষতিপূরণসাধন—	Compensation
খেদোম্মত্ত বাতুলতা—	Manic depression

গূঢ়ৈষা—	Complex
চিত্তভ্রংশী বাতুলতা বা সিজোফ্রেনিয়া—	Schizophrenia
দমন—	Suppression
	Repression (After expulsion)
নির্জ্ঞান—	The unconscious
নিষ্ক্রিয় সহানুভূতি—	Passive sympathy
প্রক্ষেপ—	Projection
প্রকট (জিন)—	Dominant (gene)
প্রত্যাবৃত্তি—	Regression
প্রতিক্রিয়া মনোভাব, বিপরীত মনোভাব—	Reaction formation
বিশেষ সামর্থ্য—	Special ability
বুদ্ধ্যঙ্ক—	Intelligence Quotient (I. Q.)
প্রবৃত্তি—	Instinct
প্রহরী—	Censor
প্রসারণ—	Elaboration (dream)
প্রাক্‌চেতন—	Preconscious
পাত্রান্তরণ—	Transference
প্যারানোইয়া—	Paranoia
বস্তুআতঙ্ক—	Phobia
বিকাশ—	Development
বিপরীত কাম—	Heterosexuality
বিশ্বাস স্থাপন—	Suggestion
বৃদ্ধি—	Growth
ভাবগ্রন্থি—	Sentiment
মানসিক ক্রিয়া—	Mental function
মানসিক সংগঠন—	Mental structure
মনঃসমীক্ষা—	Psycho-analysis
মুক্ত-অনুসঙ্গ—	Free association

যুক্তি উদ্ভাবন, যুক্ত্যাভ্যাস—	Rationalisation
শক্তি—	Energy
শিক্ষায় মন্দিত—	Educationally retarded
সংক্ষেপন—	Condensation (Dream)
সংবন্ধন—	Fixation
সমকাম—	Homosexuality